প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ

প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ

ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

মূল্য
১৮০.০০ (একশ আশি টাকা)

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৯

জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১-৬৪৭০/২২৪১-৭৫১৯

মুদ্রণ
কালার ইন্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কোলকাতা-৭০০ ০১২

উৎসর্গ

এই গ্রন্থ প্রণয়নে
যাঁহাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিল আমার নিত্যসহচর
শিক্ষানুরাগী পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা
প্রফেসর মোঃ কমরউদ্দীন
ও
মাতা মিসেস তৈয়েবাতুন নেছার
উদ্দেশ্যে

অবতরণিকা

ইতিহাস হইতেছে কালের দর্পন, যে দপনে আছে মানব প্রজাতিব জীবন ধারা ও কমকাণ্ডের চিত্র, তাহার সংস্কৃতি ও মননশীলতার পরিচয়। যাহা অতীত কালে ঘটিয়াছে তাহাই ইতিহাস। অতীত কালে মানুষ তাহার জীবন ধারা কেমনভাবে পরিচালিত করিযাছে এবং তাহার চিন্তা চেতনা ও ধ্যান-ধারণার প্রকৃতি ইতিহাসের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। এই জানা মানব প্রজাতিকে তাহার ভবিষ্যত কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে সহায়তার মাধ্যমে প্রগতির পথে মানব সন্তানের অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করিয়াছে। এই বক্তব্য মানব প্রজাতি সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি ইহা প্রযোজ্য বিভিন্ন দেশের অধিবাসী তথা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস তথা বাংলাদেশের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত রাজা রাজন্যদের কার্যক্রম সম্পকে লিখিত হইত। এই ইতিহাসে বিপুল জনগণের মানবীয় জীবন লীলা খুবই কম আলোচিত হইত। অবশ্য কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যক্রম অপেক্ষা সাধাবণ মানুষ সম্পর্কে ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বাংলা ইতিহাস সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, প্রথম খণ্ড', গ্রন্থটিতে বেশ আলোকপাত করা হইযাছে। ইহার পর ড নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব' প্রাচীন বাংলার মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্র চিত্রায়িত করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ড. শাহানারা হোসেন তাঁহার 'এভরি ডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার' এবং 'সোসাল লাইফ অফ উমেন ইন আরলি মিডীএভ্যল বেঙ্গল' দুইটি গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনেব চিত্র রূপায়নের চেষ্টা করিয়াছেন। আমার রচিত 'প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ' গ্রন্থটি এই সকল পূবসূরীদেব ইতিহাস রচনার ধারাকে অনুসরণ করিয়াই লেখা হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার বিশেষতঃ সেনযুগেব সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কনই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচনায় আনিয়া আমি অগ্রসর হইয়াছি। বাংলার প্রাচীন কালের ইতিহাসে সেনযুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। কারণ সেই সময়েব বাংলার ধর্ম, বর্ণ-শ্রেণী ও দৈনন্দিন জীবনাচারের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী সমাজের বিবর্তন, পরিবর্তন ও অগ্রগতি বাংলার সামাজিক তথা সামগ্রিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইহার উত্তরসূরী হিসাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেন রাজবংশেব উত্থান বাঙালির সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে আগত সেন রাজন্যবর্গের পূর্ব পুরুষ পশ্চিম বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং ক্রমান্বয়ে

শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা বাংলার রাজক্ষমতা দখল করেন। এই সেনদের পূর্ববর্তী পাল শাসকগণ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সেন রাজগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন। শাসক রাজবংশের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণের এই পরিবর্তন বাংলার সামাজিক জীবনকে প্রভূত ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রাচীন বাংলা বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যাহা গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ নদীর জলধারায় সিক্ত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। এই বাংলা প্রাচীন কাল হইতে কৃষি সম্পদের সমৃদ্ধ হওয়ায় বিদেশীদেব নিকট আকর্ষণীয় হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারই ধারাবাহিকতায় বাংলায় সেনদের আগমন এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। তাঁহারা দক্ষিণাত্যের রক্ষণশীল মানসিকতা লইয়া বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। এই রাজবংশ আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

সেন রাজাদের শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বাংলার সমাজ জীবনকে অতি প্রবল ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসাব বাংলার সামাজিক জীবনকে ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করিয়াছিল। মূলতঃ পাল রাজ বংশের পতন এবং সেন রাজবংশের উত্থান তৎকালীন সামাজিক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত কবিয়াছে ইহারই পর্যালোচনা আমি করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আলোচনার সুবিধার্থে বইটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়টি মূলতঃ ভূমিকা যাহা তিনটি উপ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন বাংলাব জনপদসমূহ, সেন বাজ বংশের ইতিহাস এবং সেনযুগে বাংলার সমাজ জীবন সম্পর্কিত উৎসসমূহ আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেনযুগে বাঙালি সমাজের বর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাস দেখান হইযাছে। বিশেষতঃ সেন রাজগণ ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির প্রচলন ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সমাজ তখন বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া যায় এবং সামাজিক আচার প্রথা তাঁহার সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সমাজ জীবনে স্তর বিন্যাস তথা শ্রেণীবিন্যাস সৃষ্টি হয় এবং সমাজ কাঠামোয নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে উচ্চ বর্ণের মানুষ সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিম্ন বর্ণের মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধর্মীয় আবরণের বেড়াজালে তখন বর্ণে বণে ও অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে নিম্ন বর্ণ ও শ্রেণীব মানুষ উচ্চ বর্ণ ভুক্ত শ্রেণী গুলিরই কবুণা ও অবহেলার পাত্র ছিল। যাহার বিশ্লেষণ এই বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সেনযুগে বাংলার ধর্মীয় জীবন আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বাংলার লোকায়ত ধর্ম এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে ইহার প্রভাব দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সেনযুগে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ও বিবর্তন আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের

ধারক বাহক সেন রাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও সমাজ জীবনে ইহার তেমন প্রভাব ছিল না যাহা সেই সময়ের সামাজিক বাস্তবতায় প্রতীয়মান দেখা যায়। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব সমাজে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর ধর্মের জোয়ার বাংলার সমাজ জীবনে সর্বকালের পরিসীমা অতিক্রম করিয়াছিল। ইহার প্রভাব আজকের বাঙালি হিন্দু সামাজিক জীবনে পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে সেনযুগে বাংলার দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করা হইয়াছে। তখনকার বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন প্রায় এখনকার মতই ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, ক্রীড়া, বিহার, যাতায়াত, ঘর গৃহস্থালী, জীবনাদর্শ ও নারীর সামাজিক জীবন ছকে বাঁধা ছিল। বাঙ্গালীর সামাজিক আচার আচরণ ও দৈনন্দিন জীবন বহু শত বর্ষ ধরিয়া একই প্রকৃতির ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত সময়কালে বাংলার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বিচার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

যাহাই হোক, এই গ্রন্থটি মূলত পি-এইচ.ডি. গবেষণাকর্ম। গবেষণাকালীন গ্রন্থটির নাম ছিল 'সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন', পরবর্তীতে ইহার বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা হইয়াছে। তাই বর্তমানে গ্রন্থটির নাম 'প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ' করা হইল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. শাহানারা হোসেন এই গবেষণার দিক নির্দেশক ছিলেন। তাহাছাড়া প্রফেসর ড. এম. ওয়াজেদ আলী এবং প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রফেসর ড. কে এম. মহসীন, প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. শরিফ উদ্দীন আহমেদ এবং আই. বি. এস. রাজশাহীর প্রফেসর ড. প্রীতিকুমার মিত্রের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের সকলের উৎসাহ, পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রন্থটি সম্পন্ন করিতে আমাকে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। ইহার বাহিরেও যাঁহাদের সহযোগিতা ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি তাঁহারা হইতেছেন আমার পিতা প্রফেসর মোঃ কমর উদ্দীন ও মাতা মিসেস তৈয়েবাতুন নেছা। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। তবুও আমার মনে হয় গ্রন্থটির রচনা শেষ হওয়ায় আমার চাইতে তাঁহারাই বেশি আনন্দিত হইয়াছেন। এই জন্য আমি গ্রন্থখানি তাঁহাদের নামেই উৎসর্গ করিলাম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আই.বি.এস. লাইব্রেরী রাজশাহী বিভাগীয় লাইব্রেরী, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম লাইব্রেরী, রাজশাহী ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ঢাকা ; সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা, পি.এন. হাই স্কুল লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা ;ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন লাইব্রেরী যেমন : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, কলিকাতা হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছি। বাংলাদেশের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী ও আশুতোষ সংগ্রহশালা,

কলিকাতা হইতেও উপাত্ত সংগ্রহ করিয়াছি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে উপাত্ত সংগ্রহে তাঁহাদের সহায়তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আগেই উল্লেখ করিয়াছি ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। অনেক ক্ষেত্রে আমি এই বইয়ের প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছি। অন্যদিকে সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান' গ্রন্থ হইতেও প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি উপকরণ ব্যবহার করিয়াছি তদস্থলে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছি। যদি ভুলক্রমে কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি উপকরণের স্বীকৃতি না দিয়া থাকি, তাহা হইলে পাঠক সমাজ আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন।

বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য বাংলা একাডেমীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করিয়া প্রাক্তন পরিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন, বর্তমান পরিচালক জনাব সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া, উপপরিচালক জনাব সালাহউদ্দিন খান, সহ পরিচালক জনাব আবদুল ওয়াহাব, সহ পাণ্ডুলিপি সম্পাদক জনাব আজহারুল ইসলাম এবং সহ পাণ্ডুলিপি সম্পাদক জনাব শেখ সারোয়ারকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তাঁহাদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও বইটিতে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিতে পারে এইজন্য সহৃদয় পাঠকদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য একান্ত অনুরোধ রহিল। পরবর্তীতে পাঠকগণের গঠন মূলক সমালোচনা ও পরামর্শ অনুসারে গ্রন্থটি সংশোধন ও সংযোজন করিবার ইচ্ছা আমার আছে। সাধারণ পাঠক, গবেষক এবং বিশেষতঃ ছাত্র ছাত্রীদের গ্রন্থখানি সামান্য উপকারে আসিলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

ক. বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই কোনো দেশের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে সে দেশের ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ যুগে যুগে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ মানুষের সমগ্র জীবন এবং তাহাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যই বাংলার জনগণের ইতিবৃত্তে প্রভাব বিস্তার করিবে—ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণ প্রণয়ন দুরূহ কাজ। কারণ সমসাময়িককালে প্রণীত কোনো ইতিহাসভিত্তিক ভূগোল আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। এই ধরনের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা সেকালের মানুষের ছিল না। তবুও আজকের ঐতিহাসিকদের সৌভাগ্য যে সেকালের ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিমালা ও সাহিত্যিক উৎস তাহাদের ইতিহাসভিত্তিক ভূগোল রচনার ক্ষেত্রে বহু তথ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল উৎস উপকরণসমূহে প্রদত্ত তথ্য ঐতিহাসিক গবেষকগণের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনো কোনো তথ্যে বিভ্রান্তিও যে আছে—তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ প্রাচীন উৎসে উল্লেখিত অনেক স্থানবাচক নাম ও সীমানা বর্তমানে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যাবলী এই বিষয়ে আমাদেরকে অনেকখানি সাহায্য করিবে এবং এই তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা এই অধ্যায়ে করা হইবে।

একই আঞ্চলিক সত্তাবিশিষ্ট বাংলাদেশ যাহা ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশ হিসাবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অখণ্ডিত ছিল—এই বাংলাই আমাদের পর্যালোচনার বিষয় হইবে। বর্তমানে এই আঞ্চলিক সত্তাবিশিষ্ট ভূভাগ বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। ৭৭,৫২১ বর্গমাইল বিশিষ্ট এই ভূভাগটি একটি সমতল ভূমিও বটে। অবশ্য ইহার পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরপ্রান্ত বরাবর পার্বত্যময় ত্রিপুরা, রাজমহল, ছোটনাগপুর, কুচবিহার ও সিকিম রাজ্য অবস্থিত। সাধারণভাবে ইহার উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং পূর্বে আসাম ও বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার নামে পরিচিত) অবস্থিত। ইহা মোটামুটি ২৭°৯ এবং ২০°৫০ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৬°৩৫ ও ৯২°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।[১] এই বিশাল ভূভাগ

ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়। ইহার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চল পূর্ব–পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ নাম গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে। আবার ১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে সাবেক পূর্ব–পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে এবং "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের আলোচ্য "বাংলা"দেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। এইগুলি যথাক্রমে বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ় নামে আখ্যায়িত হইত। তাই "বাংলা" নামটির উদ্ভব কিভাবে হইল—ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধিৎসার শেষ নাই। ঐতরেয় আরণ্যকে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ আছে।[২] পরবর্তীকালে বিভিন্ন উৎসেও বঙ্গ নামের উল্লেখ হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গ একটি সুপ্রাচীন দেশ। কিন্তু এই বঙ্গ ছিল আমাদের আলোচ্য "বাংলা"দেশের একটি অংশ মাত্র। কারণ প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশের একক কোনো নাম না থাকিবার ফলে ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। আর "বঙ্গ" ছিল ইহাদের মধ্যে অন্যতম এবং সুপ্রাচীন। শক্তিশালী পাল ও সেনরাজাদের রাজত্বকালেও সমগ্র বাংলা একটি বিশেষ নামে পরিচিতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। বিখ্যাত সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের শাসনামলে সমগ্র বাংলা চারিটি বিভিন্ন নামীয় প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইহারা "রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ" নামে উল্লেখিত হইয়াছে।[৩] এই সম্পর্কে আর.সি. মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিথিলা বা উত্তর বিহার জয় করিয়া বল্লালসেন স্বীয় সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং জাতিভেদ প্রথাকে সুসংহত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন দেশকে মিথিলা, রাঢ়, বঙ্গ, বাগড়ী ও বরেন্দ্রে বিভক্ত করেন।[৪] সুতরাং হিন্দু যুগের শেষ পর্যায়েও বাংলাদেশ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল—ইহাই প্রতীয়মান হয়।

এই বিষয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিকের অভিমত কিরূপ ছিল সেই সম্পর্কে আরও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করা যাইতে পারে। ইখতিয়ার উদ্দিন–বিন–বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের সময় বাংলা নামে একক কোনো দেশের অস্তিত্ব ছিল না। কারণ ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় এই দেশকে বাংলা নামে উল্লেখ না করিয়া বাংলার বিভিন্ন অংশকে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ ও সমতট প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।[৫] যদি বাংলা নামে একক কোনো দেশের অস্তিত্ব তখন থাকিত তাহা হইলে তিনি ইহার উল্লেখ নিশ্চয় করিতেন। কারণ মিনহাজের বর্ণনায় বাংলা সম্পর্কে তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস–ই–সিরাজ আফিফ সুলতান শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহকে "শাহ–ই–বাঙ্গালা" "শাহ–ই–বাঙ্গালিয়ান" বা "সুলতান–ই–বাঙ্গালা" নামে অভিহিত করিয়াছেন।[৭] উল্লেখ্য যে, সুলতান ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বাংলায় একাধিপত্য বিস্তার করেন। ইতিপূর্বে কোনো মুসলমান সুলতান অথবা সমগ্র হিন্দু, বৌদ্ধযুগের কোনো নরপতিকে এইরূপ উপাধিতে ভূষিত হইতে দেখা যায় না। তাই বাঙ্গালা নামের প্রচলন সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে। এ. এইচ. দানীও সামগিক অর্থে বাঙ্গালা নাম প্রবর্তনের

কৃতিত্ব সুলতান ইলিয়াস শাহকে প্রদান করিয়াছেন।[৮] কিন্তু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী সমগ্র বাংলাদেশকে বাঙ্গালা নাম প্রবর্তনের কৃতিত্ব পাল রাজাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন।[৯] তাহার এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ ইহাই প্রমাণ করিয়া থাকে। অবশ্য এই সম্পর্কে আরও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথমেই রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতামত উদ্ধৃত করা সঙ্গত। তিনি প্রাপ্ত প্রমাণাদি ও তথ্যের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, হিন্দু যুগেও সমগ্র বাংলাদেশ একক নামে অভিহিত হয় নাই এবং তখনও ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।[১০] ইহাছাড়া সেনরাজগণ "গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপতি"[১১] নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলিম অধিকারভুক্ত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ একক নামে পরিচিত ছিল না এবং মুসলিম যুগে আসিয়া বিশেষত ইলিয়াস শাহের সময়ে বাংলাদেশ একক নামে স্বীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ইউরোপীয় বিশেষত পর্তুগীজ পর্যটকদের দেওয়া বেঙ্গালা নামটি তৎকালীন সময়ে ইউরোপে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। পর্তুগীজ পর্যটক ভার্থেমাঁ, বারবোসা, জাও দ্য বারোস প্রভৃতির বর্ণনায় বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এই বেঙ্গালা শহরের অবস্থিতি লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অবশ্য বেঙ্গালা রাজ্য যে আমাদের আলোচ্য "বাংলা"দেশকে বুঝাইত তাহা নিশ্চিত। অন্যান্য ইউরোপীয়দের লেখনীতেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত দৃষ্টে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের লিখিত বাংলার চিরায়ত প্রাকৃতিক সীমানা এবং ভূমি বৈশিষ্ট্যের বিষয় বলা এখানে একান্তই প্রাসঙ্গিক হইবে। তাঁহার ভাষায় : "এই প্রাকৃতিক সীমা বিবৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়–পুণ্ড্র–বরেন্দ্রী–রাঢ়–সুহ্ম–তাম্রলিপ্তি–সমতট–বঙ্গ–বঙ্গাল–হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; ভাগীরথী–করতোয়া–ব্রহ্মপুত্র–পদ্মা–মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিককালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম–কর্ম–নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র ; মাঝখানে সমভূমির সাম্য—ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য।"[১২] ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘল অধিকারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাংলাদেশ অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে বাঙ্গালা নাম ধারণ করে। এই সীমা বিবৃত দেশ তখন "সুবা বাঙ্গালা" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ের ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালার আদি নাম "বঙ্গ"। প্রাচীনকালে তখনকার রাজারা ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড আল নির্মাণ করিতেন। ইহা হইতেই বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি।[১৩] কিন্তু এই মতবাদ বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কতটুকু যথার্থ ইহাতে সন্দেহ আছে। আবুল ফজলের এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার অসত্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এই দুইটি দেশের নাম হইতে "আল" যোগে অথবা অন্য কোনো কারণে বঙ্গাল বা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা

স্বীকার করা যায় না।"[১৪] কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্ত অভিমতটি ড. মমিন চৌধুরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।[১৫] তাহাছাড়া ড. নীহাররঞ্জন রায়ও আবুল ফজলের ব্যাখ্যাটি একেবারে অযৌক্তিক মনে করেন নাই।[১৬] সুতরাং আবুল ফজলের ব্যাখ্যাটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তাহার জন্য ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট আরো ব্যাখ্যা ও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

যাহাই হউক মোঘলদের প্রদত্ত নামের অনুকরণে পর্তুগীজরা বাংলাদেশকে বেঙ্গালা নামে অভিহিত করিত। পরবর্তীকালে এই বাংলাদেশ অথবা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলটি ইংরেজ শাসন কবলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়।[১৭] তখন ইহা বাংলাভাষায় বাংলাদেশ ও বাংলা উভয় নামে ব্যবহৃত হইত। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন, বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা, বাঙ্গাল্য হইতে বেঙ্গালা এবং শেষত এই বেঙ্গালাই বেঙ্গল হইয়াছে।[১৮] অতঃপর ইংরেজ শাসনাধীন বেঙ্গল প্রদেশটি ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—যাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহার একটি বৃহৎ অংশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

সুজলা সুফলা বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। ইহার অধিকাংশ ভূভাগই গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিত পলিমাটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্য বাংলার ভূভাগের বেশি অংশই নবসৃষ্ট। অবশ্য ইহার পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রাচীন বা পুরাভূমির বন্ধনীও বিদ্যমান। বাংলার পশ্চিমাংশের পুরাভূমি রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পুরাভূমির অন্তর্গত রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম-ধলভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। অবশ্য মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের উচ্চতর অঞ্চলও ইহার অন্তর্গত। আবার এই পুরাভূমির একটি শাখা উত্তর বাংলায় বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরের মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীর সংলগ্ন অঞ্চল ধরিয়া আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। পূর্বদিকে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল উত্তর হইতে দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে। এই তিন দিকের (পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব) পুরাভূমির বন্ধনী বাদ দিলে মধ্যবর্তী অংশ, যাহা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সবটুকু প্রায় নবসৃষ্ট। ইহাই প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ বা ডেল্টা নামে পরিচিত। বাংলার এই প্রাকৃতিক ভূমি বৈশিষ্ট্যের আলোকে ড. মমিন চৌধুরী ইহাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ইহা যথাক্রমে ১. উত্তর বাংলার সমভূমি, ২. ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা মধ্যবর্তী অঞ্চল, ৩. ভাগীরথী মেঘনা মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ, ৪. চট্টগ্রামাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা, এবং ৫. বর্ধমানাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্যভূমি" হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।[১৯] এই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিলে বলা সম্ভব যে, বাংলার চতুর্দিকে একটি সীমান্তবর্তী বন্ধনী অংশ ছাড়া প্রায় সবটাই ভূ-তত্ত্বের আলোকে নবসৃষ্ট সমতলভূমি।

বাংলার এই সমতলভূমি গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বাহিত পলিমাটি দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মাটি গুণাগুণের দিক হইতে বালিমাটি, দোঁআশ মিশ্রিত বালিমাটি, পলিমাটি ও নদীবাহিত লোনামাটিতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই ধরনের মাটি

কৃষির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। তাই পৃথিবীর অপরাপর বহু অঞ্চল অপেক্ষা এই ভূভাগই চিরদিনই শস্যশ্যামলা। ইহার আকর্ষণে বাংলা বিদেশীদের লোভাতুর দৃষ্টি হইতে কোনোদিনই রেহাই পায় নাই। ফলে ইহার কখনও এককভাবে স্বাধীন সত্তা খুব দীর্ঘকালের জন্য অটুট রাখাও সম্ভব হয় নাই। তাই বাঙালি যুগে যুগে পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে।

বাংলা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি অঞ্চলভুক্ত দেশ। ইহা ভারতের পশ্চিম ঘাট এবং হিমালয় পর্বতের পাদদেশ সংলগ্ন অঞ্চল। ভারতের বৃষ্টিবহুল আসাম প্রদেশ সংলগ্ন এই বাংলার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ৮০´´। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই অনাদিকাল হইতে কৃষিই বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

বাংলার নদনদী

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। ইহার নদনদীসমূহ ইহাকে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, "বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলিই বাঙলার প্রাণ ; ইহারাই বাঙলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে।"[২০] গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও ইহার বিভিন্ন অংশের সীমা নির্দেশ করিয়াছে। ইহার ফলে প্রধানত চারিটি বিভাগে বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়াছে, উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব। এই প্রত্যেকটি বিভাগ একদিকে যেমন বিশিষ্ট ভৌগোলিক সত্তা বিশিষ্ট, অপরদিকে তেমনি ঐতিহ্যে পূর্ণ। এইগুলি যথাক্রমে ১. গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পদ্মার উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চল, বরেন্দ্র ছিল ইহার একটি বিখ্যাত মণ্ডল, ২. গঙ্গার অপর প্রবাহ ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্ববর্তী ছিল প্রাচীন রাঢ়, ৩. ভাগীরথী, পদ্মা, নিম্নগামী ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার মধ্যবর্তী বিভাগ "বঙ্গ" এবং ৪. মেঘনার পূর্ববর্তী অঞ্চলে সমতট রাজ্য অবস্থিত ছিল।[২১] সুতরাং নদীই যে প্রাচীন বাংলার প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশ করিত তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে এই নদীসমূহের খাতের গতিপথ পরিবর্তিত হইত। ইহার সামান্য ইঙ্গিত ষোড়শ শতকের জাও দ্যা ব্যারোসের, সপ্তদশ শতকের ফান্‌ডেন্ ব্রোকের এবং অষ্টাদশ শতকের রেনেলের অঙ্কিত নকশায় মিলিয়াছে।[২২] এইসব অঙ্কিত নদীপথের প্রবাহ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনকালেও গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা প্রভৃতি নদীর প্রবাহপথ বর্তমানকালের প্রবাহপথগুলি হইতে ভিন্নতর ছিল। বর্তমানে এই সকল নদীর গতি ও প্রকৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর গতিপথ হইতে অনেকাংশে ভিন্নতর হইয়াছে। অবশ্য নদীমাতৃক বাংলার নদীর প্রবাহপথ ক্রমশ ভিন্নতর হওয়া স্বাভাবিক হইলেও ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাধিক। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন, "বাংলার নদনদীর গতি পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন বহু নতুন জনপদের সৃষ্টি ও পুরাতন জনপদের (বিশেষত নগরীর) সমৃদ্ধি হইয়াছে তেমনি বহু নগরীও জনশূন্য, শ্রীহীন অথবা একেবারে বিলুপ্ত

হইয়াছে।"[২৩] এই সকল নদীর ক্রমপরিবর্তনের রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতি সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আমাদের নিকট প্রায়ই অস্পষ্ট। যদিও প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিমালায় ইহাদের অবস্থান ও গতি-প্রকৃতির সামান্য ইঙ্গিত বর্তমান, কিন্তু ইহাতে আমাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবার নয়। তবে এই নদীমালাই যে বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন। নিম্নে বাংলার নদীমালার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গঙ্গানদী বাংলার নদনদীর মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহা হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া বাংলায় প্রবেশ কবিয়াছে। বাংলায় প্রবেশ করিয়া গঙ্গানদী মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী থানার ছবঘাটির নিকটবর্তী স্থানে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একটি পূর্ব-দক্ষিণ অভিমুখে "পদ্মা" এবং অপরটি সোজা দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্তমানে এই ভাগীরথী জঙ্গীপুর, লালবাগ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ও কলিকাতা নগরীর পার্শ্বদিয়া ডায়মণ্ড হারবারের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে এবং পদ্মানদী পূর্ব-দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চাঁদপুরের নিকটবর্তী মেঘনা নদীর প্রবাহকে বেগবান করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে। এই পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যে ভাগীরথী নদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং পুণ্যবতী। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য লিপিমালায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৪] উদাহরণস্বরূপ রাজা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলিপিতে সম্ভবত গঙ্গার ভাগীরথী প্রবাহকেই "দেবনদী" হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[২৫] অষ্টম ও নবম শতাব্দীর লিপিমালায় ও সংস্কৃত সাহিত্যে গঙ্গার সমস্ত পানি হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ভাগীরথী নদী বহন করিত বলিয়া উল্লেখ আছে।[২৬] কিন্তু পদ্মা নদী সম্পর্কে এইরূপ কোনো তথ্যই আমরা পাই না।

পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী নদী খুব প্রভাবশালী নদী না হইলেও সেই সময় এই নদীপথে সমুদ্রতীর হইতে চম্পাভাগলপুর পর্যন্ত বড় বড় বাণিজ্যতরী চলাচল করিত। তখন ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ।[২৭] জলবিজ্ঞানের প্রমাণযোগ্য তথ্যে ভাগীরথী গঙ্গার প্রথম ও প্রাচীন প্রবাহ বলা হইয়াছে।[২৮] অপরদিকে রেনেলের, ফান্‌ডেন্‌ ব্রোকের অঙ্কিত চিত্রে এবং বিপ্রদাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কলিকাতা অবধি ইহার প্রবাহপথ একই ছিল ; কিন্তু সমুদ্রে পতিত হইবার পথ ছিল বিভিন্ন। ইহা বিপ্রদাসের ও ফান্‌ডেন্‌ ব্রোকের সহিত রেনেলের মানচিত্রের বৈসাদৃশ্য হইতেই উপলব্ধি সম্ভব। এই তথ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই ভাগীরথী নদী কালের ব্যবধানে অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।[২৯]

প্রাচীনকালে ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী নদী ত্রিধারায় বিভক্ত হইত। এই সম্পর্কে বিপ্রদাস তাঁহার *মনসা বিজয়* কাব্যে সুন্দর বর্ণনা রাখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় সরস্বতী ও যমুনা নদী একটি প্রতাপশালী নদী ও সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।[৩০] তখন সরস্বতী নদী সপ্তগ্রামেব নিকট ভাগীরথী হইতে নির্গত হইয়া প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদীর সহিত মিলিত হইত এবং পথিমধ্যে দামোদর ও সাঁওতাল পরগণার বহু ছোট-বড় নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার স্রোত বৃদ্ধি করিয়া

সমুদ্র-সোপান স্পর্শ করিত। পরবর্তীকালে এই সরস্বতী নদীর খাত পরিবর্তিত হওয়ায় প্রথমেই তাম্রলিপ্ত ও পরবর্তীতে সপ্তগ্রামের মতো বিখ্যাত বন্দরদ্বয়ের অবনতি ঘটিয়াছে এবং নুতন প্রবাহপথের সৃষ্টি হওযায় হুগলী বন্দরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে সরস্বতীর উর্দ্ধাংশ মৃতপ্রায় এবং অপর প্রভাবশালী নদী যমুনাও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিপ্রদাসের বর্ণনায় যমুনা ও সরস্বতী নদী প্রতাপশালী নদী হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

ভাগীরথী নদীর খাতেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। প্রাচীনকালে ইহা রাজমহল অতিক্রমপূর্বক সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূম হইয়া সাগরে পতিত হইত। ভাগীরথীর এই স্রোতের সহিত অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণ নদী মিলিত হইত এবং ইহার দক্ষিণাংশে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবস্থান ছিল। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই এই প্রবাহের অবনতি ঘটে। তখন ইহা বর্তমান কালিন্দী মহানন্দা খাতে প্রবাহিত হইয়া গৌড় নগরী অতিক্রম করিয়া প্রথম পর্যায়ে খাতের সামান্য পূর্বদিক হইতে চলিয়া যাইতে থাকে। ইহাতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন ঘটে এবং কলিকাতা বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান স্রোতধারা এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদিগঙ্গা দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পরবর্তীতে আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া পুরাতন সবস্বতী খাতে ভাগীরথীর জলপ্রবাহ সমুদ্রে যাইতে শুরু করে।[৩১]

গঙ্গা নদীর অপর অন্যতম প্রবাহ হইতেছে পদ্মা। তবে পদ্মা গঙ্গার প্রধান প্রবাহ হিসাবে কখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—ইহা একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে খুব সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পদ্মা নদী গঙ্গার প্রধান প্রবাহ হিসারে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্পর্কে যোড়শ শতকের ঐতিহাসিক আবুল ফজল গঙ্গা নদীকে তাণ্ডার নিকট দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৩২] এই প্রবাহই পদ্মা নদী বলিয়া অনুমিত হয়। পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস পদ্মা প্রবাহকে বড়গঙ্গা নামকরণের মধ্যদিয়া পদ্মা নদীকে গঙ্গার মূল প্রবাহ বলিয়া প্রতীয়মান করিয়াছেন।[৩৩] এতদ্ব্যতীত সপ্তদশ শতকের ফান্‌ডেন্ ব্রোকের মানচিত্র এবং অষ্টাদশ শতকের রেনেলের মানচিত্রে পদ্মা নদী ভাগীরথী নদী হইতে বেশ বড় দেখা যায়।[৩৪] আবার পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে পদ্মা নদীর অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া কোনো কোনো ঐতিহাসিক অনুমান করিলেও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অনুমানের বিরোধিতা করিয়াছেন।[৩৫] কারণ সহস্র বৎসর পূর্বেও পদ্মা নদীর অস্তিত্ব ছিল। তখন ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট নদী ছিল। বৌদ্ধ চর্যাপদে পদ্মাখাল বাহিয়া বঙ্গাল দেশে যাওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে।[৩৬] ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন, "প্রথমে খাল কাটিয়া ভাগীরথীর সহিত পূর্বাঞ্চলের নদীগুলি যোগ করা হয়, পরবর্তীতে এই খালই নদীতে পরিণত হয়।"[৩৭] তাহাছাড়া একাদশ শতকের বহু পূর্বেই পদ্মা নদীর উৎপত্তিকাহিনী লোকস্মৃতিতে বিজড়িত ছিল তাহা বহদধর্মপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভারতপুরাণ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের উল্লেখ হইতে অনুমান করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।[৩৮] বর্তমানে পদ্মাই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। কিন্তু পদ্মা ঠিক কখন কোন সময় হইতে গঙ্গা নদীর প্রধান প্রবাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে নির্ণয় করা কঠিন, তেমনি কষ্টকর ইহার প্রবাহপথ পরিবর্তনের সঠিক সনাক্তকরণ।

গঙ্গা নদীর প্রধান প্রবাহ হিসাবে গত তিন চারিশত বৎসরে পদ্মা নদীর প্রবাহপথের বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নির্দিষ্টভাবে এই পরিবর্তন নির্দেশ করা অসম্ভব হইলেও উহা সম্ভবত পূর্বে চলনবিলের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার খাত বাহিয়া প্রবাহিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা আরও সরিয়া এবং ফরিদপুর ও বাখেরগঞ্জ জেলা অতিক্রম করিয়া চাঁদপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ-শাহাবাজপুরে মেঘনার সহিত মিলিত হইত।[৩৯] ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মাপ্রবাহ রাজবাড়ীর নিকট হইতে মেঘনা পর্যন্ত কীর্তিনাশা খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রবাহ অনেক বেশি প্রতাপশালী এবং বেগবান ও প্রশস্ত ছিল।[৪০]

সমতলভূমিতে নদীর গতি পরিবর্তন যেমন স্বাভাবিক তেমনি স্বাভাবিক নূতন নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করা। তাই শুধুমাত্র গঙ্গা-পদ্মা বাংলার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দান করে নাই, ছোট-বড় বহু নদনদীও সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জলাঙ্গী ও চন্দনা নদী বেশ উল্লেখযোগ্য। ইহারা পদ্মা হইতে ভাগীরথীর মধ্যে পানি নিষ্কাশনের কাজ করিতেছে। সমুদ্রাভিমুখী প্রাচীনতম কুমার নদী ও মধ্যযুগীয় ভৈরব নদী এখন মরণোন্মুখ। তাই মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁই পদ্মার প্রধান সমুদ্রগামী নদীর মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও পদ্মার অন্যান্য শাখা-নদীর মধ্যে মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা ও তিস্তাও বেশ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে যমুনা ভাগীরথী নদীর শাখা হিসাবে এককালে বিশাল হইলেও বর্তমানে ক্ষীণ অবস্থায় পতিত হইয়াছে।[৪১]

বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী ব্রহ্মপুত্র। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী তিব্বতের মানস সরোবরে উৎপন্ন হইয়া আসাম অতিক্রম পূর্বক রংপুর-কুচবিহার সীমান্ত দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ যমুনা নামে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া চাঁদপুরে মেঘনা নদীর স্রোতধারা বৃদ্ধিকরত সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর প্রাচীনতম উল্লেখ চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়।[৪২] প্রাচীনকালে এই নদীর গতিপথ ভিন্নতর ছিল। অবশ্য গারো পাহাড় পর্যন্ত ইহার গতিপথের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তবে এককালে গারো পাহাড়ের নিকট হইতে নিম্নগামী এই প্রবাহ দেওয়ানগঞ্জের পার্শ্বদিয়া জামালপুর-ময়মনসিংহে এবং ময়মনসিংহ জেলার পার্শ্ববর্তী মধুপুর গড় অতিক্রম পূর্বক এবং ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করিয়া সোনারগাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পার্শ্বদিয়া ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইত।[৪৩] ব্রহ্মপুত্রের এই প্রবাহকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুদের ধর্মীয় পবিত্রতার ধারণা গড়িয়া উঠিবার ফলে ঐতিহাসিকরা ইহাকে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীনতম প্রবাহ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[৪৪] এই প্রবাহ সপ্তদশ শতকের পূর্বেই ভৈরববাজারের নিকট সুরমা-মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো এক সময় ব্রহ্মপুত্র নদীর এই প্রবাহ পরিত্যাগ করিলে অপর অন্যতম শাখা যমুনা বেগবান ও বিশাল নদীতে পরিণত হয় এবং এই যমুনা নদীই গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় মিলিত হইয়াছে। বর্তমানে ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদী যমুনা ও মেঘনা নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

মেঘনা বাংলার পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রধান নদী। গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্র নদী অপেক্ষা মেঘনা নদী ছোট হইলেও উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা বারিবহুল অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব ইহা গ্রহণ করিয়াছে—তাহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। মেঘনা খাসিয়া-জয়ন্তিয়া শৈলমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমত আসামের কুশিয়ারা ও সুরমা নদীর মিলিত ধারা মেঘনা নদীর প্রধান অংশ গঠন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত উত্তর প্রবাহে মেঘনা নদীর প্রাচীন নাম সুরমা, এই সুরমা নদী সিলেট জেলা অতিক্রম পূর্বক নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ স্পর্শ করিয়া ভৈরববাজারে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ভৈরববাজারের নিকট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এই বিশাল বেগবতী প্রবাহটিই প্রধানত মেঘনা নামে অধিক পরিচিত। ভৈরববাজারে ব্রহ্মপুত্র, মুন্সীগঞ্জের নিকট বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা এবং শেষত চাঁদপুরে পদ্মা প্রভৃতি নদীর মিলিত ধারা এই নদীকে বেগবান নদীতে পরিণত করিয়াছে। তাহাছাড়া এই নদীর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় দ্বিতীয় শতকে টলেমী কর্তৃক উল্লেখিত গঙ্গার অন্যতম প্রবাহমুখের নাম "মগা" হইতে মেঘনা নামের উদ্ভব বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।[৪৫]

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য নদী যথাক্রমে অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নদীসমূহের মধ্যে কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয় ব্যতীত অপরগুলি বিহারের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উদ্ভব হইয়াছে। রেনেলের মানচিত্রে এই সকল নদীর গতিপথের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই নদীগুলির বর্তমান গতিপথের খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।[৪৬] অজয় নদী বাকুড়া ও বীরভূম জেলার উচ্চভূমি অতিক্রম করিয়া কাটোয়ায় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দামোদর নদী বরাকর হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া রানিগঞ্জ ও বর্ধমানের পার্শ্বদিয়া ভাগীরথী-রূপনারায়ণের মিলিত ধারার সামান্য উত্তরে হুগলী নদীতে মিশিয়াছে।[৪৭] দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীদ্বয় রূপনারায়ণ নদীর দুইটি প্রবাহ, ইহা হলদিয়ার নিকটবর্তী হুগলী নদীতে প্রবাহিত হইয়াছে। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদী দুইটি উড়িষ্যার পার্বত্য এলাকা হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার সীমা নির্ধারণ করিতেছে।[৪৮]

তিস্তা বাংলার উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রধান নদী। ইহা হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দার্জিলিং জলপাইগুড়ির মধ্যদিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং জলপাইগুড়ি হইতে ইহার তিনটি প্রবাহ দক্ষিণবাহী হইয়া তিনদিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্বতম প্রবাহ করতোয়া, মধ্যবর্তী প্রবাহ আত্রাই এবং পশ্চিমতম প্রবাহ পূর্ণভবা নামে পরিচিত।[৪৯] রেনেলের মানচিত্রে তিস্তার এই তিনটি প্রবাহের উল্লেখ রহিয়াছে। এই তিনটি প্রবাহে প্রবাহিত তিস্তা নদীর নাম সম্ভবত সংস্কৃত ত্রিস্রোতা হইতে তিস্তা হইয়াছে।[৫০] ইহাদের মধ্যে করতোয়া এককালে সর্ববৃহৎ ও পবিত্রতম নদী ছিল তাহা একাদশ শতকের করতোয়া মাহাত্ম্যও গ্রন্থের উল্লেখ হইতে জানা যায়।[৫১] সেই সময় ইহা পুণ্ড্রনগরের পার্শ্বদিয়া প্রবল বিক্রমে প্রবাহিত হইত। রেনেলের মানচিত্রেও ইহার বড় খাত দেখান হইয়াছে। বর্তমানে এই নদী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং মহাস্থানের ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আত্রাই ও পূর্ণভবা নদী দুইটি করতোয়ার মতই ক্ষীণকায়া হইয়া

পড়িয়াছে। এই নদীত্রয়ের দুরবস্থার কারণ হিসাবে ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার ১৭৮৭ সালে সংঘটিত সবগ্রাসী প্লাবনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।[৫২] এই প্লাবনে তিস্তার প্রধান প্রবাহ পূর্বপথ পরিহার করিয়া দক্ষিণ পূর্বে সরিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইলে ইহারা দুর্দশার সম্মুখীন হয়।

উত্তর বাংলার অপর একটি নদী হইল কোশী। এককালে ইহা বাংলার উত্তরাঞ্চলের মধ্যদিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত। বর্তমানে ইহা বাংলার বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া রাজমহলের সামান্য উত্তরে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কোশী নদীর খাত পরিবর্তন একটি অদ্ভুত ব্যাপার। ইহা এক সময় পূর্বগামী ও ব্রহ্মপুত্র অভিমুখী ছিল। কিন্তু কালের ব্যবধানে ইহার গতিপ্রবাহ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং একেবারে পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়াছে। কোশী নদীর এই খাত পরিবর্তনের ফলে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-পাণ্ডুয়ার মতো ঐতিহাসিক স্থান ইহাদের মর্যাদা হারাইয়াছে।[৫৩]

বাংলার এই নদনদীসমূহ বাংলার প্রাণ। ইহারা বাংলার ভূপ্রকৃতি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের গতিপ্রকৃতি বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছে। অবশ্য এই অঞ্চলের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে এই নদীসমূহ চিহ্নিত হইলেও প্রাচীনকালে ইহাদের ধারাবাহিক গতিপথের পুনর্গঠন করা অসম্ভব। তবে বর্তমান কালের মতই প্রাচীন কালেও এই নদনদীসমূহের গতি পরিবর্তিত হইত। কারণ সমতলভূমিতে নদীর খাত পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই নদনদীসমূহের তীরবর্তী অঞ্চলে শহর, বন্দর ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠিত, তাহাছাড়া রাজনৈতিক কেন্দ্রও ইহাদের তীরে স্থাপিত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গৌড় প্রাচীন বাংলার একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু কালের ব্যবধানে গঙ্গা নদীর খাত পরিবর্তন ইহার মর্যাদা বিনষ্ট করিয়াছে, গৌড় হইয়াছে অস্বাস্থ্যকর এবং বসবাসের অযোগ্য। ইহার ফলে গৌড় তাহার গুরুত্ব হারাইয়াছে। আবার তাম্রলিপির মত বন্দরও নদীর গতি পরিবর্তনে দুদশাগ্রস্থ হইয়াছে। তাহাছাড়া প্রাচীন বাংলার শাসকদের সামরিক বাহিনীর একটি শাখা হিসাবে নৌবাহিনী ছিল অন্যতম। ইহার বহু বিবরণ তৎকালীন লিপিমালা ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুতরাং এই নদীসমূহের গতিপথের পরিবর্তন ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক গুরুত্বকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই সকল রাজনৈতিক কেন্দ্রের উত্থান-পতনে বাংলার বিভিন্ন শাসক বংশের সমৃদ্ধি ও অবনতি নির্ভর করিত। সুতরাং এই নদীসমূহ যেমন বাংলাকে সমৃদ্ধির উচ্চশিখর দান করিয়াছিল তেমনি ইহার গতিপ্রকৃতি বাংলার সমৃদ্ধির প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়াছে। তাই নিদ্বিধায় এই নদনদীর গতিপথের পরিবর্তন প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা ও সামগ্রিক কার্যকলাপে যে গভীর প্রভাব ফেলিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ নামে কোনো অখণ্ড দেশ ছিল না। ইহার এক একটি অংশ এক একটি নামে পরিচিত ছিল। এই এক একটি অংশই জনপদ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই

জনপদগুলি সাধারণত এক একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ লইয়া গড়িয়া উঠিত। ফলে সেই অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠীর নামেই পরিচিত হইত। যেমন : বঙ্গ–গৌড়–পুণ্ড্র–রাঢ় প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা পৃথক পৃথক জনপদ ছিল। আবার এই জনপদসমূহের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির উপর ইহাদের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল কখনও সম্প্রসারিত হইত, কখনও সংকুচিত হইত। তাই ইহাদের নির্দিষ্ট সীমানা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এই জনপদগুলি কখন কতখানি জায়গা জুড়িয়া ছিল তাহা নিরূপণ করা সম্ভব না হইলেও ইহা নিশ্চিত ছিল যে, একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বেষ্টনীর ভিতর ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত। বাংলার প্রাকৃতিক সীমানার একটি সুন্দর বর্ণনা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য ; উত্তর পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা ; উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো–খাসিয়া–জৈন্তিয়া ত্রিপুরা–চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল–সাঁওতাল পরগণা–ছোটনাগপুর–মানভূম–ধলভূম–কেওনঞ্জর–ময়রভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।"[৫৪] পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, সুহ্ম ও রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদগুলি উক্ত প্রাকৃতিক সীমানার ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জনপদগুলি সম্পর্কে প্রাচীন লিপিমালা, সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থ এবং বিদেশীদের বিবরণ হইতে বহু তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

১ পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্র : পুণ্ড্রবর্ধন একটি সুপ্রাচীন জনপদ। পুণ্ড্র নামীয় জাতির ভিত্তিতে এই অঞ্চলের নাম হইয়াছে পুণ্ড্রবর্ধন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে ইহা অনুমান করা সম্ভব। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব লইয়া বিতর্ক থাকিলেও সাধারণত ইহার স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী বলিয়া অনুমান করা হয়।[৫৫] অবশ্য এখানে পুণ্ড্ররা অন্ধ্র–পুলিন্দ–শবর জাতির সহিত একই সঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে।[৫৬] সুতরাং পুণ্ড্রদের আবাসভূমি পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিতি লাভ করিবে—ইহা অস্বাভাবিক নয়। ইহার সমর্থন মহাস্থানলিপি হইতেও পাওয়া যায়।[৫৭] কালের পরিক্রমায় পুণ্ড্র অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়। গুপ্তযুগেই ইহার প্রথম সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।[৫৮] সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান–চুয়াং ইহার সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। পাল ও সেন আমলের লিপিমালায় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫৯]

পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থান ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আর্যাবর্তের সীমান্তে, মহাভরতের দ্বিগ্বিজয় পর্বে মুঙ্গেরের পূর্বে এবং পুরাণ ও বৃহৎ-সংহিতায় পূর্বদেশীয় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।[৬০] করতোয়া মাহাত্ম্য গ্রন্থে করতোয়া নদী প্রবল বিক্রমে পুণ্ড্রনগরের পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইবার উল্লেখ আছে।[৬১] সপ্তম শতকের চীনা ভ্রমণকারী য়ুয়ান–চুয়াং এই অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে কজঙ্গল ও করতোয়া নদী মধ্যবর্তী ভূভাগই পুণ্ড্রবর্ধন ছিল। এবং এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল পুণ্ড্রনগর হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।[৬২] প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহামও ইহার সমর্থন করিয়াছেন, বস্তুত প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে ইহার প্রমাণ মিলিয়াছে।[৬৩]

রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণও পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাকৃতিক সীমানাকে বর্ধিত করিয়াছিল। এই কারণেই সম্ভবত ভবিষ্যপুরাণে গৌড়, বরেন্দ্র, সুহ্ম, নিবৃতি, ঝারিখণ্ড, বরাহভূমি ও বর্ধমান নামে পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত সাতটি প্রদেশ হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।[৬৪] পাল আমলে পুণ্ড্রবর্ধন ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল পর্যন্ত এবং সেন আমলে খাড়িমণ্ডল ও বাখরগঞ্জ সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[৬৫] পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত অপর একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বরেন্দ্র মণ্ডল। তর্পণদীঘি, মাধাইনগর তাম্রশাসন হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৬] সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে বরেন্দ্রকে পালদের পিতৃভূমি (জনকভু) এবং ইহার দক্ষিণে গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ইহার অন্তগত ও পুণ্ড্রবর্ধন প্রধান নগর হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।[৬৭] সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা এবং সম্ভবত পাবনা জেলার বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া বরেন্দ্রভূমি ছিল।[৬৮]

২. সুহ্ম ও রাঢ় : সুহ্ম সর্বপ্রথম পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লেখিত হইয়াছে।[৬৯] বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে।[৭০] ইহার অন্তর্গত সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে দশকুমার চরিত গ্রন্থে তাম্রলিপ্তির কথা বলা হইয়াছে।[৭১] এবং বৃহৎসংহিতায় সুহ্মের অবস্থান বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৭২] এই সমস্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চল সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল এবং তাম্রলিপ্ত ইহার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে সর্বপ্রথম সুহ্মের সহিত সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ জনপদ রাঢ়ের উল্লেখ রহিয়াছে।[৭৩] রাঢ় অঞ্চলটি জাতিবাচক রাঢ়া শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনেকে প্রকাশ করিলেও ইহার স্বপক্ষে তেমন বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৭৪] নবম-দশম শতক হইতেই এই প্রখ্যাত জনপদটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে : উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। আবার রাঢ়ের দক্ষিণতম অংশ ছিল সুহ্মভূমি যাহা দক্ষিণ রাঢ় হিসাবে এবং উত্তরতম অংশ বজ্জভূমি যাহা উত্তর রাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভাগপতি-মুঞ্জুর গাওয়ানরী লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৫] অপরদিকে নবম শতকের গঙ্গের রাজা দেবেন্দ্র বর্মনের লিপিতে রাঢ়ের উত্তর অংশকে উত্তর রাঢ় বলা হইয়াছে।[৭৬] বেলাব[৭৭] ও নৈহাটি[৭৮] লিপি হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ রাঢ় দামোদর ও সম্ভবত রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমা কোনো কোনো সময় গঙ্গানদী আতিক্রম করিয়া আরও উত্তরে সুবিস্তৃত হইত। সাধারণভাবে অজয় নদী উভয় রাঢ়কে বিভক্তকারী সীমানা হিসাবে গণ্য হইত।[৭৯] সুতরাং রাঢ় বলিতে বর্তমান বর্ধমান বিভাগের সমগ্র ভূভাগকেই বুঝান হইত এবং ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর্যটক জাও দ্যা ব্যারোসের নকশায় এই বিভাগটিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এককথায় বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সম্ভবত রাঢ় দেশ বিস্তৃত ছিল।

৩. গৌড় : গৌড় জনপদটি একটি সুপ্রাচীন জনপদ। পাণিনি সূত্রে গৌড়পুরের ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ হইতে ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।[৮০] অবশ্য

প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইলেও ইহার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয় নাই। ঈশান-বর্মণের হড়াহালিপিতে গৌড় জনপদটি সমুদ্র তীরবর্তী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।[৮১] আবার সপ্তম শতকের লিপি ও তথ্যে শশাঙ্ক গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চুয়াং[৮২] তাহাকে কর্ণসুবর্ণের সম্রাট এবং বাণভট্ট স্বীয় হর্ষচরিত[৮৩] গ্রন্থে তাঁহাকে গৌড়াধিপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় এক অভিন্ন অঞ্চলভুক্ত দেশ হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনে সম্ভবত গৌড়দেশ অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। কারণ শশাঙ্কই প্রথমে গৌড়ের সম্রাট হিসাবে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সুতরাং ক্ষমতার প্রাধান্য অনেক সময় জনপদের ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারণ করিয়াছে—গৌড় ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কারণ গৌড় বলিতে সংকীর্ণ অর্থে আবার মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদহ জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝাইত।[৮৪] অবশ্য কালের ব্যবধানে সমগ্র বাংলা গৌড় দেশ হিসাবেও আখ্যায়িত হইয়াছে। বিশেষত শশাঙ্কের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে গৌড় দেশটি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই গৌড়ের খ্যাতি এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, হর্যচরিতে শশাঙ্ককে গৌড়রাজ বলিয়া অভিহিত হইতে দেখা যায়।[৮৫] লিপিমালা হইতে অবগত হওয়া যায় যে সেন রাজগণ "গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপতি" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৮৬]

প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে গৌড় ও বঙ্গ নামে সমগ্র বাংলা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় গৌড়, সারস্বতদেশ, কান্যকুব্জ, উৎকল ও মিথিলা—এই পাঁচটি দেশ সম্মিলিতভাবে পঞ্চ গৌড়[৮৭] নামে অভিহিত হইয়াছে। পালরাজ ধর্মপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি হইতে এই প্রকার নামের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনাই অধিক।[৮৮] কিন্তু মুসলমান যুগের শেষ পর্যায়ে গৌড় বলিতে সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝাইত।

৪. **বঙ্গ :** বঙ্গ একটি সুপ্রাচীন জনপদ। সর্বপ্রথম ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৯] অনেকে ইহাকে বঙ্গজাতি হইতে দেশটির নাম বঙ্গ হইয়াছে বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ দেশের নাম জাতির নাম হইতে আসিয়াছে। এই কারণে সংস্কৃতে দেশ নামে সাধারণত বহুবচন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গ জাতি অধ্যুষিত জনপদ হইল বঙ্গদেশ।[৯০] অবশ্য শব্দটি চীনা তিব্বতীয় শব্দ এবং শব্দটির অং অংশের মৌলিক অর্থ জলাভূমি বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়াছেন।[৯১] যাহারা জলাভূমির দেশে পুরুষানুক্রমিকভাবে বসবাস করিতেন তাহারা বঙ্গ এবং তাহাদের আবাসভূমি বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়াছে।[৯২] সে যাহাই হউক, এই বঙ্গ ছিল পূর্বাঞ্চলীয় দেশ। বৌধায়ন ধর্মসূত্র, পুরাণ, শিলালিপি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯৩] ইহার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস হইতে তথ্য মিলিয়াছে। কবি কালীদাস পদ্মা ও ভাগীরথী মধ্যবর্তী অঞ্চল বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৯৪] এই ভূভাগই সম্ভবত টলেমীর "গঙ্গারিডাই।"[৯৫] রঘু কাপিশা নদী অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।[৯৬] ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, বঙ্গের পশ্চিম সীমা তখন কাঁসাই নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল।[৯৭] কিন্তু এই সম্পর্কে রঘুবংশ

কাব্যগ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া ভাগীরথী হইতে কাঁসাই নদী পর্যন্ত ভূভাগকে সুহ্ম অঞ্চল বলা হইয়াছে এবং রঘু এই সুহ্ম হইতে বঙ্গ জয়ে আসিয়াছিলেন।[৯৮] আবার শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের "ষটপঞ্চাশদ্দেশ বিভাগ" গ্রন্থে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত অঞ্চলকেই বঙ্গ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৯৯] ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, ময়মনসিংহ জেলার অভ্যন্তরে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ ইহার পূবসীমা নির্ধারণ করিযাছে। সম্ভবত সুন্দরবনের পূর্বপ্রান্ত হইতে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহিত স্রোতধারার মধ্যবর্তী ভূভাগই ছিল "বঙ্গ"। সেনলিপিমালায়ও এই ধরনের ইঙ্গিত করা হইযাছে।[১০০] ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গ জনপদের সীমা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন. "সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র ইহার সীমারেখা ছিল।"[১০১]

ইহাছাড়া বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে উপবঙ্গ জনপদের উল্লেখ রহিয়াছে।[১০২] যশোর ও তৎসংলগ্ন বনভূমি উপবঙ্গ বলিয়া দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[১০৩] পাল শাসনের শেষার্ধে বঙ্গভূমি উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল নামে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সেন লিপিমালায় বিক্রমপুর ভাগ ও নাব্য মণ্ডল নামে ইহা অভিহিত হইয়াছে।[১০৪] বিক্রমপুর এখনও সুপরিচিত এবং নাব্যভাগের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। আবার বঙ্গের সহিত সম্পর্কিত হরিকেল ও সমতট জনপদের উল্লেখ য়ুয়ান-চুয়াং এর বিবরণ হইতে পাওয়া যায়।[১০৫] কিন্তু আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প[১০৬] গ্রন্থে ইহা পৃথক পৃথক অঞ্চল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

৫. **সমতট :** দক্ষিণ-পূর্ববাংলার অপর একটি জনপদ সমতট। সর্বপ্রথম সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।[১০৭] সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চুয়াং এই অঞ্চলকে নাব্য, আর্দ্র ও সমুদ্রতীরবর্তী এবং কামরূপের দক্ষিণে বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।[১০৮] আবার সপ্তম শতকের শেষার্ধের চীনা পরিব্রাজক ইৎসিংয়ের বর্ণনায় সমতটের রাজভট নামক রাজার উল্লেখ আছে।[১০৯] এই রাজভট সম্ভবত খড়গরাজবংশ সম্ভূত এবং খড়গবংশের রাজধানী ছিল কর্মান্ত। ইহা কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বড় কামতা। শবাণী মূর্তিলিপি হইতেও ইহার প্রমাণ মিলিয়াছে।[১১০] আবার কুমিল্লা জেলায় প্রাপ্ত শ্রীধারণরাতের তাম্রলিপিতে তাহাদেরকে সমতটেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাদের রাজধানী ছিল ক্ষীরোদা নদীর তীরবর্তী 'দেবপর্বত'।[১১১] পরবর্তী চন্দ্রবংশীয় রাজাদের লিপিতে সমতট ও দেবপর্বতের উল্লেখ আছে।[১১২] ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, দেবপর্বত ছিল লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।[১১৩] তাহাছাড়া ত্রয়োদশ শতকের রাজা দামোদর দেবের তাম্রশাসনে সমতটের উল্লেখ আছে।[১১৪] উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে মেঘনা-পূর্ববর্তী অঞ্চলকেই সমতট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ড. মমিন চৌধুরী কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল লইয়া সমতট গঠিত হইবার কথা বলিয়াছেন।[১১৫] আবার এই সমতটের পশ্চিম সীমা এক সময় ২৪ পরগণার খাড়ি-পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী অঞ্চলই সমতট নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া নীহাররঞ্জন রায়

অনুমান করিয়াছেন।[১১৬] উপর্যুক্ত দুইটি বক্তব্য হইতে সমতটের রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ সম্পর্কে উপলব্ধি করা সম্ভব। বিশেষত চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে সমতট ও বঙ্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং ইহা হইতে বলা সম্ভব যে, সমতটের সীমারেখা সকল সময় এক ছিল না, বিভিন্ন সময় ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছিল।

পূর্ববাংলায় প্রাপ্ত কিছু মুদ্রায় সমতটের সহিত সম্পর্কিত একটি ভৌগোলিক অঞ্চল 'পট্টিকেরা' নামের উল্লেখ রহিয়াছে।[১১৭] সম্ভবত কুমিল্লা অঞ্চলের পট্টিকেরা পরগণা হইতেই এই মুদ্রা অঙ্কিত হইত। চন্দ্রবংশীয় লডহ্ চন্দ্রের তাম্রলিপি এবং শ্রী লডহ্ মাধব ভট্টারকের মূর্তি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১৮] ইহাছাড়া হরিকেলদেবের তাম্রলিপি[১১৯] ও অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে[১২০] উল্লেখিত তথ্যেও ইহার সমর্থন মিলিয়াছে। মুগল রাজস্ব তালিকায় কুমিল্লা জেলার পট্টিকারা পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২১] ইহা লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল মনে করা হয়।[১২২] এই সকল তথ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কুমিল্লা জেলার বিশেষ একটি অঞ্চল পট্টিকেরা নামে পরিচিত ছিল। ইহা খুব সম্ভবত লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল।

৬. হরিকেল : হরিকেল জনপদের সর্বপ্রথম উল্লেখ চৈনিক বিবরণে পাওয়া যাইতেছে। ইৎসিং সপ্তম শতাব্দীতে সিংহল হইতে জলপথে হরিকেল আসিয়াছিলেন এবং ইহাকে পূর্বভারতের পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল হিসাবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, হরিকেল ছিল বাংলাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল।[১২৩] চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত কান্তিদেবের তাম্রলিপি এইরূপ অনুমানের ভিত্তিকে মজবুত করিয়াছে।[১২৪] তাহাছাড়া হরিকেল নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[১২৫] রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জুরী গ্রন্থে পূর্বদেশীয় হরিকেল জনপদের নারীদের প্রশংসা করা হইয়াছে।[১২৬] উপরোক্ত তথ্যের আলোকে অনেকে হরিকেলকে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জনপদ বলিয়া অনুমান করেন এবং সম্ভবত চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল প্রাচীন হরিকেল।[১২৭] আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলকে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল দেখান হইয়াছে।[১২৮] আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য ও রূপচিন্তামণিকোষ গ্রন্থদ্বয়ে হরিকেল ও সিলেটকে অভিন্ন অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১২৯] সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্য হইতে একটি বিষয়ই প্রতীয়মান হয় যে, হরিকেল জনপদ প্রাচীন যুগে এক ও অভিন্ন অথবা অপর একটি জনপদের অংশবিশেষ ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ হরিকেল জনপদের পরিধিরও বিস্তৃতি ঘটাইয়াছিল। রোহিতাগিরির (লালমাই) সামন্ত ত্রৈলোক্যচন্দ্র পরবর্তীতে হরিকেল রাজ্যের ক্ষমতার আধার হইয়াছিলেন। চন্দ্রলিপিতে উল্লেখিত হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি ছিল লালমাই, সমতট ও চন্দ্রদ্বীপ সংলগ্ন এবং পরবর্তীতে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরা চন্দ্রদ্বীপ ও সমতট অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং চন্দ্রবংশীয়দের হস্তে হরিকেল রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়াছিল—ইহাই প্রমাণ করিতেছে। এই সময় হরিকেল রাজ্যের পরিধি কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল রাজ্যের ক্ষমতার আধার হইয়াছিলেন।

তাহাছাড়া চন্দ্র রাজাদের ক্ষমতার উন্মেষ বঙ্গ-সমতট এলাকায় বিস্তৃতি ঘটিবার ফলে হরিকেল জনপদের পরিসীমা বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তাহা উপর্যুক্ত তথ্যে সমর্থন করিয়াছে।[১৩০] ডাকার্ণব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপিতে সিলেটকে হরিকেল বলা হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতেরা সিলেট পর্যন্ত হরিকেল জনপদ সম্প্রসারিত হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।[১৩১]

সুতরাং হরিকেল ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চল। ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলেই হরিকেল জনপদের আদি অবস্থিতির কথা বলিয়াছেন। পরবর্তীতে হরিকেল রাজাদের শাসনকালে সমতট অঞ্চল পর্যন্ত হরিকেল জনপদের সীমা প্রসারিত হয় এবং চন্দ্রবংশীয়দের হস্তে ইহার আরও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়।[১৩২] সম্ভবত এই সময় হরিকেলের ভৌগোলিক পরিধি সর্বকালের অধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়া স্বীয় ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

উপসংহারের বলা সম্ভব যে, প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশ পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, সুহ্ম, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। এই জনপদগুলি প্রতিটি স্বতন্ত্র ও পৃথক ছিল। আবার সময়ে সময়ে ইহাদের সংযোগ সাধিতও হইত। তাই ইহাদের সীমারেখা নির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। মূলত বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই ইহাদের বৈচিত্র্য দান করিত। বাংলার নদনদী বাংলাকে প্রাকৃতিকভাবে গঠন করিয়াছে। আর এই নদনদীর প্রবাহকে কেন্দ্র করিয়া ইহারা স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিত। এই নদনদীসমূহের ভাঙ্গাগড়াও এই জনপদসমূহের সংকোচন ও বৃদ্ধিতে অনেক সময় সাহায্য করিত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার উন্মেষ ও ক্রমাবনতি এই ভূখণ্ডগত হ্রাসবৃদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব ফেলিত। এক একটি কোমের উত্থানে এক একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হইত। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার উন্মেষ ও সম্প্রসারণে জনপদগুলির সীমানাও বৃদ্ধি পাইত। সম্ভবত এই কারণে ইহাদের সীমার বারবার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাই যুগে যুগে পরিবর্তিত ইহাদের সীমানার বিস্তার ও সংকোচনের আলোচনা অত্যন্ত জটিল। যাহাই হউক, মহারাজ শশাঙ্কের সময় হইতে পর্যায়ক্রমে সকল জনপদগুলি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলাফল স্বরূপ ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং মুসলিম যুগে আসিয়া একটি সংঘবদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হয়।

খ. সেনরাজবংশের ইতিহাস

সেনরাজবংশের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে অতি তাৎপর্যপূর্ণ যুগ। তাহাদের পূর্বসূরি পালরাজবংশের রাজ্য বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেনরাজবংশের রাজ্যভুক্ত ছিল শুধু বাংলা নামের ভূভাগ। তাহাদের শাসনকালকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমত, কর্ণাটাগত সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে সেনরাজ বিজয়সেন সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইয়া ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলায় স্বীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ করেন। তৃতীয়ত, অবশেষে মুসলিম আক্রমণে এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে এই রাজবংশের পতন হয়। এই রাজবংশের ইতিহাস সম্পর্কে সমসাময়িক লিপিমালা, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আমাদেরকে বহু মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়া থাকে।

কর্ণাটাগত সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ সামন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাঁহারই পরবর্তী পুরুষ বাংলায় রাজক্ষমতার অধিকারী হন।[১] তবে এই রাজবংশ কখন, কি উপায়ে ও কি কারণে বাংলায় আগমন করেন এবং এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন—ইহার বিস্তারিত বিবরণ আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই।

সেন নৃপতিগণ নিজেদেরকে 'ক্ষত্রিয়'[২], 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়'[৩], 'কর্ণাট ক্ষত্রিয়'[৪] প্রভৃতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সেন লিপিমালায় তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বীরসেনকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।[৫] বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত অনেক যুদ্ধাভিযান করিয়া এবং দুর্বৃত্ত কর্ণাটলক্ষ্মী অপহরণকারী শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতটের পুণ্যাশ্রমে বসবাস করিয়াছেন—এই উক্তিও সেনলিপিতে পাওয়া যায়।[৬] আবার অপর একটি সেনলিপিতে বলা হইয়াছে যে, কর্ণাটাগত চন্দ্রবংশীয় কোনো একটি সেন পরিবার রাঢ় অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন, এই পরিবারে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।[৭]

সেনলিপিমালার সাক্ষ্যে পরস্পরবিরোধী উক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন একটি লিপি হইতে অনুমিত হয় যে, সামন্তসেনই বাংলাদেশে বসবাসকারী সেনরাজবংশের প্রথম পুরুষ। আবার অন্য একটি লিপি তথ্য হইতে মনে হয় যে, সামন্তসেনের পূর্বেই সেনবংশ রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন, "কর্ণাটের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ়দেশে বসবাস করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা কর্ণাটদেশের সহিতও সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাটদেশে বহু যুদ্ধে নিজের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়া এই বংশের উন্নতির সূত্রপাত করেন।[৮] সুতরাং সেনবংশীয় নৃপতিরা যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে আগত এবং সামন্তসেন সেনরাজবংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব—ইহাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

ইহাছাড়া সেনলিপিমালায় তাঁহারা 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়'[৯] বলিয়া আখ্যায়িত হইলেও বাংলাদেশের প্রাচীন কুলজী শাস্ত্রে তাঁহাদেরকে বৈদ্যজাতীয় বলা হইয়াছে। অপরদিকে আধুনিককালে তাহাদেরকে কায়স্থ এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সুপরিচিত জাতিভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস চলিয়াছে।[১০] কিন্তু তাহাদের লিপিমালায় ও সমসাময়িক সাহিত্যে ইহার কোনো সমর্থন নাই। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁহাদের লিপিমালায় প্রদত্ত উক্তিটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ড. আর. ভাণ্ডারকরের উক্তিটি সাধারণভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার অভিমতে, সেনগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীতে ক্ষত্রিয়ধর্ম অর্থাৎ যোদ্ধাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১১] এই প্রকারের বৃত্তি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যত্রও ছিল। উদাহরণস্বরূপ সুঙ্গ, কাহ্নবা, প্রতীহার, সাতবাহন, চাহামন প্রভৃতি রাজবংশ এরূপ বৃত্তি পরিবর্তন করিয়াছিল।[১২]

কিন্তু সেনরাজবংশ কিভাবে ও কি কারণে বাংলায় আগমন করিয়াছিল—ইহা আজও প্রশ্ন হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আছে। সেনলিপিমালায়ও ইহার সঠিক ইঙ্গিত প্রদান করা হয়

নাই। তাই ঐতিহাসিকেরা সমসাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। প্রথমত অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সেনরা কর্ণাট হইতে বাংলায় আসিয়া পালরাজাদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, পাল রাজাদের কর্মচারিগণ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নিযুক্ত হইতেন। দেবপাল হইতে মদনপাল পর্যন্ত পাল লেখমালায় উল্লেখিত কর্মচারীর তালিকায় নিয়মিতভাবে গৌড়-মালব-খস-হূণ-কলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। লিপি সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, পাল রাজারা গৌড়, মালব, খস প্রভৃতির ন্যায় কর্ণাটগণকে সৈনিক বা কর্মচারী পদে নিযুক্ত করিতেন। তাই এমনও হইতে পারে যে, কর্ণাটাগত সেনবংশীয় কোনো একজন কর্মচারী শক্তি সঞ্চয় করিয়া পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন।[১৩] এই ধরনের উক্তি নৈহাটি তাম্রলিপিতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় অনেক রাজপুত্র রাঢ় দেশের অলংকারস্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদেরই বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] এই তথ্যের ভিত্তিতে ড. মমিন চৌধুরী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, খুব সম্ভবত বিজয়সেন ও তাহার পিতা হেমন্তসেন সামন্ত প্রভু হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার উন্মেষ ও বিস্তার করেন।[১৫]

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে, কর্ণাটাগত সেন রাজাগণের পূর্বপুরুষ দক্ষিণাগত কোনো আক্রমণকারী রাজার সহিত বাংলায় আসিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে উত্তর-পূর্ব ভারত আক্রমণকারী চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ও প্রথম সোমেশ্বরেব নাম উল্লেখযোগ্য। চালুক্যরাজন্যদের এই ধরনের আক্রমণের ফলে উত্তব বিহার ও নেপালে নান্যদেব এবং উত্তব-ভারতে গাহাড়বাল বংশ শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই কর্ণাট দেশীয় ছিলেন। সুতরাং কর্ণাটীয় সমর সফলতার ফলে কর্ণাটী সেনবংশ বাংলায়ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবেন--এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। উপর্যুক্ত উভয় সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গত হইলেও সেনলিপিমালায় ইহাদের কোনো উল্লেখ না থাকায় এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ।[১৬]

ঐতিহাসিকদের মতানুসারে নিম্নে সেনবংশীয় রাজাদের কাল নির্ণয়ের ছক প্রদত্ত হইল।[১৭]

সামন্তসেন	...	
হেমন্তসেন	...	
বিজয়সেন	...	আঃ ১০৯৭–১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ
বল্লালসেন	...	আঃ ১১৬০–১১৭৮ ”
লক্ষ্মণসেন	...	আঃ ১১৭৮–১২০৬ ”
বিশ্বরূপসেন	...	আঃ ১২০৬–১২২০ ”
কেশব সেন	...	আঃ ১২২০–১২২৩ ”

সুতরাং সামন্তসেন সেনরাজবংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি যে কর্ণাটে বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেনলিপিমালায় তাহার কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠার অথবা রাজকীয় উপাধি

গ্রহণের ইঙ্গিত নাই। সম্ভবত তিনি কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই, হয়ত এই কারণেই তাহার পৌত্র বিজয়সেনের অথবা তাহার বংশধরদের লিপিতে তাহার নামের সহিত কোনো রাজকীয় উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। অপরদিকে বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনকে 'মহারাজাধিরাজ'[১৮] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজকীয় উপাধি হইতে ঐতিহাসিকেরা হেমন্তসেনকে সেনরাজবংশের প্রথম রাজা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। কারণ বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে হেমন্তসেনকে 'রাজরক্ষা সুদক্ষ'[১৯] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খুব সম্ভবত তিনি পাল সাম্রাজ্যের একজন সামন্তরাজা এবং কৈবর্ত বিদ্রোহে অধিরাজ রামপালের সাম্রাজ্য রক্ষার্থে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২০] আমরা যদি হেমন্তসেনকে পালসম্রাট রামপালের সামন্ত ছিলেন মনে করি, তবে কিন্তু বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া উল্লেখ কেন করা হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তর অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দিতে অসমর্থ।

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন সেনরাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পাল রাজগণের অধীন রাঢ় অঞ্চলের সামন্ত হিসাবে তিনি স্বীয় ক্ষমতার প্রসার ঘটান। তিনি সম্ভবত ১০৯৭ হইতে ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি প্রায় সমগ্র বাংলায় সেনবংশের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বকালের মূল্যবান উপকরণ ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, দেওপাড়া শিলালিপি ও পাইকোড় মূর্তিলিপি। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত', আনন্দভট্ট প্রণীত 'বল্লালচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও তাহার সমসাময়িক কালের তথ্য পাওয়া যায়।

বিজয়সেন কিভাবে স্বীয় ক্ষমতার প্রসার ঘটাইয়াছিলেন ও সুসংহত করিয়াছিলেন, ইহা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। রামচরিতে উল্লেখিত নিদ্রাবলীর বিজয়রাজকে সেনরাজ বিজয়সেন হিসাবে অনুমান করা হয়। তিনি বরেন্দ্র উদ্ধারে ভীমের বিরুদ্ধে রামপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন।[২১] ইহার পুরস্কারস্বরূপ বিজয়সেন রাঢ় অঞ্চলে স্বাধীন ক্ষমতা অর্জন করেন। দেওপাড়া লিপিতেও এই ধরনের পুরস্কার লাভের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২২] যাহাই হউক, রামচরিতে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে এন. এন. দাসগুপ্ত রাঢ় অঞ্চল সংলগ্ন গঙ্গা তীরবর্তী নিড়োলকে নিদ্রাবলী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২৩] পাইকোড় মূর্তিলিপিতে উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।[২৪]

কিন্তু সেনলিপিমালায় বিজয়সেন কর্তৃক ক্ষমতার ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক কোনো বিবরণ নাই। সম্ভবত তিনি শূরবংশীয়া রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজের শক্তিকে সুসংহত করেন। এই বিবাহের কথা ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইয়াছে।[২৫] অপরদিকে রামচরিতে পালরাজ রামপালের সামন্ত হিসাবে এই শূরবংশীয়দের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই বিবাহের মাধ্যমে শূরবংশীয়দের নিকট হইতে বিজয়সেন উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় লাভ করেন।[২৬] এতদ্ব্যতীত বিজয়সেন উড়িষ্যারাজ অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিশ্চিতভাবেই লাভবান হইয়া থাকিবেন। এই চোড়গঙ্গ একজন শক্তিশালী

রাজা ছিলেন। কারণ চোড়গঙ্গ কর্তৃক সমগ্র সাগরবেষ্টিত পৃথিবী জয়ের কথা বল্লাল চরিতে উল্লেখিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজয়সেনকে চোড়গঙ্গ সখ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[২৭] এই গ্রন্থটিতে বর্ণিত ঘটনাবলীব ঐতিহাসিক সত্যতা লইয়া ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, ইহা অনস্বীকার্য যে, বিজয়সেন বাংলার তৎকালীন বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বীয় অভিলাষ বাস্তবায়িত করিতে সক্ষম হন।

উমাপতিধর বিরচিত দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয়সেনের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত রাজন্যবর্গ ও পাশ্চাত্যচক্রের বিরুদ্ধে তাহার একটি নৌ-অভিযানের উল্লেখ আছে।[২৮] এই অভিযানের সহিত জড়িত নৃপতিদের দুই–একজন ব্যতীত সকলেই ঐতিহাসিকভাবে শনাক্ত হইয়াছেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে নান্য ছিলেন মিথিলার রাজা কর্ণাট দেশীয় নান্যদেব, গৌড়রাজ ছিলেন মদনপাল এবং রাঘব উড়িষ্যারাজ ছিলেন। ইহাছাড়া সম্ভবত বীর কোটাটবীর রাজা বীরগুণ, বর্ধন কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন অথবা মদনপাল কর্তৃক পরাজিত গোবর্ধন এবং বিজয়সেন কর্তৃক নৌ-অভিযানটি গাহাড়বালরাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু কামরূপরাজ কে ছিলেন, ইহা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। তবে বৈদ্যদেবই কামরূপরাজ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।[২৯]

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিজয়সেন কর্তৃক বিজয়াভিযানের সাফল্য কোন দিকে কতখানি হইয়াছিল। বিদ্যমান সাক্ষ্য হইতে অনুমিত হয় যে, বিজয়সেন তাহাব সমসাময়িক সামন্তরাজা বীর ও বর্ধনকে পরাভূত করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, মিথিলারাজ নান্যদেবকে পরাজিত করিয়া ও গৌড়রাজ মদনপালকে বিতাড়িত করিয়া উত্তর বাংলা অধিকার করেন।[৩০] কিন্তু উড়িষ্যারাজ রাঘব[৩১], কামরূপরাজ বৈদ্যদেব[৩২] এবং পাশ্চাত্য-শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়সেন কর্তৃক প্রেরিত নৌ–অভিযান প্রভৃতির সাফল্য অর্জন বিতর্কিত বিষয় হইয়া আছে।

বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন বিক্রমপুরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাও তাহার দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ইঙ্গিত করিয়া থাকে।[৩৩] সম্ভবত সমতট অঞ্চলভুক্ত সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে ভূমিদান করিবার বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও বিজয়সেনের দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু এই অঞ্চল কখন সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কারণ একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে বর্মণদের শাসন চলিতেছিল। সুতরাং নিশ্চিত যে, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময় বিজয়সেন বর্মণদের নিকট হইতে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলা অধিকার কবিয়া থাকিবেন। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার দেওপাড়া প্রশস্তিতে উল্লেখিত বীরকে ভোজবর্মার উত্তরাধিকারী হিসাবে অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ড. মমিন চৌধুরী ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসমীচীন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।[৩৪]

দেওপাড়া শিলালিপিতে বিজয়সেন কর্তৃক সামরিক সাফল্য অর্জন ছাড়াও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের প্রতি তাঁহার মহানুভবতার বিষয় উল্লেখ আছে।[৩৫] তিনি ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বিত্তশালী ও ধনবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি একজন শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি "পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ" প্রভৃতি উপাধি[৩৬] এবং "অধিরাজ বৃষভশঙ্কর"[৩৭] গৌরবসূচক নামেও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সুতরাং বিজয়সেনই সেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কারণ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র বাংলায় সেনবংশের শাসন তাঁহার সময়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিযানসমূহের ধারাবাহিক বিবরণ আজও অজানা রহিয়াছে। যাহাই হউক সামান্য একজন সামন্তরাজার পদ হইতে বিজয়সেন স্বীয় মেধা, সাহস ও রণকৌশল দ্বারা বাংলায় সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। উপরন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলায় শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হয়। কারণ পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে পাল শাসনব্যবস্থার অবনতি ও পাল সম্রাটদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশৃংখলার সৃষ্টি করিয়াছিল ; এই অবস্থায় তাঁহার সমরনীতি ও আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টায় বাংলায় অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে তিনি পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সহিত তুলনীয়। সুতরাং বিজেতা ও শাসক হিসাবে তাঁহার কার্যক্রম সত্যই প্রশংসার দাবিদার। তাঁহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক আর. সি. মজুমদার যথার্থই বলিয়াছেন, "The long and prosperous reign of Vijayasena was a momentous episode in the History of Bengal."[৩৮]

সেনবংশের অন্যতম শাসক বল্লালসেন পিতা বিজয়সেনের পর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবত তিনি ১১৬০ হইতে ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসনামলে সেন সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। তিনি পিতার মতোই 'অরিরাজনিশঙ্ক শঙ্কর' এবং অন্যান্য সম্রাটসুলভ উপাধি গ্রহণ করেন।[৩৯] তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা রামাদেবীকে বিবাহ করিয়া সেনবংশের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।[৪০]

বল্লালসেনের রাজত্বকালের ইতিহাস পুনর্গঠন করিবার জন্য কয়েকটি মূল্যবান উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে 'নৈহাটি তাম্রশাসন' ও 'সানোখার মূর্তিলিপি' ; বল্লালসেন কর্তৃক বিরচিত 'দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর' এবং আনন্দভট্ট প্রণীত 'বল্লালচরিত' অন্যতম। কিন্তু 'বল্লালচরিত' গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। কারণ ইহাতে উল্লেখিত বিবরণাদি যথেষ্ট সন্দেহযুক্ত। তবু ইহাকে সরাসরি বর্জন না করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সামাজিক চিত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী গ্রহণে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

বল্লালসেন পিতার মতো মহান সামরিক বিজেতারূপে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ না করিলেও তাঁহার সামরিক সাফল্যের কয়েকটি খবর সেনলিপি তথ্যে পাওয়া যায়। নৈহাটি

তাম্রশাসনে বল্লালসেনের বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সানোখারলিপিতে বল্লালসেনের মগধের পূর্বাঞ্চল জয়ের উল্লেখ আছে।[৪১] উল্লেখ্য যে, বিজয়সেনের সামরিক অভিযানে বাংলা হইতে মদনপাল বিতাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং মদনপালের পর গোবিন্দপাল মগধের রাজা হন। সম্ভবত বল্লালসেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মগধের পূবাঞ্চল অধিকার করেন।[৪২] অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে ইহার পরোক্ষ উল্লেখ আছে।[৪৩] বল্লালচরিত গ্রন্থ হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে যে, বল্লালসেন পিতার জীবদ্দশায় মিথিলা জয় করেন।[৪৪] কিন্তু সেই সময় মিথিলা সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ নান্যদেবের পরবর্তী বংশধরদের মিথিলা শাসনের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৫]

বাংলার কুলজী গ্রন্থ অনুসারে বল্লালসেন অনেক সমাজসংস্কারমূলক কার্য এবং বাংলায় কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সমাজে তিনি গোড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[৪৬] তিনি হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে গঠন করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ —এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। এই কুলীন শ্রেণীর লোকদের কিছু কিছু বিশেষ রীতিনীতি মান্য করিতে হইত। ন্যায়পরায়ণতা, জাতিগত পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি সদগুণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই সকল রীতিনীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের সহিত বল্লালসেনের জড়িত থাকিবার কথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।[৪৭] কারণ সমকালীন সাহিত্য ও সেনলিপিতে ইহার কোনো উল্লেখ নাই। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার ভট্টভবদেব, হলায়ুধমিশ্র, অনিরুদ্ধ ভট্ট, জীমূতবাহন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষী হিন্দু সমাজের বহু বিধান প্রদান করিলেও কৌলীন্য প্রথার কোনো উল্লেখ তাঁহাদের রচিত কোনো গ্রন্থে নাই। তাহাছাড়া ব্রাহ্মণদের ভূমিদান সম্পর্কিত সেনলিপিমালার কোথাও কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের ইঙ্গিতও নাই। সম্ভবত বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পরে ব্রাহ্মণেরা এই প্রথা চালু করিয়াছিলেন। কারণ সমাজের উচ্চস্তরভুক্ত ব্রাহ্মণেরা তৎকালীন বাংলার সামাজিক বিধিবিধান প্রবর্তনে সকল সময়েই উদগ্রীব থাকিতেন।[৪৮]

বল্লালসেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে 'বিদ্বানমণ্ডলীর চক্রবর্তী' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।[৪৯] তিনি গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের নিকট বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন। কিন্তু অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন। গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের নির্দেশে বল্লালসেন দানসাগর গ্রন্থটি রচনা করেন। অদ্ভুতগাসর গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।[৫০]

সুতরাং বল্লালসেন তাঁহার রাজত্বকালে সুষ্ঠু ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাপূর্বক পিতৃরাজ্য শুধু রক্ষাই করেন নাই ; বরঞ্চ মগধেও ইহার সম্প্রসারণ ঘটান। অবশ্য কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনে তাঁহার ভূমিকা এখন বিতর্কের উর্ধ্বে। এই ক্ষেত্রে তাঁহার জড়িত থাকিবার সকল কিংবদন্তী

বিদ্যমান তথ্যাবলীর ভিত্তিতে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তিনি যে একজন জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা সন্দেহাতীত।

বল্লালসেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন পিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্ভবত ১১৭৮ হইতে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে সেন সাম্রাজ্যের অভূতপূব উন্নতি ও চরম অবনতি হইয়াছিল। তাঁহার সময়কালের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তাহার রাজত্বকালের আটটি তাম্রশাসন যথা : ১. গোবিন্দপুর তাম্রশাসন (২৪ পরগণা), ২ আনুলিয়া তাম্রশাসন (নদীয়া), ৩. তর্পণদীঘি তাম্রশাসন (দিনাজপুর), ৪. মাধাইনগর তাম্রশাসন (পাবনা), ৫. শক্তিপুর তাম্রশাসন (মুর্শিদাবাদ), ৬ ভাওয়াল তাম্রশাসন (ঢাকা), ৭. সুন্দরবন তাম্রশাসন, ৮. চণ্ডী মূর্তিলিপি (ঢাকা) এবং তাঁহার সভাকবিদের স্তুতিবাচক শ্লোক, তৎপুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসন ও মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন বিরচিত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ উল্লেখ্য।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনগুলিতে তাহার কৃতিত্ব সম্পর্কে অতি স্তুতিবাচক বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনি কৌমারে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের শ্রীহরণ ও যৌবনে কলিঙ্গদেশে অভিযান করিয়াছিলেন, যুদ্ধে কাশীরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ভীরু প্রাগজ্যোতিষের রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।[৫১] সুতরাং ইহা হইতে লক্ষ্মণসেনের হস্তে গৌড, কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশীর রাজাদের পরাজয়ের কথা জানা যায়। কিন্তু পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, এই রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে বিজয়সেন ও বল্লালসেন যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। তবে তাহার তাম্রশাসন 'কৌমার কেলী' কথাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সুতরাং এই সকল যুদ্ধাভিযান লক্ষ্মণসেনের যৌবন বয়সে হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণসেন ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নয়। কারণ মিনহাজের বর্ণনায় বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া আক্রমণের সময় লক্ষ্মণসেনের বয়স প্রায় ৮০ বৎসর ছিল এবং সম্ভবত ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন। সুতরাং পিতা ও পিতামহের রাজত্বকালে তাঁহার যৌবনকাল অতিক্রান্ত হয়।[৫২] তবে ইহাও অসম্ভব নয় যে, বিজয়সেন ও বল্লালসেনের রাজত্বকালে এই সমস্ত অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই, তাই লক্ষ্মণসেনকে পুনরায় এই সকল অঞ্চল বিজয় করিতে হইয়াছিল।[৫৩]

তবে রাজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্মণসেন কিছুটা সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে তাঁহার পুরী, কাশী ও প্রয়াগে সমরজয়স্তম্ভ স্থাপনের উল্লেখ আছে।[৫৪] এই সময় গঙ্গ বংশীর রাজাগণ কলিঙ্গ ও উৎকলে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবত লক্ষ্মণসেন তাঁহাদের পরাজিত করিয়া পুরী দখল করেন। ইহাছাড়া পশ্চিমে গাহাড়বালদের বিরুদ্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। মগধে প্রাপ্ত দুইখানি লিপি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৫] এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধকোষ ও পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতেও ইহার সমর্থন মিলিয়াছে।[৫৬] পালদের পতনে মগধাঞ্চলে গাহাড়বালদের অগ্রগতি সেনসাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিজয়সেন ও বল্লালসেন বিশেষ

সাফল্য অর্জন করেন নাই।[৫৭] সুতরাং লক্ষ্মণসেন কর্তৃক পুরী, কাশী ও প্রয়াগে সমরজয়স্তম্ভ স্থাপন অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল।

রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি উমাপতিধর ও শরণ চেদিরাজা (কলচুরি রাজা) ও এক ম্লেচ্ছ রাজার বিরুদ্ধে সম্ভবত তাঁহার (লক্ষ্মণসেন) জয়লাভের কথা বলিয়াছেন।[৫৮] তখন রতনপুরের কলচুরি রাজবংশের রাজত্ব চলিতেছিল। কলচুরিদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লক্ষ্মণসেনের সাফল্য সভাকবিরা উল্লেখ করিলেও মধ্যপ্রদেশে প্রাপ্ত লিপিতে তাঁহারই (লক্ষ্মণসেন) পরাজয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং উভয় পক্ষের সাফল্য দাবি ইহার ফলাফলকে অনিশ্চিত করিয়াছে।[৫৯] ম্লেচ্ছ অর্থাৎ মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে জয়লাভের উল্লেখ হইতে নীহাররঞ্জন রায় বখতিয়ার খলজীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মণসেনের সাফল্য অনুমান করিয়াছেন।[৬০] আবার জে.এম. রায় ম্লেচ্ছ বলিতে আরাকানের মগদের বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে, মগগণ হয়তো বাংলা আক্রমণ করিয়াছিল এবং লক্ষ্মণসেন তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।[৬১]

বহু সমরবিজেতা লক্ষ্মণসেন শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মচর্চায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন এবং তাহার রচিত কয়েকটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাছাড়াও তিনি পিতা বল্লালসেনের অসমাপ্ত অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটির রচনা শেষ করেন। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর তাঁহার রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থ রচয়িতা হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্র ব্যতীত শিল্পক্ষেত্রেও বাংলা এই সময় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। পিতা বল্লালসেন ও পিতামহ বিজয়সেনের শৈবধর্ম পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতা ও পিতামহের চিরাচরিত 'পরম মাহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি এবং 'অরিরাজ মদন শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেন।[৬২] তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মিনহাজউদ্দীন তাঁহার দানশীলতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ভারতের একজন মহানুভব শাসক হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।[৬৩]

কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শেষজীবন সুখের ছিল না, কারণ এই সময় তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তখন রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ দেখা দিয়াছিল। সুন্দরবন অঞ্চলের এক মহামাণ্ডলিকের পুত্র ডোম্মনপাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৪] অপরদিকে প্রায় একই সময়ে মেঘনা নদীর পূর্বপার্শ্বে দেববংশ নামে একটি স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়।[৬৫] ইহা হইতেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অন্তর্বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। এমনই এক সঙ্কটকালে (১২০৪ খ্রি.) নদীয়ায় মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়।[৬৬] বখতিয়ার খলজী নামক এক মুসলিম সৈনিক সেনরাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার পশ্চিম-উত্তরাংশে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন। বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণ ও জয়ের বিবরণ সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, বখতিয়ার বিহার জয়

করিয়া নদীয়া অভিযান করেন। এই সময় বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন নদীয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন। বখতিয়ারের বিহার জয়ের সংবাদে নদীয়ায় আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি, মন্ত্রীবর্গ ও জ্যোতিষিগণ রাজা লক্ষ্মণসেনকে নদীয়া ত্যাগের পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি নদীয়া পরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ়তার পরিচয় দেন। অন্যদিকে বখতিয়ার নদীয়ার উদ্দেশ্যে এমনই দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে মাত্র ১৮ জন সৈনিক তাঁহার সঙ্গে ছিল এবং মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তাঁহাদেরকে অশ্ববিক্রেতা মনে করিয়া নদীয়াতে কাহারও মনে সংশয় সৃষ্টি হয় নাই। এই সুযোগে তিনি সরাসরি রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া নিজ ভাবমূর্তি উন্মোচন করেন এবং আকস্মিক আক্রমণে প্রাসাদরক্ষীদের পরাস্ত করেন। তখন রাজা লক্ষ্মণসেন মধ্যাহ্ন আহারে রত ছিলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি বিভ্রান্ত হইয়া রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া নগ্ন পায়ে (পূর্ব) বঙ্গ ও সমতটে পলায়ন করেন। অতঃপর মূল বাহিনী আসিয়া পড়িলে সমগ্র নদীয়া শহরটি বখতিয়ারের হস্তগত হয় এবং বখতিযার ক্রমাগত অভিযান চালাইয়া বাংলার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অংশ মুসলিম অধিকারে লইয়া আসেন।[৬৭]

মিনহাজ তাঁহার বিবরণে মুসলিম অভিযান আসন্ন বলিয়া বাংলাদেশে আতঙ্কভাব সৃষ্টির কথা এবং নদীয়াবাসীর পলায়নবাদী মনোভাব ও লক্ষ্মণসেনের দৃঢ়তার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ আসন্ন প্রতিরোধে রাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক গৃহীত কোনো ব্যবস্থার কথা বলেন নাই। ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অন্যদিকে মিনহাজ বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের পঞ্চাশ বৎসর পর এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাই ইহার নির্ভরযোগ্যতা লইয়াও ঐতিহাসিকেরা সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইসামীর 'ফুতুহ্-উস-সালাতীন'[৬৮] নামক গ্রন্থেও বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাই সাধারণভাবে মিনহাজের বিবরণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সম্ভবত লক্ষ্মণসেন বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে জীবনের শেষ পর্যায়ে রাজ্য শাসনের প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণেই হয়ত লক্ষ্মণসেন গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থস্থান নদীয়াতে বসবাস করিতেছিলেন।

মুসলমানদের বিহার জয়ের সংবাদে জনসাধারণের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এই আতঙ্কে দেশের (পশ্চিম বঙ্গ) লোক পূর্ববঙ্গ ও আসামে পলাইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে হযত নদীয়া জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই ধরনের ইঙ্গিত মিনহাজের বিবরণে ধরা পড়িয়াছে।[৬৯] সুতরাং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের কোনো বিশেষ ব্যবস্থাই যে গৃহীত হয় নাই ইহা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীবর্গ লক্ষ্মণসেনকে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই নদীয়া পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র কর্তৃক বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের কোনো পদক্ষেপ বিশেষ কার্যকর হয় নাই এবং ভাগ্য-নির্ভর পরাজয়ী মনোভাব রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করিয়াছিল।

অবশ্য যদি মনে করা হয়, লক্ষ্মণসেন বহিঃশত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না এবং ইতিপূর্বেই সেনাবাহিনী মনোবল ও প্রতিরোধশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কারণ বখতিয়ার নদীয়া

অভিযানে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন নাই। বখতিয়ার এই অভিযানে কোনো প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইলে এই ঘটনার নিশ্চয় উল্লেখ থাকিত। কারণ বখতিয়ারের তিব্বতাভিযানের ব্যর্থতার কথা মিনহাজ অসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে ইহাও হইতে পারে যে, জনসাধারণ, মন্ত্রী ও জ্যোতিষীদের পরাজয়ী মনোবৃত্তি সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, সেই কারণেই হয়তো কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থাই ফলবতী হয় নাই। এই কারণেই সম্ভবত মিনহাজের বিবরণীতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, বখতিয়ার অতি সহজেই বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন।[৭০]

সে যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেন যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। আসন্ন মুসলিম আক্রমণের ভয় এবং এই কারণে মানুষের আতঙ্ক ও পলায়নবাদী মনোভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। শত্রুর আক্রমণ অত্যাসন্ন অনুধাবন করিয়া এবং উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গের পরামর্শেও নদীয়া পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় কর্তব্যে তিনি অটল ছিলেন। সম্ভবত লক্ষ্মণসেন বখতিয়ারের আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থা চতুর অশ্ববিক্রেতার ছদ্মাবরণধারী বখতিয়ারের নিকট বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। তিনি অতি সহজেই রাজপ্রাসাদে গমন করিতে সক্ষম হন এবং রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ রক্ষীদের পরাস্ত করেন। এই আকস্মিক বিপজ্জনক অবস্থা দৃষ্টে রাজার আর কোনো উপায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। তখন তিনি পলায়নই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। উত্থান পতন ইতিহাসের চিরন্তন নিয়ম, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের শেষে ইহার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলীও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি বিপর্যয়ের দৃশ্যও অবলোকন করেন।[৭১]

সুতরাং লক্ষ্মণসেনের সময়েই সেন শাসনের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি ঘটিয়াছিল। রাজা লক্ষ্মণসেন জীবনের শেষ মুহূর্তে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেন। কারণ পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার রাজ্য দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে তিনি এককভাবে প্রশংসার দাবিদার। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের পদচারণায় তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া নিজের উদার মানসিকতারই পরিচয় দিয়াছেন এবং দানশীলতায় কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হইয়াছিলেন। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে তাঁহার কৃতিত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

লক্ষ্মণসেনের পর বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন নামে তাঁহার দুই পুত্র পূর্ববাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্ভবত বিশ্বরূপসেনই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে দক্ষিণ ও পূর্ববাংলা যে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের রাজত্বকালের তিনটি তাম্রশাসন যথা, ১. বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষদ লিপি, ২. বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপি, ও ৩. কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনগুলিতে বিশ্বরূপসেন 'অরিরাজ বৃষভাশঙ্কর গৌড়েশ্বর'[৭২] ও কেশবসেন 'অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর'[৭৩] উপাধিতে ভূষিত

হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই সূর্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনে উভয়েই 'যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র'[৭৪] বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইহা হইতে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, তাঁহারা উভয়েই পশ্চিম, পশ্চিম-উত্তর বাংলার মুসলিম রাজ্যের আক্রমণ প্রতিরোধে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।[৭৫] কারণ বাংলার পশ্চিম, পশ্চিম-উত্তরাংশ দখল করিবার পর দক্ষিণ-পূব বাংলায় মুসলিম আগ্রাসন স্বাভাবিক ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনায় ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[৭৬] সুতরাং বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন অন্তত ২৫ বৎসর (১২০৫-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে সম্ভবত তাঁহার দুই পুত্র কুমার সূর্যসেন ও কুমার পুরুষোত্তম সেনের নামের উল্লেখ আছে।[৭৭] কিন্তু তাঁহাদের কেহ রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অথচ ঐতিহাসিক মিনহাজ যে সময় লক্ষ্মণাবতীতে আসেন (১২৪৪-৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ পূর্ববাংলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং মনে হয় কেশবসেনের পরেও একাধিক সেনরাজা পূর্ববাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা দশরথদেবের আদাবাড়ি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেন শাসনের পতন ঘটিয়াছিল এবং সেন শাসনের কেন্দ্রস্থল বিক্রমপুর দেববংশের হস্তগত হয়। বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত এই তাম্রশাসনে রাজা দশরথদেবের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ দনুজ মাধব উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৭৮] ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারাণীর বিবরণে উল্লেখিত সোনারগাঁয়ের দনুজরায় ছিলেন সম্ভবত এই দশরথদেব। দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তুগরিল খানের বিরুদ্ধে বাংলা অভিযানকালে এই দনুজরায়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে বাংলায় সেনবংশীয় রাজাদের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।[৭৯]

সুতরাং সেনবংশ প্রায় দেড়শত বৎসর বাংলাদেশ শাসন করিয়াছিল। তাঁহাদের এই শাসনকাল বিভিন্ন দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বংশের তিনজন সুযোগ্য শাসক যথাক্রমে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন বাংলায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময় বাংলায় হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের পূর্বসূরি পালরাজবংশের উদার মানসিকতা তাঁহাদের ছিল না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁহারা অনুদার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব আধিপত্য ও গৌরব বিলুপ্তমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুত এই বহিরাগত সেনরাজাগণ বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিতে মনে হয় ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ফলে বাঙালির জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বাংলায় মুসলিম আধিপত্য ছিল ইহারই ফলশ্রুতি। এইজন্য সাধারণ মানুষও অনেকাংশে দায়ী ছিলেন।

বিশেষত তখন সমাজ ছিল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একস্তরের সহিত অন্যস্তরের মেলামেশা ছিল নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা সমাজের শাসক ও শোষক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ ছিল অবহেলিত। এই ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ফল হইয়াছিল মারাত্মক। এই বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদ ক্রমশ সেনরাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। সম্ভবত এই কারণেই লক্ষ্মণসেন বা তাঁহার পুত্রদের ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য বা সৈন্যদলের প্রতিরোধশক্তি কার্যকরী হয় নাই। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য। নীহাররঞ্জনের ভাষায় :

> একদিকে উত্তরভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর গাঙ্গেয় ভারতে, অর্থাৎ বর্তমান যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) ও বিহারে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাঙলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত, রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন ; ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত ; শিল্প ও সাহিত্য বস্তু–সম্বন্ধ-বিচ্যুত ভাব-কল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলংকারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলা বিলাসে ভারগ্রস্থ ও মাদির, জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচায–ডাকিনী–যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুকতাকে পঙ্গু, উচ্চস্তর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট! রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ ; উভয় চরিত্রে ও আত্মশক্তিতে দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত। এই দুবল ও দৈন্যপীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙিয়া পড়িবে, এবং সমাজ–প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া দেশ তাহার মূল্য দিয়া যাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়---রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম![৮০]

সেনরাজবংশ প্রায় দেড়শত বৎসর বাংলায় শাসনরূপে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রক্ষণশীল সেন নৃপতিগণ উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে বাংলাব ধম, সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে নূতন উপাদান, আচার ও প্রথার প্রবর্তন করেন এবং বাংলার সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাই সেনরাজবংশের শাসনকাল বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

গ. সেনযুগে বাংলার সমাজজীবন সম্পর্কিত উৎসসমূহ

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'সেনযুগ' একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময় সমগ্র বাংলাদেশ প্রায় দেড়শত বৎসর একই রাজবংশের অধীনে শাসিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পালবংশের পতনের পর বহিরাগত সেনরাজারা ক্ষমতা দখল

করিয়াছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন যথাক্রমে বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন। ইহাদের শাসনকাল দ্বাদশ শতকের প্রথম হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই দেড়শত বৎসরের রাজত্বকালে শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলার সামাজিক জীবনকে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। এই সময়ে সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য লাভ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হইয়াছিল। এমন কি সমাজের কোন কোন দিকে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী উত্তব ভারতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপরিপোষক সেন রাজবংশের শাসনকালের প্রভাব নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হয়।

সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবনেব বিভিন্ন দিক চারিটি প্রধান উৎসের মাধ্যমে আলোচনা করা যাইতে পারে। যথা :

১. সাহিত্যকর্ম।

২. লিপি।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

৪ চিত্রিত পাণ্ডুলিপি।

১. সাহিত্যকর্ম : সেনযুগ সংস্কৃত সাহিত্যেব স্বর্ণযুগ। কর্ণাট হইতে আগত সেনরাজারা সংস্কৃত সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহাব ফলে অগণিত সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে তৎকালীন সমাজজীবনের অনেক বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুটিযা উঠিয়াছিল। এই সময় সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ও রূপান্তর এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধিবিধান সংকলিত হয়। সর্বোপরি সমাজে বৃহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, যাহা সেনযুগে রচিত গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে। এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যেমন :

ক. সংস্কৃত কাব্য : ধোয়ীর পবনদূত ; গোবর্ধনাচার্যের আর্যাসপ্তশতী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইত্যাদি।

খ. প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক সংকলন গ্রন্থ : বিদ্যাকরের সুভাষিত রত্নকোষ, শ্রীধরদাসের সদ্যুক্তিকর্ণামৃত।

গ. স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থ : ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্যপ্রকারণম ; জীমূতবাহনের কালবিবেক, ব্যবহারমার্তৃকা ও দায়ভাগ, অনিরুদ্ধভট্টের হারলতা ও পিতৃদয়িতা ; রাজা বল্লালসেনেব দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর ; হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম প্রভৃতি।

ঘ. ধর্মীয় গ্রন্থ : বৃহদধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ঙ. পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থাবলী।

পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। পবনদূতে গৌড়েন্দ্র তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কবি জয়দেবের মতানুসারে এই গৌড়েন্দ্র ছিলেন

রাজা লক্ষ্মণসেন। সুতরাং কবি ধোয়ী তাঁহার সভাকবি ছিলেন। কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে ধোয়ী পবনদূত কাব্যখানি রচনা করেন। অবশ্য মেঘদূত কাব্যের ন্যায় ইহাতে পূর্ব ও উত্তরভাগ নাই। বর্ণনা, ভাষা ও ভাবের ঐতিহ্যে কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। দক্ষিণদেশের গন্ধর্ব রমণী কুবলয়বতী, মলয়বায়ুকে দূত করিয়া লক্ষ্মণসেনের নিকট প্রেরণ করিতেছেন—এই বিষয়বস্তু সম্বলিত ১০৪টি মন্দাক্রান্তা ছন্দের শ্লোকে কাব্যটি রচিত।[১] ইহা একটি যৌন আবেদনধর্মী রচনা। অবশ্য গুণাগুণের দিক হইতে ইহার মূল্য রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেন কর্তৃক দাক্ষিণাত্য অভিযান ও রাজধানী বিজয়পুরের সুন্দর বর্ণনা ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক তথ্যও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাছাড়া ইহাতে সমাজজীবনের অনেক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য।

গোবর্ধনাচার্য রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার একজন সভাকবি ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র রচয়িতা নীলাম্বর ছিলেন তাঁহার পিতা। গোবর্ধনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আর্যাসপ্তশতী' এবং ইহাতে সাতশতের অধিক শৃঙ্গার রসাত্মক শ্লোক রহিয়াছে। ইহার শ্লোকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ, বর্ণনানুসারে লিখিত এবং বর্ণানুক্রমে গ্রথিত হইয়াছে।[২] হালের 'গাথাসপ্তশতী' এর অনুকরণে গোবর্ধনের এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দে জয়দেব তাঁহাকে শৃঙ্গার রসাত্মক কবিতা রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন।[৩] যাহাই হউক, গোবর্ধনাচার্যের আর্যাসপ্তশতীর বিভিন্ন শ্লোকে তৎকালীন সমাজবদ্ধ মানুষের পোশাক, পরিচ্ছদ, অলংকার, প্রসাধন, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের বহু চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

কবি জয়দেবও রাজা লক্ষ্মণসেনের একজন সভাকবি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতা ছিলেন বামাদেবী অথবা রামাদেবী।[৪] জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বসন্তলীলাই ইহার উপজীব্য বিষয়। মূলত কৃষ্ণ রাধাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য গোপীর সহিত মিলিত হইয়াছে ইহা শ্রবণে রাধার বিরহ এবং সখীর মধ্যস্থতায় রাধাকৃষ্ণের মিলন—এই কাব্যকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র কাব্যটি দ্বাদশ সর্গে রচিত হইয়াছে। ইহার বর্ণনাভঙ্গি, বাক্যবিন্যাস, রূপকল্পনা কবি জয়দেবকে একজন অসাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছে এবং তাঁহার খ্যাতি সমগ্র ভারতে সুবিস্তৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গীতগোবিন্দের অপূর্ব ধ্বনিঝংকার ও ছন্দোলালিত্যের মধ্য দিয়া তৎকালীন সমাজের বহু লোকায়ত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধোয়ী, গোবর্ধন ও জয়দেব ব্যতীত শরণ ও উমাপতিধর সেনরাজসভার বিশেষত রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। কবি শরণ দুরূহ ও দ্রুত শ্লোক বন্ধনে অত্যন্ত পারদর্শী বলিয়া কবি জয়দেব তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন।[৫] কিন্তু তাঁহার রচিত কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলন গ্রন্থে তাঁহার ২০টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অপরদিকে কবি উমাপতিধরেরও কোনো গ্রন্থ নাই। কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে তাঁহার ৯১টি শ্লোক আছে। তিনি মূলত প্রশস্তি রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত। উমাপতিধর ছিলেন একজন করণ কায়স্থ। তিনি রাজা বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি রচনা

করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৬] তাঁহার সম্পর্কে কবি জয়দেব বলিয়াছেন, উমাপতিধরের লেখনিতে বাক্য যেন পল্লবিত হইত।[৭]

দুইখানি প্রকীর্ণ শ্লোক সংকলন গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থ দুইটি যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমখানি বিদ্যাকর সংকলিত 'সুভাষিতরত্নকোষ'। পণ্ডিতগণ বরেন্দ্রের অন্তর্গত জগদ্দল বিহারে ইহা সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বৌদ্ধ আচার্য বিদ্যাকর বুদ্ধের বন্দনা করিয়া এই গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন এবং সমগ্র গ্রন্থটি ৫০টি পর্বে বিভক্ত হইয়াছে।[৮] পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত তালপাতার পুথি অবলম্বনে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে এফ. ডবলু. টমাস সম্পাদিত ও প্রকাশিত বিবলোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজে এফ. ডবলু, টমাস রচনাতে কবিন্দ্রবচনসমুচ্চয় নামটি পাইয়াছেন। পরবর্তীতে গ্রন্থাভ্যন্তরে 'সুভাষিতরত্নকোষ' কথাটি পাওয়া গিয়াছে এবং হার্ভাড ওরিয়েন্টাল সিরিজের সংস্করণে এই নামে অভিহিত হইয়াছে।[৯] এই গ্রন্থে অনেক বাঙ্গালী কবির কবিতা স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বলন, যোগেশ্বর, বসুকল্প, মনোবিনোদ, অভিন্দ, বীর্যমিত্র, লক্ষ্মীধব, বিজয়দেব, ভ্রমরদেব, শ্রীহর্ষদেব,ধরণীধর, শ্রীরাজ্যপাল, সুবর্ণরেখা, জয়ীক, বিন্তোক, সিদ্ধোক, সোঙ্কোক, হিঙ্গোল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিষয় ছাড়াও ঋতুবৈচিত্র, মানবজীবন, প্রেম-ভালবাসা, সৎবাক্তি, দারিদ্রতা এবং রাজস্তুতি প্রভৃতি সম্পর্কে বহু শ্লোক পাওয়া যায়। তাই সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসাবে ইহার গুরুত্ব অপারিসীম।

দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীধরদাস কর্তৃক এই গ্রন্থ সংকলিত হয়। তাঁহার পিতা বটুদাস রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও মহাসামন্ত ছিলেন।[১০] শ্রীধরদাসও লক্ষ্মণসেনের মহামাণ্ডলিক ছিলেন। তাঁহার সংকলিত গ্রন্থটি ৫০টি প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতিটি প্রবাহ আবার একাধিক বীচি এবং প্রতিটি বীচিতে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা (শ্লোক) রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, যুবরাজ দিবাকর, উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, আচার্য গোবর্ধন এবং কবিরাজ ধোয়ী ছাড়াও বহু বাঙ্গালী কবির কবিতা এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল রচনায় দেবতাদের বিচিত্র লীলা, প্রেম-অনুরাগ, ঋতুবৈশিষ্ট্য, রাজার যশোগান, দেশ, কাল প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।[১১] এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত এবং বিদ্যাকরের সুভাষিতরত্নকোষ গ্রন্থে উদ্ধৃত সাধারণ শ্লোক সংখ্যা ৬২৩টি । ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, পরবর্তীকালে শ্রীধরদাস তাঁহার সংকলন কার্যে পূর্বসূরি বিদ্যাকরের কোষকাব্য হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১২] যাহাই হউক এই সংকলিত গ্রন্থে তৎকালীন সমাজ- জীবনের সুন্দর সুন্দর বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থরচয়িতাদের মধ্যে ভট্টভবদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ভট্টভবদেব পূর্ববাংলার রাজা

হরিবর্মণের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, গ্রন্থ প্রণেতা ও জনহিতকর কার্যের পৃষ্ঠপোষক। সেই যুগের একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিজেকে 'বালবলভীভুজঙ্গ'[১৩] বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে গৌরববোধ করিতেন। সম্ভবত তাঁহার সময়কাল ছিল একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে "প্রায়শ্চিত্য প্রকবণম" গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহাতে বিভিন্ন অপরাধ ও তাহাব প্রায়শ্চিত্যের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাছাড়া তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, সম্বন্ধবিবেক, শবসুতাকাশৌচ প্রকরণম ও ব্যবহার তিলক উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহার তিলক গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। রঘুনন্দন এই গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করিযাছেন। ভট্টভবদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাহার গ্রন্থসমূহে ইহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তাই স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ভট্টভবদেবের গ্রন্থসমূহকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে এই ভবদেব এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁহাব প্রভাব সমাজজীবনে সবিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং সেই প্রভাব বর্তমানেও অক্ষুণ্ণ আছে।[১৪]

স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে ভট্টভবদেবের পরই জীমূতবাহনের স্থান। জীমূতবাহন রাঢ়ের পারিভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] সম্ভবত তিনি একাদশ দ্বাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁহাব রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে দায়ভাগ সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহাতে হিন্দুধর্মের উত্তরাধিকার আইন এবং স্ত্রীধন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহাকে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু আইনের আকর গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। এই গ্রন্থ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথাই প্রমাণ করে। তাঁহার অপর গ্রন্থ ব্যবহার মাতৃকায় বিচার বিষয়ক রীতিনীতির বিস্তৃত আলোকপাত করা হইয়াছে। ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়পাদ—এই চারিটি অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থটি জীমূতবাহনের গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় বহন করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কালবিবেক গ্রন্থটিও অদ্যাবধি সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের কাল নিরূপণের বিষয় ইহাতে উল্লেখিত হইয়াছে।[১৬]

বাংলার স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মধ্যে ধর্মাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধভট্ট উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের। বরেন্দ্রান্তর্গত ব্রাহ্মণ অনিরুদ্ধ সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের গুরু ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি একজন সজ্জন ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত হারলতা ও পিতৃদায়িতা গ্রন্থ দুইটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। তাঁহার হারলতা গ্রন্থে অশৌচ বিষয়ক নিবন্ধ বিশেষত জন্ম-মৃত্যুর জন্য অশৌচ, আবার অশৌচ কালে বিধিনিষেধ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অপরদিকে বিভিন্ন প্রকার আচার, রীতিনীতি, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান প্রভৃতি পিতৃদয়িতা গ্রন্থের বিষয়বস্তু। অদ্যাবধি শ্রাদ্ধ বিষয়ে বাংলাদেশে অনিরুদ্ধের নির্দেশই প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থ

তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর। সমাজসংস্কারক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহারই আদর্শে ও শিক্ষায় বল্লালসেন একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারকের মর্যাদা পাইয়াছেন।[১৭]

গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের শিষ্য রাজা লক্ষ্মণসেনও শাস্ত্রচর্চা ও সমাজসংস্কারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা : দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর। দানসাগব বিভিন্ন প্রকার দান বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ তিনি জগতেব পাপ মোচনের উদ্দেশ্যেই রচনা করিয়াছিলেন। স্বীয় রাজত্বকালের বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই তাঁহাব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষত ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই দানসাগর প্রণীত হয়। ইহার বিষয়বস্তুতে সমাজসংস্কারের ক্ষীণ আভাসও রহিয়াছে। সুতরাং তিনি শুধু রাজ্যশাসনই করেন নাই, সমাজসংস্কারেও তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। তাহাছাড়া বল্লালসেন শুভাশুভ লক্ষণ সম্পর্কিত অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ রচনা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন ইহাব রচনা সমাপ্ত করেন।[১৮] সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত বই দুইখানির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

স্মৃতিশাস্ত্রকার হিসাবে সর্বশাস্ত্রবিশারদ হলায়ুধের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন সম্ভবত দ্বাদশ--ত্রয়োদশ শতাব্দীর। বাৎস্যগোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণসবস্বম গ্রন্থ বচনা করেন। ইহাতে দৈনন্দিন রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিলে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থ তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করিতেছে। তাহাছাড়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান যথাক্রমে শ্রাদ্ধ পদ্ধতি ও আহ্নিকতত্ত্ব বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৯]

ধর্মীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃহদধর্ম্মপুরাণ সর্বপ্রথম উল্লেখ করিবার মতো গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল লইয়া মনীষীগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রকার যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে ইহাকে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে রচিত বলিয়া দাবি করিয়াছেন।[২০] দ্বাদশ শতকের পরে এই গ্রন্থখানি রচিত ধরিয়া লইলেই ইহাতে সেনযুগের সমাজবিন্যাস, ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামো চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে তৎকালীন বাংলাদেশের বহু সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। পূর্ব, মধ্য ও উত্তর খণ্ডে বিভক্ত এই বৃহদধর্ম্মপুরাণে পিতৃ-মাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণাদিধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পূজাব্রত, জাতিনিরূপণ, শঙ্করজাতি, দানধর্ম, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা, কালধর্ম প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাই সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ইহার ব্যবহার অপরিহার্য।

অপর একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হইল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসাবেও ইহার গুরুত্ব কম নয়। ইহার রচনাকাল লইয়াও মতভেদ আছে। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে ইহা রচিত হইয়াছিল।[২১] চারিটি খণ্ডে বিভক্ত (ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশ খণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড) এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মূল আলোচ্য বিষয় হইল কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণলীলা। অবশ্য নানা কাহিনীর সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির বহু বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বিবৃত বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীদের কর্তব্য, দান, পূজা, ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্তন, ব্রতসমূহের বর্ণনা প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতে সেনযুগের সমাজজীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসাবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

পরবর্তীকালে রচিত কয়েকখানি গ্রন্থেও সেনযুগীয় সমাজজীবনের অনেক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থটি খুবই উল্লেখযোগ্য। সুকুমার সেনের মতে বারানসী অঞ্চলে এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল।[২২] অনেক বাঙ্গালী কবির রচনাও যে ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহা ইহার বিষয় ও ভাষা হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব। এই গ্রন্থটি সেনযুগের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যসমূহ যেমন মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল গ্রন্থও সেনযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনার উৎস হিসাবে ঐতিহাসিকগণ ব্যবহার করিতে পারেন।

সেনযুগীয় সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে চর্যাগীতির উল্লেখ আবশ্যক। ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবার হইতে গ্রন্থটি উদ্ধার করেন। ইহাতে ৫০টি গীত রহিয়াছে। ইহার রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী ইহাকে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[২৩] যাহাই হউক, সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনে গীতিকারগণ এই গীতগুলি রচনা করিলেও তৎকালীন দেশ ও সমাজজীবনের বহু তথ্যই এই চর্যাগীতগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সেনযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনায় ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. লিপি : সেন আমলের লিপিমালা সেই যুগের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। সৌভাগ্যের বিষয়, সেনযুগেব বহু লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজকীয় ও ব্যক্তিগতভাবে উৎকীর্ণ এই সকল লিপি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। রাজকীয় লিপিতে সাধারণত রাজার স্তুতিবাচক প্রশস্তি এবং ভূমিদান সম্পর্কিত বিষয় উৎকীর্ণ হইত। রাজকবিরাই এই রাজপ্রশস্তিসমূহ রচনা করিতেন এবং ইহাতে রাজার বংশতালিকা, সামরিক অভিযান ও তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী বর্ণিত হইত। ইহাদের মধ্যে বিজয়সেনের সভাকবি উমাপতিধর বিরচিত দেওপাড়া প্রশস্তির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে রাজকীয় ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিসমূহে মন্দির ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনুদান, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ থাকিত। ইহাদের অধিকাংশই তাম্রশাসন এবং

খুব কমই শিলালিপি ছিল। তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা, সমাজের গড়ন, জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে এই লিপিমালা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করিতেছে।

অপরদিকে ব্যক্তিগতভাবে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অথবা পরিবারের প্রশস্তির জন্য রচিত হইত। এই ক্ষেত্রে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার বর্মণ রাজা হরিবর্মণের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের ভূবনেশ্বর লিপির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। খুব সম্ভবত এই লিপি একাদশ শতকের শেষার্ধে অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল।[২৪] এই সমস্ত লিপি তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোকপাত করিয়া থাকে।

এই সকল লিপির কল্পনার বৈচিত্র্য, বর্ণনার অলঙ্কার ও ভাষার লালিত্য ইহাদের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এইগুলি শার্দুল বিক্রীড়িত, বসন্ত তিলক, উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, স্রগধরা, মালিনী, বংশবিবরণ, শিখরিণী, মান্দাক্রান্তা, প্রহর্ষিণী প্রভৃতি সুললিত ছন্দে রচিত হইয়াছে। অবশ্য সমকালীন ঘটনাবলী ও উদ্দিষ্ট নৃপতির স্তুতিই ইহাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। তবুও এইসব লিপিমালায় সমাজের বহু চিত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহাদের মূল্য অপরিসীম।

৩. **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান :** সেনযুগের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান একটি বিরাট উৎস হিসাবে কাজ করিতেছে। এই সমস্ত উপাদান সমকালীন জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয় সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ইহার মাধ্যমে তৎকালীন মানুষের পোশাক–পরিচ্ছদ, কেশবিন্যাস, অলংকার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সেনযুগের গঙ্গা, বিষ্ণু, বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ), গরুড় বাহন বিষ্ণু, লক্ষ্মী, চণ্ডি (পার্বতী), সূর্য, অর্ধনারীশ্বর, শিব, মনসা প্রভৃতি সেন যুগের বহু ভাস্কর্য মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেন আমলের শহরগুলির মধ্যে বিক্রমপুর, দেওপাড়া–বিজয়নগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিক্রমপুর : মুন্সিগঞ্জ জেলার ধলেশ্বরী নদীর তীরে প্রাচীনতম বিক্রমপুর নগরীর অবস্থান। এখানে চন্দ্র ও সেনবংশীয় রাজাদের রাজধানী বংশানুক্রমিকভাবে বহুকাল চলিয়াছিল। বর্তমানে বিক্রমপুরে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অসংখ্য প্রাচীন ইট ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং অসংখ্য মূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং সমগ্র বিক্রমপুরে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় ছড়াইয়া আছে। ডক্টর ভট্টশালীর মতে সেকালে এই নগরীর আয়তন ১৫ বর্গমাইল ছিল এবং ইহার উত্তর পার্শ্ব দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত হইত। বর্তমানে ইছামতী ধলেশ্বরীর সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।[২৫]

দেওপাড়া বিজয়নগর : রাজশাহী শহরের নিকটবর্তী শীতলাই রেল স্টেশনের সন্নিকটে প্রাচীন দেওপাড়ার অবস্থান। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওপাড়া শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ১৯১০ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে এখানে অসংখ্য জলাশয়, শিলাখণ্ড ও প্রাচীন ইমারতাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শিলালিপিতে উল্লেখিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের স্থান সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে সেই যুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে দেওপাড়া নিজের

স্থান করিয়া লইয়াছিল—ইহা বলা যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা দেওপাড়ার নিকটবর্তী কোনো স্থানে বিজয়নগর শহরের অবস্থান বলিয়া মনে করেন।[২৬] এইগুলি তৎকালীন মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাহাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য প্রদান করিয়া থাকে।

৪. **চিত্রিত পাণ্ডুলিপি :** সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসাবে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলি স্বল্পায়তন বিশিষ্ট। অবশ্য আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও এই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির ভাবকল্পনার বিস্তৃতি ও গভীরতা ছিল অপূর্ব। এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি প্রায় বিশখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি কাগজে এবং অন্যগুলি তালপাতায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলি মূলত ১০০০ হইতে ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের বলিয়া ধারণা করা হয়। আবার ইহাদের অধিকাংশই বাংলার বাহিরে বিশেষত নেপালে পাওয়া গিয়াছে।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় স্বীয় গ্রন্থে এই পাণ্ডুলিপির একটি সুন্দর তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

"১-২. পালরাজ মহীপালদেবের রাজত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার দুইটি পাণ্ডুলিপি (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ১৪৬৪ নং এবং কলিকাতা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ৪৭১৩ নং পাণ্ডুলিপি)।

৩. পালরাজ রামপালের শাসনকালের ৩৯তম বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (এক সময়ে এই পুঁথিটি ব্রেন্ডেনবুর্গ সাহেবের সংগ্রহে ছিল)।

৪-৫. দুইটি অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (রাজশাহী- বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ) ; ইহার একটি পাণ্ডুলিপি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল বর্মণরাজ হরিবর্মার রাজত্বের ১৯তম বৎসরে। অন্যটিতে কোনও তারিখ নাই, তবে চিত্রশৈলী সাক্ষ্যে মনে হয় দ্বাদশ শতকের কোনও সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল।

৬. কলিকাতা (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (এ-১৫ নং) ; খ্রিষ্টোত্তর ১০৭১ অব্দে লিখিত ও চিত্রিত।

৭-৮. রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কারণ্ডব্যূহ এবং বোধিচর্যাবতারের দুইটি পাণ্ডুলিপি। একটিতেও তারিখ নাই, তবে শৈলী সাক্ষ্যে মনে হয় দ্বাদশ শতক।

৯. বোস্টন চিত্রশালার ২০৫৮৯ নং পাণ্ডুলিপি ; পালরাজ (তৃতীয় ?) গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১০. জাপানের সোয়ামুরা পাণ্ডুলিপি। তারিখ নাই, তবে পালশিল্পের এবং সমসাময়িক নাগরী অক্ষরের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১১. লণ্ডন-ব্রিটিশ-ম্যুজিয়মের একটি অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি পালরাজ (তৃতীয় ?) গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত (OR 6902)।

১২-১৩. কেমব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপি ; এই পাণ্ডুলিপিটি পালরাজ নরপালের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত। আরও একটি অজ্ঞাতনামা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (Add No. 1643) ; লিখন ও চিত্রণের তারিখ ১০১৫।

১৪. কলিকাতা (রয়্যাল)-এশিয়াটিক-সোসাইটি গ্রন্থাগারে রক্ষিত ও অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি একটি (৪২০৩ নং) ; লিখন ও চিত্রণের তারিখ নেপালি সম্বৎ ২৬৮=১১৪৮।

১৫. কলিকাতা (রয়্যাল)-এশিয়াটিক-সোসাইটি গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৯৭৮৯ নং পাণ্ডুলিপি ; পালরাজ গোবিন্দপালের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১৬. কলিকাতা অজিত ঘোষ সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি ; নাম ও তারিখ অজ্ঞাত ; চিত্রশৈলীতে পাল আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৭. কুলু-উপত্যকা-প্রবাসী স্বেতোস্লাভ রোয়েরিক মহাশয়ের সংগ্রহে একশত ছাব্বিশটি চিত্রসহ গণ্ডব্যূহের একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডুলিপি। তারিখ অজ্ঞাত ; কিন্তু চিত্রশৈলীতে পাল আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৮. কলিকাতা (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিবপূজা ও শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় একাধিক শৈবগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ; এই পাণ্ডুলিপির কাঠের পাটার ভিতরের দিকে আঁকা দশ-বারোটি ছবি। তারিখ অজ্ঞাত, তবে শৈলীসাক্ষ্যে পাল পর্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৯. অক্সফোর্ড বড্‌লেয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপিগুলি ছাড়া আরও দুই-চারিখানা চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ইতস্তত জ্ঞাত থাকা বিচিত্র নয়। তাহা ছাড়া, মাঝে মাঝে নূতন নূতন চিত্রিত পাণ্ডুলিপির খবরও পাওয়া যায়।"[২৭]

তারিখ সম্বলিত এই পাণ্ডুলিপিগুলি একটি ছাঁড়া অন্য সব বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছে। এইগুলি বৌদ্ধধর্মের মহাযান-বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দেবদেবীর প্রতিকৃতিতে পরিপূর্ণ। অপর একটি চিত্র শৈবধর্ম সম্পর্কিত এবং ইহার চিত্রটিতে লিঙ্গ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি রহিয়াছে। এই সকল দেবদেবীর প্রতিকৃতি হইতে আমরা তৎকালীন ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দেবদেবীর কথা জানিতে পারি। বৌদ্ধধর্মের দেবদেবী লোকনাথ, তারা, মহাকাল, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি প্রভৃতির চিত্রই প্রধানত এইসব পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই অঙ্কিত চিত্রাবলী তৎকালীন মানুষের অভিরুচি, মন-মানসিকতা, শিল্পের প্রতি তাহাদের অনুরাগ প্রভৃতিও প্রকাশ করিতেছে। তাহাছাড়া দৈনন্দিন পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ও মহিলাদের কেশবিন্যাস প্রভৃতি সামাজিক নানাদিকের পরিচয় এইসব চিত্র বহন করিতেছে। তাই সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহাদের গুরুত্ব কম নয়।

সেনযুগে রচিত কোনো ইতিহাস গ্রন্থ না থাকিবার ফলে আমাদেরকে সেই যুগের সাহিত্য, লিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য এই সমস্ত উৎস হইতে তৎকালীন সমাজজীবনের বহু বিষয় আজ আমরা জানিতে

পারি। তাই সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহাদের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এই সমস্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্য অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিতভাবে ও অলঙ্করণের উপমা ছলে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা প্রকৃত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই এই সকল উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঐতিহাসিককে গ্রহণ করিয়া তৎকালীন সমাজজীবন অঙ্কনের প্রয়াস করিতে হইবে।

তথ্যনির্দেশ

ক. বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

১. আর. সি. মজুমদার (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, (ঢাকা: ইউনিভারসিটি অফ ঢাকা, ১৯৪৩), পৃ. ১ ; এস. হোসেন, এভরি ডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৮), পৃ. ১।

২ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ২–৩।

৩. এইচ. ব্লকম্যান, কনট্রিবিউশনস টু দি জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৬৮), পৃ. ৩ ; ই. লেটব্রিজ, অ্যান্ড ইজি ইন্ট্রডাকশন টু দি হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অফ বেঙ্গল (কলিকাতা : থ্যাকার স্পিংক অ্যান্ড কোং ১৮৭৫), পৃ. ১৩।

৪. আর. সি. মজুমদার (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২১৬–২১৭।

৫ মিনহাজ–ই–সিরাজ, তবকাত–ই–নাসিরী, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পাদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৪–২৬।

৬. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৫।

৭. "শামস–সিরাজ–আফিফ, তারিখ–ই–ফিরোজশাহী", ইলিয়ট অ্যান্ড ডওসন (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড–৩, (এলাহাবাদ : কিতাব মহল), পৃ. ২৯৬।

৮. এ. এইচ. দানী, "শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ শাহ–ই–বাঙ্গাল" স্যার যদুনাথ সরকার কমেমোরেশন ভল্যুমস,.(পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, ১৯৫৮), পৃ. ৫৬।

৯. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, "বঙ্গ কোন দেশ", মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬৮।

১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, সপ্তম সংস্করণ, (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮১), পৃ. ৮–৯।

১১. এন. জি. মজুমদার, ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৯), পৃ. ১০৭, ১৩৮, ১৪১।

১২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), (কলিকাতা : লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮২), পৃ. ৩৯।

১৩. আবুল ফজল, আইন–ই–আকবরী, খণ্ড–২, সি. এইচ. এস. জেরেট (অনূদিত), তৃতীয় সংস্করণ, (নিউ দিল্লী : ওরিয়েন্ট বুকস্ রিপ্রিন্ট করপোরেশন, ১৯৭৮), পৃ. ১৩২।

১৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২।

১৫. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪।

১৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ১০৮।

১৭. অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২), পৃ. ৫।

১৮. সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব" 'ইতিহাস', কলিকাতা, নবম সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ. ১৭–২০।

১৯. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭।

২০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৭২।

২১. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২।

২২. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭।

২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬।

২৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৭৫।

২৫. আর মুখার্জী অ্যান্ড এস. কে. মাইতি, করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭), শ্লোক নং ৪, মাধাইনগর তাম্রলিপি, পৃ. ২৮৩।

২৬ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৭৪–৭৭।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৮. কে. বাগচী, দি গেঞ্জেস ডেল্টা, (কলিকাতা : ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৪৪), পৃ. ১৮–৩৫।

২৯ এ. ভট্টাচারিয়া, হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড আরলি মিডিএভল্ বেঙ্গল, (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭), পৃ. ১৬–১৭।

৩০. বিপ্রদাস, মনসাবিজয়, এস. সেন (সম্পাদিত), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৫৩), পৃ. ১৪২।

৩১. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯।

৩২. আবুল ফজল, আকবরনামা, খণ্ড–৩, এইচ ব্যাভারিজ (অনূদিত), ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান রিপ্রিন্ট, (দিল্লী : রেয়ার বুকস, ১৯৭৩), পৃ. ১৫৩।

৩৩. কৃত্তিবাসী রামায়ণ ; দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ১১২।

৩৪. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯।

৩৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫।

৩৬. নীলরতন সেন (সম্পাদিত), চর্যাগীতিকোষ, (কলিকাতা : দীপালী সেন, ১৩৮৪), গীত নং ৪৯, পৃ. ১৫১।

৩৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫।

৩৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৮৩।

৩৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ ৪।

৪০. আর. সি. মজুমদার, "ফিজিকাল ফিচারস অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মিডিএভল্ বেঙ্গল", ডি. আর. ভাণ্ডারকর ভল্যুম, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৩৫১।

৪১. কে. বাগচী, দি গেঞ্জেস ডেল্টা, পৃ. ৫২–৫৪।

৪২. এ. এইচ. দানী, "সিলেট কপার প্লেট ইন্সক্রিপশন অফ শ্রীচন্দ্র" ফিফথ্ রিজিওনাল এয়ার ; পেপার রেড ইন দি এশিয়ান আর্কিয়লজি কনফারেন্স, দিল্লী, ১৯৬১, শ্লোক নং ১৩, পৃ. ৬।

৪৩. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ৫।

৪৪. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২।

৪৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৮৮।

৪৬ এ ভট্টাচারিয়া, হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড আরলি মিডিএভল্ বেঙ্গল, পৃ. ৩৪–৩৫।

৪৭. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩।

৪৮ শচীন্দ্রলাল ঘোষ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, (দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৬), পৃ. ৮–৯।

৪৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬।

৫০ আর. সি. মজুমদার, "ফিজিক্যাল ফিচারস অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মিডিএভল্ বেঙ্গল", প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩।

৫১. পি. সি. সেন (সম্পাদিত), করতোয়া মাহাত্ম্য, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, মনোগ্রাফস নং ২, রাজশাহী, ১৯২৯।

৫২ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৭, (লন্ডন : ট্রুবনার, ১৮৭৬), পৃ. ১৬৫।

৫৩ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ৬।

৫৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বাঙালীর ইতিহাস, (সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব'), ২য় সংস্করণ, (কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃ. ২৪।

৫৫ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, (কলিকাতা : স্বারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৬), পৃ. ১–৪।

৫৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ৪।

৫৭. আর মুখার্জী অ্যান্ড এস কে মাইতি, করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশনস বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশান অফ বেঙ্গল, পৃ ৩৯–৪০।

৫৮ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–১৫, পৃ. ১১৩।

৫৯ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২০।

৬০ আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৫।

৬১. পি. সি. সেন (সম্পাদিত), করতোয়া মাহাত্ম্য, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, মনোগ্রাফস নং–২, রাজশাহী, ১৯২৯।

৬২ টি ওয়াটারস, অন যুয়ান–চুয়াঙস ট্রাভেল ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড–২, (লন্ডন : রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৫), ১৮৪–১৮৫।

৬৩ এ. কানিংহাম, আর্কিয়লজিক্যাল সারভে অফ ইন্ডিয়া অ্যানুয়াল রিপোর্ট, খণ্ড–১৫, ১৮৮২, পৃ. ১১০।

৬৪ ডি. সি. সরকার, স্ট্যাডিজ ইন দি জিওগ্রাফি অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মিডিএভল্ ইন্ডিয়া, (দিল্লী : মতিলাল বানারসিদাস, ১৯৬০), পৃ. ১১৩–১১৪।

৬৫. এন কে. ভট্টশালী, "নিউ শক্তিপুর গ্রান্ট অফ লক্ষ্মণসেনদেব অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশনস অফ অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল", জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড, লন্ডন, ১৯৩৫, পৃ. ৭৫–৭৬, ৮৭–৮৮।

৬৬. এন. জি. মজুমদার, ইন্সক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৯), লাইন নং ৩৩–৪৮, তর্পণদীঘি তাম্রলিপি এবং লাইন নং ৩৯–৫১, মাধাইনগর তাম্রলিপি, পৃ. ১০৪, ১১৫।

৬৭. সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত, আর. সি. মজুমদার ও অন্যান্য, (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৩৯), পৃ. ৮৫, ১৫৩।

৬৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২০।

৬৯. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬।

৭০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ১১৬–১১৭।

৭১. কোলে (সম্পা.), দশকুমারচরিত, (বোম্বে : ১৯২৬), পৃ. ১৪৯ ; উদ্ধৃত : আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৭২. শ্রীমদ বরাহমিহিরাচার্য, বৃহৎ সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) ও ধীরেন্দ্র কাব্যনিধি (অনু.), দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলিকাতা : নটবর চক্রবর্তী, ১৩১৭), চতুর্দশ ও ষোড়শ অধ্যায়, পৃ. ৫২ ও ৫৭।

৭৩ এইচ ডব্লিউ. স্মিথ (অনু.), "উইবারস স্যাকরেড লিটারেচার অফ দি জৈনস", ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারি, খণ্ড–২০, পৃ. ৩৭৫।

৭৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বাধ, পৃ. ৪।

৭৫ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–২৩, পৃ ১০৫।

৭৬ প্রাগুক্ত, খণ্ড–২৩, পৃ. ৭৪।

৭৭. প্রাগুক্ত, খণ্ড–১২, পৃ ৩৭–৪৩।

৭৮. প্রাগুক্ত, খণ্ড, ১৪, পৃ. ১৫৬–১৬৩।

৭৯. আর সি মজুমদার (সম্পা.), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ ২১-২২।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

৮১ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–১৪, পৃ ১১৭।

৮২. টি ওয়াটারস, অন য়ুয়ান–চুয়াঙস ট্রাভেল ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড–২, পৃ. ১৯১-১৯৩।

৮৩ ই বি. কোয়েল অ্যান্ড এফ ডব্লিউ. টমাস (অনু.), দি হর্ষচরিত অফ বাণভট্ট, (লন্ডন : রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৯৭), পৃ. ১৭৮।

৮৪. ডি সি. সরকার, স্ট্যাডিজ ইন দি জিওগ্রাফি অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মিডিএভল্ ইন্ডিয়া, পৃ. ১১২–১১৩।

৮৫ ই. বি. কোয়েল অ্যান্ড এফ. ডব্লিউ. টমাস (অনু.), দি হর্ষচরিত অফ বাণভট্ট, পৃ. ১৭৮।

৮৬. ইন্সক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ ১০৭, ১৩৮, ১৪১।

৮৭ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ১৪।

৮৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩।

৮৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বাধ, পৃ. ২।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৯২. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩।

৯৩. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ.১৯–২০ ডি. সি. সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৯৪. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ১৫।

৯৫. এস. এম. আলী, দি জিওগ্রাফি অফ পুরাণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, (নিউ দিল্লী : পিউপুলস পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩), পৃ. ১৫১।

৯৬. এ. ভট্টাচারিয়া, হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড আরলি মিডিএভল্ বেঙ্গল, পৃ. ৫৭–৫৮।

৯৭. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ১৫।

৯৮. এ. ভট্টাচারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১, ৯০।

৯৯. ডি. সি. সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

১০০. ইন্সক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ১১৮–১৩১; ১৩২, ১৪০–১৪৮।

১০১. এস. হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১০২. শ্রীমদ ববাহমিহিরাচার্য্য, বৃহৎ সংহিতা, চতুর্দ্দশ অধ্যায়, পৃ. ৫২।

১০৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোর–খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্কবণ, (কলিকাতা : শিব শঙ্কব মিত্র, ১৯৬৩), পৃ. ৬৯।

১০৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ১৪০–১৪৮।

১০৫ টি, ওয়াটাবস, অন য়ুয়ান–চুয়াঙস ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড–২, পৃ. ১৮৭।

১০৬. টি. গণপতি শাস্ত্রী (সম্পাদিত), আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, সংস্কৃত সিরিজ নং ৭০, ত্রিবান্দ্রম, ১৯২০, পৃ. ২৩২–২৩৩।

১০৭. জে. এফ. ফ্লীট, করপাস ইন্সক্রিপশন্স ইন্ডিকোরীমী, খণ্ড–৩ (ইন্সক্রিপশন্স অফ দি আবলি গুপ্ত কিংস অ্যান্ড দেয়ার সাকসেসবস), (কলিকাতা : দি সুপাবিন্টেন্ডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ১৮৮৮), পৃ. ৮।

১০৮. টি. ওয়াটারস, অন য়ুয়ান–চুয়াঙস ট্রাভেল ইন ইন্ডিযা, খণ্ড–২, পৃ. ১৮৭।

১০৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ৮৬–৮৭।

১১০. বি এম. মরিসন, পলিটিক্যাল সেন্টারস অ্যান্ড কালচাবাল বিজনস ইন আরলি বেঙ্গল, (টকসন : দি ইউনিভার্বসিটি অফ অবিজোনা প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ২৩–২৪।

১১১ ইন্ডিয়ান হিস্টবিক্যাল কোয়াবটাবলি, কলিকাতা, খণ্ড–২৩, পৃ. ২২১–২৪১।

১১২. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ (সম্পা.). এন. কে. ভট্টশালী কমেমোবেশন ভলুম, ঢাকা মিউজিযাম, ১৯৬৬, পৃ. ১১২–১১৩।

১১৩. এ. এম. চৌধুবী, "দেবপর্বত", জানাল অফ দি ববেন্দ্র বিসার্চ মিউজিয়াম, খণ্ড–১. ১৯৭২, পৃ ৬০–৬৭।

১১৪ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–২৭, পৃ. ১৮১–১৯১।

১১৫. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

১১৬. বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১১৩–১১৪।

১১৭. এ. এম. চৌধুরী. ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, (সি. ৭৫০–১২০০ এ. ডি.), (ঢাকা : দি এশিযাটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৭), পৃ. ১৬৩।

১১৮ এ. এইচ. দানী, 'ময়নামতি প্লেটস অফ দি চন্দ্রস', পাকিস্তান আর্কিয়লজি, নং ৩, ১৯৬৬, পৃ. ৪০১–৪৪৮।

১১৯. ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ারটারলি, কলিকাতা, খণ্ড–৯, পৃ. ২৮৭।

১২০. আব. সি. মজুমদাব, হিস্ট্রি অফ অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল, (কলিকাতা : জি. ভরদ্বাজ, ১৯৭১), পৃ. ২৭৮–২৭৯।

১২১. আ. কা. মো. যাকরিয়া, কুমিল্লা জেলাব ইতিহাস, (কুমিল্লা : ১৯৮৪), পৃ. ৩৬৭ ; উদ্ধৃত : আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১২২. বি. এম. মরিসন, পলিটিক্যাল সেন্টারস অ্যান্ড কালচারাল রিজনস ইন আরলি বেঙ্গল, পৃ. ৫২।

১২৩. এস. হোসেন, এভরিডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার, পৃ. ১৫।

১২৪. এ. এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃ. ১৫০–১৫২।

১২৫. বি. এন. মুখার্জী "প্লেস অফ হরিকেল কয়েনেজ ইন দি আর্কিয়লজি অফ বাংলাদেশ", জার্নাল অফ দি বরেন্দ্র বিসার্চ মিউজিয়াম, খণ্ড–৭, পৃ. ৫১–৬৮।

১২৬. কবিরাজ রাজশেখর, কর্পূরমঞ্জুরী, এস. কনাউ (সম্পা.), হার্ভাড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ক্যামব্রিজ, ম্যাস, ১৯০১, পৃ. ২২৬–২২৭।

১২৭. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১২৮. টি. গণপতি শাস্ত্রী (সম্পা.), আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, পৃ. ২৩২–২৩৩।

১২৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১১২।

১৩০. এ. এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃ. ২৫–২৬।

১৩১. বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১১২।

১৩২. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫–২৬।

খ. সেনরাজবংশের ইতিহাস

১. আর. সি. মজুমদার (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২০৫।

২. এন. জি. মজুমদার, ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ৪, ব্যারাকপুব তাম্রশাসন, পৃ. ৬৫।

৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৫, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫০।

৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪, মাধাইনগর তাম্রশাসন, পৃ. ১১৩।

৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩–৪, দেওপাডা শিলালিপি, পৃ. ৫০–৫১।

৬. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬, ৮, ৯, দেওপাডা শিলালিপি, পৃ. ৫১।

৭. প্রাগুক্ত, শ্লাক নং ৪–৫, মাধাইনগর তাম্রশাসন, পৃ. ১১৩।

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশেব ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৯. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ৫, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫০–৫১।

১০. রমেশচন্দ্র মজুমদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

১১. ডি. আর. ভাণ্ডাবকর, "ফরেন এলিমেন্টস ইন দি হিন্দু পপুলেশন" ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি, খণ্ড–৪০, পৃ. ৩৫।

১২. এ.এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (সি, ৭০০–১২০০ এ.ডি.), পৃ. ২০৫–২০৬।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

১৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ৩–৪, নৈহাটি তাম্রশাসন, পৃ. ৭৬।

১৫. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

১৬ পৃ. ২১০–২১১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

১৮. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ২২–২৩, ব্যাবাকপুর তাম্রশাসন, পৃ. ৬৬।

১৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৫, ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, পৃ. ৬৫।

২০. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

২১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

২২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১৯, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫৩।

২৩. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

২৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ১৬৮।

২৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭, ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, পৃ. ৬৫।

২৬. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

২৭. এইচ. পি. শাস্ত্রী, (সম্পা. ও অনু.), বল্লালচরিতম, (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৪), পৃ. ৬১, ৪৮।
২৮. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২০–২২, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫৩–৫৪।
২৯. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩–২২৫।
৩০. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২১১।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।
৩২. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।
৩৩. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ২২–৩১, ব্যাবাকপুর তাম্রশাসন, পৃ. ৬৬।
৩৪. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭।
৩৫. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২৩, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫৪।
৩৬ প্রাগুক্ত, লাইন নং ২২–৩১, ব্যারাকপুব তাম্রশাসন, পৃ. ৬৬।
৩৭. প্রাগুক্ত, লাইন নং ২৪, ব্যারাকপুব তাম্রশাসন, পৃ. ৬৭।
৩৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২১৫।
৩৯ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ২৯–৩৭, নৈহাটি তাম্রশাসন, পৃ. ৭৮।
৪০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৯, মাধাইনগব তাম্রশাসন, পৃ. ১১৪।
৪১. এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–৩০, পৃ. ৭৮–৮২।
৪২. এ.এম. চৌধুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।
৪৩. বল্লালসেন, অদ্ভুতসাগর, মুবলীধব ঝা (সম্পা.), (বেনারস : দি প্রভাকর অ্যান্ড কোং, ১৯০৫), পৃ. ৪।
৪৪. এইচ. পি. শাস্ত্রী (সম্পা. ও অনু.), বল্লালচবিত, পৃ. ১২১-১২২।
৪৫. এ এম. চৌধুবী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃ ২৩২–২৩৩।
৪৬ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২১৬।
৪৭. এন. কুণ্ড, কাস্ট অ্যান্ড ক্লাস ইন প্রি–মুসলিম বেঙ্গল, লন্ডন ইউনিভার্সিটি, পি–এইচ. ডি. থিসিস, ১৯৬৩, পৃ. ১৬৭-১৭০ ; উদ্ধৃত : এ. এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃ. ২৩৫।
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
৪৯. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ৮, মাধাইনগর তাম্রশাসন, পৃ ১১৪।
৫০. অদ্ভুতসাগব, পৃ. ৪।
৫১. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১১, মাধাইনগব তাম্রশাসন, পৃ ১১৪।
৫২. এ এম. চৌধুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮–২৩৯।
৫৩. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২২০।
৫৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, শ্লোক নং ১৩, ইদিলপুব তাম্রশাসন ও সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসন, পৃ. ১২৭–১২৮ ও ১৪০–১৪৪।
৫৫. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮৭), পৃ. ৩৭৩।
৫৬. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।
৫৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩–১৪৪।
৫৮. শ্রীধর দাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুবেশচন্দ্র ব্যানার্জী (সম্পাদিত), (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায, ১৯৬৫), ৫/১৮/৩, ৩/১৫/৪।
৫৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ২২১–২২২।

৬০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪১০।
৬১. যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : ১৩৩৫), পৃ. ৩৬৬ , উদ্ধৃত : এ.এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃ. ২৪৫।
৬২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ৯৩।
৬৩. মিনহাজ–ই–সিরাজ, তবকাত–ই–নাসিরী, পৃ. ২৪।
৬৪. এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–৩০, পৃ. ৪২–৪৬।
৬৫. প্রাগুক্ত, খণ্ড-২৭, পৃ. ১৮২-১৯১।
৬৬. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭–২৫৪।
৬৭. মিনহাজ–ই–সিরাজ, তবকাত–ই–নাসিরী, পৃ. ২৬–২৮।
৬৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪১২–৪১৩।
৬৯. মিনহাজ–ই–সিরাজ, তবকাত–ই–নাসিরী, পৃ. ১৮–২৬।
৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-৪০।
৭১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪১১–৪১৫।
৭২ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ৩৮, মাধাইনগর তাম্রশাসন, পৃ. ১৩৮।
৭৩. প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৮-৪৩, ইদিলপুর তাম্রশাসন, পৃ. ১২৯।
৭৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২১, ইদিলপুর তাম্রশাসন, শ্লোক নং ২১, মদনপাড়া তাম্রশাসন, পৃ. ১২৯, ১৩৮।
৭৫ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, পৃ. ২২৫–২২৬ ; বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪১৬ ; রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রথম দে'জ সংস্করণ, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৪), পৃ. ২৮৫।
৭৬ মিনহাজ–ই–সিরাজ, তবকাত–ই–নাসিরী, পৃ. ২৭।
৭৭ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসন, পৃ. ১৪২।
৭৮ প্রাগুক্ত, আদাবাড়ি তাম্রশাসন, পৃ. ১৮১।
৭৯. জে.এন. সরকার (সম্পা.), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–২, সেকেন্ড ইম্প্রেশন, (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ১৯৭২), পৃ. ৬৫।
৮০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪২৬।

গ. সেনযুগে বাংলার সমাজজীবন সম্পর্কিত উৎসসমূহ

১. ধোয়ী, পবনদূত, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (অনূ.), নতুন সংস্করণ, (কলিকাতা : এইচ. চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৯৪৭), ভূমিকা, পৃ. ১–৩।
২. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, (কলিকাতা : সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৭৮), আলোচনা ও বিচার, পৃ. ২–৩।
৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৭২), শ্লোক নং ৪, প্রথম সর্গ : পৃ. ৬।
৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৯, দ্বাদশ পৃ. ১৬০।
৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, শ্লোক নং ৪, প্রথম সর্গ, পৃ. ৬।
৬. এস. হোসেন, দি সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডিএভ্‌ল্ বেঙ্গল (ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ৭–৮।

৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, শ্লোক নং ৪, প্রথম সর্গ, পৃ. ৬।
৮. এস. হোসেন, "সাম আসপেক্টস অফ দি সুভাষিতরত্নকোষ", আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কমেমোরেশন ভল্যুম, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ১৮৫–১৮৬।
৯. বিদ্যাকব, সুভাষিতরত্নকোষ, ডি.ডি.·কৌশাম্বী অ্যান্ড ভি. ভি. গোখেল (সম্পা.), হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড নং ৪২, ১৯৫৭, ইন্ট্রাডাকশন, পৃ. ১৬ ও ৩১।
১০. শ্রীধর দাস, সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, সুবেশচন্দ্র ব্যানার্জী (সম্পা.), (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), পৃ. ১।
১১. শাহানাবা হোসেন, "সদ্যুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম", মমতাজুর রহমান তরফদাব, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পাবষৎ, ঢাকা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮০, পৃ. ৩৪–৩৫।
১২. শাহানারা হোসেন, "সুভাষিতরত্নকোষে বাংলাব গ্রাম", উত্তর নক্ষত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক অনিয়মিত সংকলন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, বাজশাহী, পৃ. ২।
১৩. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১৪, ভুবনেশ্বব লিপি, পৃ. ৩৫, ৩৯।
১৪. বাণী চক্রবর্তী, সমাজ সংস্কাবক রঘুনন্দন, ২য় সং, (কলিকাতা : বাণী চক্রবর্তী, ১৯৭০), পৃ ৩৫–৩৬।
১৫. জীমূতবাহন, কালবিবেক, মধুসূদন স্মৃতিবত্ন ও প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সম্পাদিত), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৫), পৃ. ভূমিকা : ৮।
১৬. বাণী চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ। ৩৮–৪১।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২–৪৩।
১৮. বল্লালসেন, অদ্ভুতসাগর, পৃ. ৪।
১৯. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণ সর্বস্বম, প্রথম খণ্ড, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ (অনূ.), (কলিকাতা : মহামিলন মঠ, ১৩৯৪), পৃ. ২–৭।
২০. সুবেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৯), পৃ. ২১৫।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮–২৩০।
২২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ ৫৫।
২৩. সৌমেন্দ্র নাথ সরকার (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮), পৃ. ২০৫।
২৪. এন. জি. মজুমদার, ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৯), পৃ. ৩২।
২৫. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাঙলাদেশে প্রত্ন সম্পদ, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪০৬–৪০৭।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬–২৭৭।
২৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ৬৬৭–৬৬৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেনযুগে বাঙালি সমাজের বর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাস

ক. বর্ণবিন্যাস

প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় স্বভাবত তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিশেষত বর্ণে বর্ণে বিভক্তি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত এই বর্ণস্তর তৎকালীন সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। শুধু তাহাই নহে, সেই ধারা বর্তমানকাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। ইহার উৎপত্তি কোন সময় তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সম্ভবত প্রাচীনকালের উষালগ্ন হইতেই ইহার বীজ উৎপন্ন হইতেছিল। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় সামাজিক ভিত্তি ছিল এই বর্ণবিন্যাস। আবার এই বর্ণবিন্যাস শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রভাবিত করে নাই, প্রতিবাদী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া আর্য ও অনার্য সংস্কার সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয় এই সামাজিক কাঠামোগত বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রভাব ফেলিয়াছে। তাই সামাজিক স্তর বিন্যাসের ইতিবৃত্ত ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ছিল এই ভারতীয় উপমহাদেশেরই পূর্বাঞ্চলীয় দেশ। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে বাংলাদেশেও সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন ও ইহার বিভিন্ন পর্যায়ের সৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় রাজাগণের শাসনকালে এই বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনই শুধু আনয়ন করে নাই, ইহার কঠোরতাও প্রদান করিয়াছিল। এই অধ্যায়ে সেন বংশীয় রাজাগণের শাসনকালে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে আলোচিত হইবে।

পাল বংশীয় রাজাগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে তাহারা পৃষ্ঠপোষকতা দান করিতেন। সমগ্র পালযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তৎকালীন রাজন্যবর্গের এই উদারতা ও নমনীয়তা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরবর্তী সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত এই সময়েই বর্ণগত সামাজিক রীতিনীতি সমাজে অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হইতে থাকে। এই সময়ের বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরগুলি আলোচিত হইল।

কর্ণাট হইতে আগত সেনরাজবংশ নিজেদেরকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়[১] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাহাদের মধ্যে ড. আর. ভাণ্ডারকরের মতামত সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার মতে সেনরাজগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ

ছিলেন, পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন বা যোদ্ধাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] দাক্ষিণাত্যে এই ধরনের বৃত্তি পরিবর্তনের আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সাতবাহন রাজবংশের নাম উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। এই সাতবাহন বংশীয় রাজগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীতে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করিলেও তাঁহারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতিতে গভীর বিশ্বাসী এবং বর্ণাশ্রম প্রথার পরম পৃষ্ঠপোষক।[৩] এই দাক্ষিণাত্য হইতে আগত উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারণকারী সেনরাজগণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি যে সুদৃঢ়ভাবে প্রবর্তন করিবেন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ একান্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বস্তুত পাল রাজবংশের ধ্বংসস্তূপের উপর সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু পালযুগের শেষার্ধে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটিয়াছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্মেষ হইয়াছিল। বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত মতবাদের উদ্ভব ও ইহাদের আচার-অনুষ্ঠান এবং সাধনপদ্ধতি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা পদ্ধতির সহিত মিলিত ও মিশ্রিত হইয়া যাইতেছিল। এই সম্পর্কে অতুল সুরের অভিমতটি বেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম দ্বারা হিন্দুধর্মও প্রভাবান্বিত হয়।[৪] এই অবস্থা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশ্বাসী ও পৃষ্ঠপোষক সেনরাজগণের ধর্মীয় নীতি ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। এই ধরনের ইঙ্গিত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমতে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে সমাজে দৃঢ়ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচলন করিয়াছিলেন।[৫] কারণ এই সময় ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী শাস্ত্রকার ও শাসকদের মধ্যে একটি সংরক্ষণবাদী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রকার ভট্টভবদেব নিজেকে "পাষণ্ডবৈতণ্ডিক" হিসাবে উল্লেখ করিয়া স্বীয় আত্মপরিচয় দিয়াছেন।[৬] সম্ভবত তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের সংরক্ষণবাদী মনোবৃত্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়াই নিজেকে এই ধরনের পরিচিতিতে অভিহিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহাছাড়া এই যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ তাহার রচিত ব্রাহ্মণ সর্বস্বমে প্রদত্ত আত্মপ্রশস্তিমূলক একটি শ্লোকে এই ধরনের মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন :

পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্ বিজয়তে হৈমং ক্বচিদ্ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূল মিন্দু ধবলং কৃষ্ণাজিনংক্বাপি চ।
ধূমঃ ক্বাপি বষট্ কৃতাহুতিকৃতো ধূপঃ পবঃ ক্বাপাভূ-
দগ্নেঃ কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাপতি যগ্মন্দিরে।।

যাঁহার গৃহে কোথাও কাষ্ঠ্যময়পাত্র, কোথাও স্বর্ণময় পাত্র, কোথাও চন্দ্রবৎ শুভ্রকান্তি বস্ত্র, কোথাও বা কৃষ্ণাজিন, কোথাও ধুম অথবা কোথাও বষট্কারপূর্বক আহুতি হইতে

উৎপন্ন ধূপ (গন্ধ) বিরাজ করিত। ফলতঃ অগ্নির কর্ম এবং তজ্জনিত ফল—উভয়ই তাঁহার গৃহে বিদ্যমান ছিল।[৭]

এই যুগে রচিত স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের এই ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে সেনরাজবংশের শাসকগণের মধ্যেও এই ধরনের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেনরাজ বল্লালসেন তাঁহার রচিত গ্রন্থে নিজেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভস্বরূপ দানসাগর গ্রন্থটি রচনা করেন এবং ভণ্ড, পাষণ্ড প্রভৃতি বিরোধী ধর্মের প্রভাব হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্যই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা তাঁহার স্বীয় উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।[৮] তাঁহার ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাব এতই প্রখর ছিল যে, তিনি পুরাণ শাস্ত্রকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করিলেও পাষণ্ডশাস্ত্রের অনুমোদনকারী দেবী পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই।[৯] ইহা হইতে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক শাসক ও স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এইভাবে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং ইহার সংরক্ষণবাদী নীতি প্রকাশ পাইল। জীমূতবাহন এই যুগের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র-লেখক ছিলেন এবং তিনি সুবিখ্যাত ব্যবহারমাতৃকা, দায়ভাগ ও কালবিবেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থগুলি ধর্মরত্ন নামক বৃহৎগ্রন্থের অংশ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার রচিত দায়ভাগ[১০] এবং কালবিবেক[১১] গ্রন্থটি সাক্ষ্য দিয়া থাকে। জীমূতবাহনের পরেই এই সম্পর্কিত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অনিরুদ্ধ ভট্ট। তিনি হারলতা ও পিতৃদয়িতা গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন। তিনি বল্লাল সেনের গুরু হিসাবেও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তবে তিনি শুধু রাজগুরুই ছিলেন না, সেনরাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষ (ধর্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ বিচারক) হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে বল্লালসেন নিজেই দানসাগর গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, 'বৃহস্পতি যেমন বৃত্রারি অর্থাৎ ইন্দ্রের গুরু তদ্রূপ অনিরুদ্ধ ছিলেন রাজা বল্লালসেনের গুরু।[১২] অনিরুদ্ধ বরেন্দ্রে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি বেদ চর্চায় সারস্বত পুরুষ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন অর্থাৎ বেদে তিনি এতই পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সরস্বতীর পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইত। তাঁহার চক্ষুদ্বয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ষটকর্ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং উত্তম ব্যবহারসম্পন্ন ও সত্যব্রত হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৩] তাহা ছাড়া অনিরুদ্ধের শিষ্য বল্লালসেন সর্বদা যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কার্যে রত থাকিতেন। তিনি নিজেও একাধিক স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন। তিনি চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন-দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর ও আচার সাগর। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর ব্যতীত অপর গ্রন্থ দুইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষা ও স্বীয় জ্ঞান অনুসারে বল্লালসেন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য দানসাগর গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।[১৪] কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটির রচনা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন এই গ্রন্থটির রচনা শেষ করেন।[১৫] অপর

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন হলায়ুধ। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম, মীমাংসা সর্ব্বস্বম, বৈষ্ণব সর্ব্বস্বম, শৈব সর্ব্বস্বম ও পণ্ডিত সর্ব্বস্বম অন্যতম।[১৬] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম গ্রন্থখানি ব্যতীত অন্যগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, প্রশংসনীয় কাজের জন্য সমসাময়িক সেনরাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে প্রভূত সম্মান ও অর্থসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই রাজপণ্ডিতের সম্মানে ভূষিত হন এবং লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে যৌবনে মহামাত্য এবং প্রৌঢ়বয়সে ধর্মাধিকার (ধর্মাধিকার অর্থাৎ আইন প্রণেতা) পদে নিযুক্ত করেন।[১৭] তাহাছাড়া হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান শ্রাদ্ধ, আহ্নিক প্রভৃতি বিষয়ে দুইটি মূল্যবান পদ্ধতি গ্রন্থ রচনা করেন। পশুপতি শ্রাদ্ধ পদ্ধতি ব্যতীত পাকযজ্ঞ সম্পর্কেও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৮]

সুতরাং এই যুগে রচিত অসংখ্য স্মৃতি ব্যবহার গ্রন্থসমূহে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজাপদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার আচার, অপরাধ, ইহার শাস্তিবিধান, স্ত্রীধন,সম্পত্তি বিভাজন, আহারে বাধানিষেধ, বিভিন্ন প্রকার দান, অশৌচ, স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন, কাজকর্মের শুভাশুভের বিচার-বিশ্লেষণ, কৃচ্ছ্রতাসাধন, উত্তরাধিকার, তিথি নক্ষত্রের কাল বিচার, ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের নিয়মকানুন প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে দ্বিজবর্ণের জীবন যাপনের একটি পৃথক ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে। মোটকথা, দ্বিজবর্ণের জীবনপ্রণালী গঠনে এমন কোনো নির্দেশ নাই যাহা এই সকল গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নাই।[১৯]

কিন্তু এই স্মৃতিশাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পশ্চাতে রাষ্ট্রের আনুকূল্য দানও ছিল অপরিহার্য। কারণ রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাবেই স্মৃতিশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক কয়েকটি বংশ খুবই বিখ্যাত ছিল। ইহাদের মধ্যে ভট্টভবদেবের বংশ, হলায়ুধের বংশ ও অনিরুদ্ধভট্টের বংশ অন্যতম। বস্তুত এই বংশসমূহের প্রতিপত্তি রাষ্ট্রই সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ রাষ্ট্র কর্তৃক অনুদান হিসেবে ভূমিদান লাভ করিয়া তাঁহারা বিত্তশালী হইয়াছেন। ফলে ক্রমশ রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমাজে স্মৃতি শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।[২০]

বিজয়সেন ও তাঁহার পুত্র বল্লালসেন শৈবধর্মের[২১] অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবধর্মের[২২] এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন সৌরধর্মের[২৩] অনুসারী ছিলেন। সেনবংশের পূর্বপুরুষ সামন্তসেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতটের পুণ্যাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সকল পুণ্যাশ্রমে তপোবন ঋষি সন্ন্যাসী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিত ঘৃতধূমের সুগন্ধে আমোদিত হইত। এখানে তপোবন নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া মৃগশিশুরা প্রতিপালিত হইত এবং সমস্ত বেদ শুকপাখিদের মুখে মুখে আবৃত্ত হইত।[২৪] এই প্রকার বক্তব্য নিছক ভাবকল্পনা মাত্র। এই ধরনের পৌরাণিক ধ্যান- ধারণা নিশ্চয় সেনরাজগণ কর্তৃক সমাজকে প্রভাবিত করিবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। ইহাকে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় সমাজে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[২৫] সামন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ বিজয়সেনের অনুগ্রহে বিত্তশালী ও ধনবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ নাগরিক রমণীদের নিকট মুক্তা, মরকত, মণি, রৌপ্য, বস্ত্র এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কাপাস বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীচি এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য শিক্ষা লাভ করিতেন।[২৬] বিজয়সেন যজ্ঞাদিকার্যে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। একবার চন্দ্রগ্রহণের সময় তাঁহার মহিষী বিলাসদেবী কনক তুলাপুরুষ[২৭] অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য মধ্যদেশাগত কান্তিজঙ্গার অধিবাসী বৎসগোত্রীয় রত্নকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, বহস্কর দেবশর্মার পৌত্র ও ভাস্কর দেবশর্মার পুত্র ভার্গব-চ্যবন-আপ্লুবান-ঔর্ব-জামদগ্ন্যপ্রবর ঋগ্বেদীয় অশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদাকর দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।[২৮] নৈহাটি তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে যে, বল্লালসেনের মাতা বিলাসবেদী গঙ্গানদীর তীরস্থ হেমাশ্বমহাদান[২৯] উপলক্ষ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ–আঙ্গিরস-বাহস্পত্য প্রবর, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ শ্রীবাসুদেব শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহা বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রলিপিতে উক্ত হইয়াছে।[৩০] লক্ষ্মণসেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বমিত্র-বন্ধুল-কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কান্বশাখার ব্রাহ্মণ রঘুদেব শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন ইহা তাহার আনুলিয়া লিপিতে উল্লেখিত হইয়াছে।[৩১] এই লিপিতে আরও উল্লেখ আছে যে, লক্ষ্মণসেন বহু ব্রাহ্মণকে ধান্যশস্য সমৃদ্ধ অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[৩২] লক্ষ্মণসেনের অভিষেক উপলক্ষ্যে গোবিন্দপুর তাম্রলিপিটি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই লিপির গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন বৎসগোত্রীয় এবং সামবেদীয় কৌথুম শাখার উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা।[৩৩] এই শাখাধারী অপর একজন ব্রাহ্মণকেও কিছু ভূমিদান করা হইয়াছিল। তিনি হইলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ঈশ্বরদেব শর্মা। রাজা লক্ষ্মণসেন হেমাশ্বরথ মহাদান[৩৪] যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের জন্য ঈশ্বরদেব শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।[৩৫] এই লিপিতে সর্বপ্রথম ও একটিমাত্র স্থানে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হইয়াছে যে, তৎকালীন সমাজেও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল।[৩৬] কৌশিক গোত্রীয়, অথর্ববেদীয়, পৈপ্পলাদশাখার ব্রাহ্মণ গোবিন্দদেব শর্মাকে ভূমিদান উপলক্ষে লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলিপিটি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল।[৩৭] লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রলিপিও প্রভাস, রামদেব, বিষ্ণুপাণি গড়োলী, কেশব গড়োলী প্রভৃতি শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণদেবকে ভূমিদান উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।[৩৮] তাহাছাড়া এই লিপিতে উল্লেখিত গার্গ গোত্রীয় এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার কৃষ্ণধর দেবশর্মা কিছু ভূমি অনুদান হিসাবে পাইয়াছিলেন।[৩৯] লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেব শর্মাকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[৪০] এতদ্ব্যতীত তিনি বহু ব্রাহ্মণকে ধান্যশস্যক্ষেত্র ও অট্টালিকাপূর্ণ বহুবিখ্যাত গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।[৪১] লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপসেন শিবপুরাণে বর্ণিত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপদেব শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।[৪২] তাঁহার অপর একটি লিপিতে উত্তরায়ণ–সংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থান দ্বাদশী তিথি, জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান

রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে বৎসগোত্রীয় যজুর্বেদীয় কান্বশাখার ব্রাহ্মণ হলায়ুধ শর্মা প্রচুর ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন।[৪৩]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ও বিষ্ণুর উপাসক দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেববংশীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিসমূহে অনুরূপভাবে ভূমিদানের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। এই বংশের অন্যতম শাসক দামোদর দেব যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধর শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।[৪৪] তাহাছাড়া এই বংশের অপর শাসক দশরথ দেবের আদাবাড়ি তাম্রলিপিটিও এই উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই তাম্রলিপিতে উল্লেখিত ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগও দেওয়া হইয়াছে। যথা : সন্ধ্যাকর, শ্রীমাক্রি (দিণ্ডীগাঞী) ; শ্রীশক্র, শ্রীমুগন্ধ (পালিগাঞী) ; শ্রীসোম (সিউগাঞী) ; শ্রীবাদ্য (পালিগাঞী) ; শ্রীপণ্ডিত (মাসচটক) ; শ্রীমান্তী (মূলগাঞী) ; শ্রীরাম (দিণ্ডীগাঞী) ; শ্রীলেধু (সেহন্দায়ী গাঞী) ; শ্রীদক্ষ (পুতিগাঞী) ; শ্রীভট্ট (সেউগাঞী) ; শ্রীবালি (মহান্তিয়াড়া) ; শ্রীবাসুদেব (করঞ্জগাঞী) ; শ্রীমিকো (মাসচটক গাঞী) প্রভৃতি।[৪৫] সম্ভবত এই সময় সমাজে গাঞী প্রথা সুনির্দিষ্টভাবে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কারণ ইতিপূর্বে ভট্টভবদেবের লিপিতে এই গাঞী প্রথার উল্লেখ হইয়াছে।[৪৬]

উপর্যুক্ত লিপিতথ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, তৎকালীন সেনবংশীয় রাজাদের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ টিকিয়া থাকিবার জন্য একটি ভূমি অনুদান হিসাবেও পায় নাই। অথচ লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রলিপিতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বও যে ছিল তাহার প্রমাণ বিদ্যমান।[৪৭] কিন্তু পাল রাজাদের শাসনকালের লিপিমালায় বৌদ্ধরাজবংশের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবত রাষ্ট্রকর্তৃক সেই সামাজিক উদার আদর্শ সেনামলে আর ছিল না। কারণ এই ধরনের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের উৎকীর্ণ লিপিমালার কোথাও নাই। তাহাছাড়া সেনরাজবংশ বাংলার চিরাচরিত আবহমান সামাজিক গতিপ্রকৃতি একেবারেই অস্বীকার করিয়া বাংলায় পৌরাণিক যুগের পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন।[৪৮] প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি প্রচলনের প্রয়াস হিসাবে লিপিমালার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও ইহার ছাপ পড়িয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থের আত্মপ্রশস্তিমূলক শ্লোকের একটিতে কাষ্ঠময় পাত্র, স্বর্ণময়পাত্র, শুভ্রকান্তি বস্ত্র, কৃষ্ণমৃগচর্ম, গন্ধময়ধূপ, বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতি ধূম বিরাজিত অগ্নির কর্ম ও তজ্জনিত ফল তাঁহার গৃহে বিদ্যমান থাকিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৯] উল্লেখিত শ্লোক সেনযুগের পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের পরিমণ্ডলেরই যেন প্রতিফলন। সুতরাং বলা যায় তখন সমাজে একবর্ণের আধিপত্য, এক আদর্শের প্রতিপত্তি এবং এক ধর্ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইল ব্রাহ্মণ্য বর্ণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং পৌরাণিক সমাজ আদর্শ। তাই এই সময়ের সাহিত্য ও লিপিমালাতে এই প্রকারের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের আধিপত্য ও প্রতিপত্তিই পরিস্ফুটিত হইয়াছে। এই আদর্শই ছিল তৎকালীন সমাজের স্বরূপ। তাহাছাড়া রাজকীয় ইচ্ছায় এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সমাজে একটি নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে—ইহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সুতরাং কর্ণাটাগত সেনরাজগণের রাজত্বকালে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই যুগের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি প্রকট আকার ধারণ করে। এখানে

তখন অন্য কোনো আদর্শ ও ব্যবস্থার স্বীকৃতি ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রের একান্ত ইচ্ছায় ও নির্দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি তদ্রূপ সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা বাংলায় গড়িয়া উঠিল। ইহারই প্রভাব সমসাময়িক স্মৃতিশাস্ত্র, বৃহদধর্ম্মপুরাণ ও সমসাময়িক লিপিমালায় প্রতিফলিত হইল।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণেরা এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক রাজ্য ও সমাজের শীর্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেন। নানা গোত্র, নানা প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখায় বিভক্ত অসংখ্য ব্রাহ্মণ ষষ্ঠ–সপ্তম শতকে বাংলায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তখন উত্তর ভারত হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় নতুনভাবে বসতি স্থাপন শুরু করেন। ইহার বিবরণ তৎকালীন লিপিতেও ধরা পড়িয়াছে।[৫০] অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের অসংখ্য লিপিতে লাট (গুজরাট), মধ্যদেশ, হস্তিপদ, চন্দবার, মৎসবাস, কুন্তীর, মুক্তাবাস্ত, তর্কারি, ক্রোডাঞ্চিক্রোড়নঞ্জ প্রভৃতি এলাকা হইতে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের বাংলায় বসতি স্থাপনের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৫১]

গাঞী বিভাগ

রাজা স্বয়ং অথবা বিত্তবান ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি অথবা গ্রামদান করিতেন। এই ভূমিদানের বিষয় পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। এই সকল ভূমিদান ব্রাহ্মণদের পরিচিতি অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয় এবং যে ব্রাহ্মণ যে ভূমি বা গ্রাম ভূমিদান হিসাবে পাইয়াছেন— ইহা অনুসারে বাংলায় গাঞী প্রথার সৃষ্টি হয় এবং ইহা তাঁহাদের নামের পশ্চাতে উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সম্পর্কে ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপি প্রথমেই উল্লেখ করিবার যোগ্য। এই লিপি হইতে জানা যায় যে, ভবদেবভট্টের মাতা একজন বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন।[৫২] কিন্তু ভট্টভবদেব নিজে সাবর্ণগোত্রীয় এবং সিদ্ধল গ্রামীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।[৫৩] ইহা ছাড়া এই ধরনের ব্রাহ্মণ ছিলেন শান্ত্যাগরাধিকৃত ব্রাহ্মণ রামদেব শর্মা। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজা ভোজবর্মণের রাজকর্মচারী ছিলেন।[৫৪] বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট চম্পাহাটীয়[৫৫] এবং জীমূতবাহন নিজেকে পারিভদ্রীয়[৫৬] ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। রাজা দশরথদেবের আদাবাড়ি তাম্রলিপিতে দিণ্ডী, পালি, সেউ, মাসচটক, মূল, সেহন্দায়ী, পুতি, মহান্তিয়াড়া এবং করঞ্জ প্রভৃতি গাঞীর পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৭] হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের মহাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি স্বীয় মাতার পরিচয় দিয়াছেন গোচ্ছাষণ্ডী গ্রামীয় হিসাবে।[৫৮] লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি শ্রীনিবাসের পরিচয় মহিন্তাপনীয় পরিবার হিসাবেও উল্লেখিত হইয়াছে এবং ইহা সম্ভবত তাঁহার গাঞী পরিচয়ই বহন করিতেছে।[৫৯] বরেন্দ্রীর তটক, মৎস্যবাস, রাঢ়ের ভূরি-শ্রেষ্ঠী, পূর্বগ্রাম, তালবাটি, কাঞ্জিবিল্লী এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের গ্রাম যথা : ভট্টশালী, শকটী, রত্নামালী, তৈলপাটী, হিজ্জলবন, চতুর্থ খণ্ড, বাপডলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৬০] এই সকল গ্রাম ব্রাহ্মণদের নামের শেষে উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ী,

পুতিতুণ্ড, পিপলাই, ভট্টশালী, কুশারী, বটব্যাল প্রভৃতি উপাধি গ্রামের নাম হইতে উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন।[৬১] তাহাছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই সমস্ত উপাধি আবার নামের পূর্বেও বসিত। টীকা সর্বস্বের (গ্রন্থ) রচয়িতা আর্তিহার পুত্র সর্বানন্দ 'বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[৬২] সুকুমার সেন মনে করেন যে, ব্রাহ্মণদের বন্দ্যঘটীয় উপাধি হইতে বর্তমান কালে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে।[৬৩] ইহা ছাড়াও সমকালীন সাহিত্য ও লিপিমালায় এই ধরনের বহু উল্লেখ রহিয়াছে।

ভৌগোলিক বিভাগ

ব্রাহ্মণদের গোত্রী বিভাগ অপেক্ষা ভৌগোলিক বিভাগ ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য তথ্য হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদেরকে বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশে অপারগ বলিয়া ভৎসনা করিয়াছেন। তাহার মতে, উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্রাহ্মণদের বেদজ্ঞান ছিল যথার্থ।[৬৪] এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় দ্বাদশ শতকে বাংলায় জনপদের নামানুসারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা বলিয়াছেন।[৬৫] অবশ্য ইহার পশ্চাতে যুক্তিসঙ্গত কারণও রহিয়াছে। রাঢ় ও বরেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও লিপিতে বরেন্দ্রের তটক গ্রামীয় একজন ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে বসতি স্থাপনের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৬৬] ইহা হইতে আমরা স্পষ্টভাবে অনুমান করিতে পারি যে, তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের ভৌগোলিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

উপর্যুক্ত রাঢ়ীয়-বরেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য হইতে আগত ব্রাহ্মণেরা যথাক্রমে পাশ্চাত্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে পরিচিতি অর্জন করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, হলায়ুধ বর্ণিত তথ্যে পাশ্চাত্য ও উৎকল ব্রাহ্মণদের বেদজ্ঞানের বিষয় জানা যায়।[৬৭] এই সময় পাশ্চাত্য বলিতে উত্তর ভারতকে বুঝান হইত এবং সম্ভবত: উৎকল ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ ভারতই ছিল দাক্ষিণাত্য।[৬৮] হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ সর্বস্বম গ্রন্থ রচনার কারণ হিসাবে রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিনীতি অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যই কি তৎকালে রাঢ় ও বরেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণদের বেদজ্ঞান যথার্থ ছিল না অথবা বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিনীতি তাঁহাদের একেবারেই অজানা ছিল? বিশ্লেষণ করিলে আমরা অবগত হইতে পারি যে, বোধ হয় ইহাদের এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতা কম ছিল। কারণ হলায়ুধের পূর্বে রাজা বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টও এই ধরনের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার পিতৃদয়িতা গ্রন্থে বাংলাদেশে বেদ অনুশীলনে অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।[৬৯] চর্যাপদ ও দোহাকোষ হইতেও আমরা ইহার আভাস পাইয়া থাকি। চর্যাগীতের ২৯ নং গীতে লুইপাদ বলিতেছেন :

> জাহের বাণ চিহ্ন বুবণ জাণী
> মো কইসে আগম বেএ বখাণী।

যাহার বণ চিহ্ন রূপ জানা নাই তাহাকে কিভাবে আগম বেদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।[৭০]

তাহাছাড়া সরহপাদ তাঁহার একটি দোহায় ব্রাহ্মণদের ধর্মকর্মের প্রতি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেছেন :

বহ্মানোহি মজানন্ত হি ভেউ।
এ বই পডিঅউ এ চচউ বেউ।।
মট্টি (পানী কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহি বইসী) অগ্‌গি হুণন্তী।।
কজ্জে বিরহিঅ হুঅ বহ ছোমেঁ।
অ কম্মি উহ্যাবিঅ কুড়এঁ ধর্মেঁ।।

ব্রাহ্মণেরা সত্যকার ভেদ জানে না। এভাবেই চতুর্বেদ পঠিত হয়।। মাটিজল কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে। ঘরে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়। কায বিরহিত (ফলহীন) অগ্নি হোমের ফলে শুধু কটু ধূমের দ্বারা চোখ পীড়িত হয়।।[৭১]

অবশ্য হলায়ুধ পাশ্চাত্য ও উৎকল দেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে বসবাস করিবার বিষয় উল্লেখ করেন নাই। তবুও অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, চর্যাগীতি ও দোহাকোষে বর্ণিত বাংলাদেশে বেদচর্চার অভাব, উৎকল ও পাশ্চাত্যে বেদজ্ঞানের প্রসার এবং পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশে ইহাদের উদ্ভবের বিষয়ই প্রমাণ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও ব্রাহ্মণদের আরও কয়েকটি শ্রেণীর কথা জানা যায়। ইহাদের মধ্যে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ অন্যতম এবং ইহার সর্বপ্রথম উল্লেখ লিপিতে পাওয়া যায়। বিহারের গয়া জেলায় প্রাপ্ত একটি লিপিতে জনৈক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর জয়পানি কর্তৃক গৌড় দেশের এক রাজকর্মচারীর কন্যাকে বিবাহের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৭২] এই শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে অপর উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শাকদ্বীপ হইতে যে দেবল ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন তাঁহারা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং জনৈক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার বংশধরেরা গ্রহবিপ্র বা গনক নামে অভিহিত হইয়াছেন।[৭৩] এই গ্রহবিপ্ররা পূজা-অর্চনা করিতেন এবং সমাজে সম্মানজনক স্থান দখল করিয়াছিলেন। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে এই ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখ আছে এবং তাঁহাদের গ্রহশান্তির বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে নায়কের প্রতি নায়িকার গভীর প্রেমের বর্ণনা প্রসঙ্গে :

ন নিরূপি তোহসি সখ্যা নিয়তং নেত্রবি ভাগমাত্রেণ।
হারযতি যেন কুসুমং বিমুখে ত্বয়িকুণ্ঠ ইব দেবে।।

আপনি তো সখীর নেত্র-কটাক্ষের বিষয়মাত্র নন ; কেন না, লোকে যেমন কুণ্ঠিত দেবতার তৃপ্ত্যর্থে পূজা দেয়, আপনার অদর্শনে সে-ও তেমনই পূজা দেওয়ায়।[৭৪]

তাহাছাড়া গণক জাতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।[৭৫] তাঁহারা খড়ি দিয়া মাটিতে আঁকিতেন এবং ভাগ্য গণনা করিতেন। তাঁহাদের কপটতা সম্পর্কে আর্যাসপ্তশতীর একটি

শ্লোকে নায়িকার প্রতি নায়কের কপটতার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে :

সা পাণ্ডু দুর্বলাঙ্গী নয় সিত্বং যত্র যাতি ত ৈ্রব।
কঠিনীব কৈতববিদো হস্তগ্রহ মাত্র সাধ্যতে॥

আপনার (নায়ক) বিরহে সে (নায়িকা) পাণ্ডু ও দুর্বল। কপট গণেকের হস্তের খড়ির মত সে (নায়িকা) একান্তভাবে আপনার পরিচালনাধীন। আপনার ইশারা মতই সে চলিবে, যেমন করিয়া আপনি চালাইবেন।[৭৬]

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়-বঙ্গ গ্রন্থের আলোচনায় এই গণকদেরকে কৈতববিদ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৭৭] সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কপটতা ছিল সর্বজনবিদিত। এই জন্য তাঁহারা সমাজে সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন না এবং তাঁহারা পতিত বলিয়াই গণ্য হইতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই ধরনের ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। কারণ হিসাবে বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করত: জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাঁহাদের অত্যধিক আসক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণদের একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহারাও পতিত বলিয়া গণ্য হন। কারণ তাঁহারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শূদ্রদের নিকট হইতে প্রথম দান গ্রহণ করেন।[৭৮] এই পুরাণে আরও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা জানা যায়, তাহা হইল ভট্ট ব্রাহ্মণ। সূত পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানেরাই এই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে সমাজে পরিচিত হইতেন। ইঁহারা অপরের যশোগান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাই সমাজে খুববেশী সম্মান তাঁহাদের ছিল না এবং ইহারা ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ে ছিল।[৭৯] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এই ভট্ট ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বর্তমানকালের ভাট ব্রাহ্মণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[৮০] এই নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সঙ্কর জাতির পৌরোহিত্য করিবেন, তবে অন্য জাতির (শূদ্র) পৌরোহিত্য করিলে তাঁহারা পতিত হইবেন।[৮১] তাহাছাড়া ভট্টভবদেবও বলিতেছেন যে, এইসব ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের শিক্ষাদীক্ষা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন না। অবশ্য ভট্টভবদেব প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে কৃচ্ছ্রতাসাধনের বিধানও দিয়াছেন।[৮২] বস্তুত: ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তিই ছিল শাস্ত্রাধ্যায়ন ও ধর্মকর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা। এই সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্রাহ্মণ হরিভক্তি বিমুখ সে হবিপরায়ণ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম ; হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল—মুক্তিলাভ করিলেও হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ নরকগামী হইবে।"[৮৩] হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ সর্বস্বম্ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে, সে অতিশীঘ্র জীবিত অবস্থাতেই সন্তান-সন্ততি সমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, বেদ অধ্যয়ন ও বেদের অর্থজ্ঞানে পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ শূদ্ররূপে পরিগণিত হন।[৮৪] অপরদিকে বল্লালচরিতে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, দান ও প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।[৮৫] সুতরাং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ধর্মকর্ম করিবে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। তবে ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য কাজও করিত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চরাজকর্মচারী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন তাহা সেনযুগের লিপি এবং সাহিত্যে উল্লেখ আছে। তাঁহাদের মধ্যে ভট্টভবদেব, হলায়ুধ

অন্যতম।[৮৬] তাহাছাড়াও ব্রাহ্মণেরা কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন।[৮৭] সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রধান কার্য ধর্মকর্ম হইলেও তাঁহারা রাজকার্য ও কৃষিকার্য করিতেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের মর্যাদাহানি হইত না, কিন্তু বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা এবং তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। মোট কথা, তাঁহারা শূদ্রদের কোনরূপ সংস্পর্শে যাইতে পারিত না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাঁহারা পতিত হইত এবং সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া যাইত।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

সেনযুগে বাংলায় উক্ত বর্ণদ্বয়ের সম্ভবত: প্রভাব-প্রতিপত্তি তৎকালীন সময়ে খুব বেশি ছিল না। এই সম্পর্কে অতুল সুর অনুমান করিয়া বলিতেছেন যে, '...উত্তরভারতের ন্যায় বর্ণবাচক জাতি হিসাবে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' জাতি কোন দিনই বাংলাদেশে ছিল না।'[৮৮] অন্যদিকে নীহাররঞ্জন রায় বলিতেছেন, 'বৃহদধর্ম্মপুরাণে দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সমস্তই সংকর, চতুবর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ, এবং তাঁহারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের উল্লেখই এই গ্রন্থে নাই।"[৮৯] অন্যত্র নীহাররঞ্জন রায় আবার বলিয়াছেন, "বাংলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ ম্লেচ্ছদের লইয়া গঠিত, করণ-কায়স্থ অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র পর্যায়ে সর্বনিম্নে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা।... আর যাঁহাবা, তাঁহারা এবং অন্যান্য বিচিত্র জীবনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শূদ্রান্তর্গত বিভিন্ন উপবর্ণ গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন ইঙ্গিত-আভাস কিছুই নাই।"[৯০] এবং বৃহদধর্ম্মপুরাণের উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণ সকল সবই শূদ্র (বর্ণসঙ্কর) হিসাবে চিহ্নিত।[৯১] অথচ তৎকালীন বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কারণ তাহাদের সম্পর্কে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বল্লালচরিত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও লিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে, '...প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়ই রাজপদবাচ্য। সত্য, দান, বিষ্ণুভক্তি, বিপ্রসেবা, দর্প, বিরোধ, নিয়ত যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ, পরিখা খনন, গূঢ় চর দ্বারা রাজ্যের অবস্থা পরিদর্শন, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা, বহু লোকের বা একজনের সহিত মন্ত্রণা না করা, সাবধানে দণ্ডবিধান, দণ্ডিতদিগের রক্ষা, শাস্ত্রাদর, বিপ্রভক্তি এবং ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর জাতির নিকট কর গ্রহণ করা রাজার ধর্ম। রাজগণ শোক, বিষাদ, মোহ, ব্যয়শঙ্কা ও মূর্খতা পরিত্যাগ করিবে এবং প্রজাগণের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকিবে। ...চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ ও দুর্বিনীদিগকে শঙ্কিত রাখিবার জন্য ভূপতিগণ ধর্মাধিকরণ স্থাপন করিবেন।' বৈশ্যগণ সম্পর্কে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের অপর অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, '...কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুশীদ ও বৃদ্ধি, নৃপতির তুষ্টি সাধন, ধান্য, তণ্ডুল, বস্ত্র, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, ঘৃত ও তৈলাদি সঞ্চয়, ক্রয় এবং বিক্রয় এই সকল বৈশ্যের ধর্ম।... বৈশ্যগণ হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ধান্য, ভূমি, গো, মেষ, বস্ত্রাদি এবং সমুদয় গন্ধ দ্রব্যের মূল্য অনুসন্ধান রাখিবে। যে বস্তু যে মূল্যে ক্রীত হইবে, তাহার

যোড়শাংশ লাভ করিবে। নতুবা অতিরিক্ত লাভ করিলে ধর্ম্মের হানি হইবে।"[৯২] এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণের বিষয়াদি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অন্তর্বিভাগ করা হয় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে, "চন্দ্র, সূর্য ও মনু হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হন, তাহারা ক্ষত্রিয় হইলেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয়ত্রয়ই প্রধান। প্রজাপতির উরু হইতে বৈশ্যের...উৎপত্তি হয়।"[৯৩] অন্যদিকে বল্লাল রচিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের বিভাগ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, 'পাণ্ডব, পৌরব, বৌদ্ধ, সহস্রার্জ্জুন হৈহয়, চন্দ্রাত্রেয়, কলচুরি, রট্ট যাদব, তোমর, কৌশিক, কৌকুর ও কুশ্য ইহারা সোম বংশোদ্ভব। ইক্ষাকু, নিকুম্ভ, মৌর্য্য, সাগর, কচ্ছপঘাত, রাঘব, গোভিল ও গাহাড়বাল, ইহারা সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয়। চাহমান, মল্ল, ছিন্দ, চোপোৎকট, চৌলুক, সিলার ও হুন, ইহারা ব্রহ্ম বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। মহাবল পরমারগণ শালুকিক, সেন্দ্রক ও কাদম্বেয়গণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। বেণ, বৈণ্য, পৃথ, পৃথ্বীহার ও বৈনতেয়, ইহারা তার্ক্ষ্যবংশীয়, আর পাল নামক ক্ষত্রিয়েরা অধম ক্ষত্রিয়। ইতি ক্ষত্রিয় বর্ণ বিভাগ। উপকেশা, প্রাগ্বাট, রোহিত, মহোৎসব, মাহিস্মত্য, বৈশাল্য, কৌশাম্ব্য শ্রাবক ও আমোস্বিক ও গুর্জ্জ ও উজ্জানিক, ইহারা বণিক বলিয়া খ্যাত। সুবর্ণ বণিকেরা বৈশ্যের অধম। ইতি বৈশ্য বিভাগ।[৯৪]

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্পর্কে অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কি বলা হইয়াছে তাহাও দেখা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, 'বৃদ্ধাপস্তম্ব—(বিপ্র), ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অথবা অপর স্ত্রীরত নারীর সহিত যৌন সঙ্গম করিলে অধমর্ষণ মন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করিলে বিশুদ্ধ হন।[৯৫] আপস্তম্বের শ্লোক উল্লেখ করিয়া ভট্টভবদেব বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অন্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা অর্ধেক এবং বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম, আবার ক্ষত্রিয় শূদ্রান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম এবং বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক ও বৈশ্য শূদ্রান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক করিতে হইবে।[৯৬] আবার জীমূতবাহন বিবাহাদি সম্পর্কে মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'শূদ্র শুধুমাত্র শূদ্রাকে বৈশ্য বৈশ্যাকে বা শূদ্রাকে বিবাহ করিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ এবং ব্রাহ্মণ চারিবর্ণ হইতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে।[৯৭]

সুতরাং তৎকালীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের উল্লেখ থাকিবার ফলে আমাদের এই ধারণাই জন্ম দেয় যে, তৎকালীন বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের অস্তিত্ব ছিল যাহা উপর্যুক্ত সূত্রসমূহে প্রমাণ মিলিয়াছে। আবার বর্ণসঙ্কর (শূদ্র বর্ণ) সৃষ্টির মূলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উল্লেখ আমরা বহুবার পাইয়া থাকি। যদিও তৎকালীন বাংলাদেশে ক্ষত্রিয়গণ সকলেই যে রাজপদ গ্রহণ করিবেন এমন আশা দুরূহ। কারণ, সেনলিপিতে তাঁহাদেরকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়[৯৮] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেনরাজগণ বাংলার রাজপাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। সর্বজনগ্রহণযোগ্য ড. ডি.আর. ভাণ্ডারকরের মতে, 'সেনগণ প্রথমে

ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীতে ক্ষত্রিয়ধর্ম বা রাজবৃত্তি গ্রহণ করেন।[৯৯] তাই সম্ভবত বৃদ্ধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, রাজগণ সাধুশীল পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অন্যান্য সকলের যথাবিধি বৃত্তিস্থাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন এবং পুরুষে পুরুষে নিজ নিজ সৎ কর্মদ্বারা কীর্তি স্থাপন করিবেন।[১০০] সুতরাং ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বৃত্তি প্রধানত রাজপদ অলংকার করা। কিন্তু সব ক্ষত্রিয় যে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন এমন চিন্তা না করাই যুক্তিযুক্ত।

অন্যদিকে সেনযুগে বাংলার ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাটা পড়িয়াছিল। তখন দেশ মূলত কৃষিনির্ভর হইয়া যায়। তাই সম্ভবত বৈশ্যদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড স্তিমিত হইয়া যায়। ইহার নজির তৎকালীন সাহিত্যেও ধরা পড়িয়াছে। আযাসপ্তশতীতে বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক জীবন ধ্বংসের করুন চিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে।[১০১] কারণ এই সময় সেন রাজগণের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ফলে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপেক্ষিত হইতে থাকে এবং বাংলার অর্থনীতি আমলাদের আওতাধীন হইয়া যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার অর্থনীতি কৃষির উপর নিভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবত সমকালীন সময়ে তাঁহাদের আর্থিক তথা সামাজিক অবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতেও খারাপ হইয়াছিল।

সুতরাং প্রাচীন বাংলায় তথা সেনযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব ছিল। যদিও ক্ষত্রিয়দের প্রধান যে বৃত্তি নির্ধারণ শাস্ত্রে করা হইয়াছে—তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা দুঃসাহ ছিল। তাই শাস্ত্রে আবার অন্য নির্দেশও আসিয়াছে। এবং বৈশ্যবর্ণের বাণিজ্যিক বৃদ্ধি তৎকালীন বাংলাদেশে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। তাই উক্ত বর্ণের প্রভাব অনেকাংশে লোপ পাইয়াছিল। হয়ত এই জন্যই ঐতিহাসিকভাবে ইতিপূর্বে গ্রহণযোগ্য হয় নাই।

শূদ্র বা সঙ্করবর্ণ

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয়ের পরই শূদ্র বর্ণের অবস্থান। শূদ্র বর্ণ সম্পর্কে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে, "শূদ্রগণ বিপ্রসেবায় আলস্য করিবে না এবং কদাচ ব্রাহ্মণকে আজ্ঞা বা অবজ্ঞা করা কিংবা ব্রাহ্মণগণের আচরণীয় বৈদিক বা লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, পুরাণ পাঠ, বেদ পাঠ ও শাস্ত্রার্থের কথন শূদ্রের কদাচ কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে বর্ণমালা ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, শ্লোক বা শ্লোকার্থ অধ্যায়ন করান শূদ্রের অকর্তব্য।"[১০২] অন্যত্র এই গ্রন্থে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের সঙ্কর্যবশত বা অবাধ মিশ্রণে সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইবার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আবার এই সঙ্কর বর্ণের সকলেই শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "অরাজক দেশে পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত বলপূর্বক সংসর্গ করে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ায় উপগত হয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর প্রতি আসক্ত হয়, এই রূপে কুলে সঙ্কর দোষ হয়। ...এইরূপ অন্য জাতীয় পুরুষের সহিত অন্য জাতির স্ত্রীকে সঙ্গত করিয়া বর্ণ সঙ্কর কারক

রাজা...সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইলে।[১০৩] আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে, "পরে সেই চারি জাতিরই সাঙ্কর্য্যবশতঃ অর্থাৎ দুই প্রকার জাতির স্ত্রী-পুরুষ হইতে যাহাদিগের জন্ম হয় তাহারা বর্ণ সঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ।[১০৪] আর এই সঙ্কর বর্ণের সকলকে শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রথমত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এই সঙ্কর বর্ণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা : উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর ও অধম সঙ্কর। আবার এই গ্রন্থে এই সকল বর্ণের অন্তর্গত উপবর্ণের প্রত্যেকটির স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ইহাদের ৩৬টি উপবর্ণের উল্লেখ হইয়াছে। যদিও কার্যত ৪১টি উপবর্ণ ইহার তালিকায় পাওয়া যায়।[১০৫] এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উল্লেখিত ৩৬টি জাতি বা উপবর্ণ আদি পর্যায়ে ছিল এবং পরবর্তীকালে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪১টি হইয়াছে।[১০৬] যাহাই হউক অন্য জাতীয় পুরুষ এবং অন্য জাতীয় স্ত্রীর সঙ্গত সন্তানগণ এই বর্ণ সঙ্করের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উত্তম সঙ্কর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ

১. করণ : শূদ্রার গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তান করণ জাতি এবং ইহারা লেখক ও রাজকর্মে অভিজ্ঞ ও সৎশূদ্র বলিয়া অভিহিত।

২. অম্বষ্ঠ : বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি এবং ইহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়ায় বৈদ্য বলিয়া পরিচিত, ধর্মকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত।

৩. উগ্র : ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে এবং শূদ্রানীর গর্ভে উগ্রদের উৎপত্তি, ইহারা ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী যোদ্ধা এবং মাগধ বলিয়া পরিচিত। অবশ্য পরে এই উগ্ররা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের লিপিপত্র বহন বৃত্তি হিসাবে প্রাপ্ত হয়।

৪. মাগধ : বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয় পত্নীব গর্ভে মাগধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা কর্মজীবী হিসাবে উগ্রজাতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

৫. তন্তুবায় : ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন জাতি তন্তুবায় এবং ইহাদের বস্ত্রবয়ন পেশা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৬. গন্ধবণিক : ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত গন্ধবণিকেরা গন্ধক দ্রব্য বিক্রয়ের অধিকার পাইয়াছে।

৭. নাপিত : শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন নাপিত জাতি ক্ষৌরকর্মে পারদর্শী হইয়াছে।

৮. গোপ : বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে গোপবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং লিখন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

৯. কর্মকার : শূদ্র পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তান কর্মকার জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের জীবিকা উত্তরাধিকার সূত্রে লৌহকর্ম।

১০. তেলি : বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন তোলি জাতি গুবাক বিক্রয় কর্ম হিসাবে পাইয়াছে।

১১. কুম্ভকার : ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান কুম্ভকার জাতি এবং ইহারা মৃত্তিকাশিল্পে দক্ষ হইয়াছে।

১২. কংসকার : ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন জাতি কংসকার তাম্র ও কাংস্যাদির কার্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

১৩. শংখকার : ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শংখকার জাতি শাঁখারি কার্যে অভিজ্ঞ হইয়াছে।

১৪. দাস : শূদ্র পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন জাতি দাসেরা কৃষিকার্যে বহাল হইলেন।

১৫. বারজীবী : ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাকন্যার গর্ভে উৎপন্ন জাতি বারজীবীরা পান চাষকারী হইলেন।

১৬. মোদক : শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত মোদক গুড় তৈরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন।

১৭. সুত : সম্ভবত ইহারা পতিত ব্রাহ্মণ।

১৮. রাজপুত : ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন রাজপুত জাতির কোনো বৃত্তি নির্দিষ্ট হয় নাই।

১৯. তাম্বুলী : বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে তাম্বুলীরা পান বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

২০. মালাকার : বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন মালাকাররা দেবপূজার পুষ্পাহরণরূপ বৃত্তি পাইলেন।

মধ্যম সঙ্কর পর্যায়ে ১২টি উপবর্ণ

১. তক্ষণ : করণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে তক্ষণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহারা খোদাইকর কার্য হিসাবে পাইয়াছেন।

২. রজক : বৈশ্য মাতার গর্ভে করণের ঔরসে.রজক জাতির উৎপত্তি এবং তাহারা ধোপার কাজে নিবেদিত হইলেন।

৩. স্বর্ণকার : অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন স্বর্ণকাররা স্বর্ণরূপ্যাদির অলঙ্কার তৈয়ারিতে পারদর্শী হইয়াছে।

৪. সুবর্ণ বণিক : বৈশ্য কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ পিতার সন্তান সুবর্ণ বণিকরা সোনার ব্যবসায়ে রত হইলেন।

৫. আভীর : বৈশ্যার গর্ভে গোপের ঔরসে জন্মাইয়া আভীর জাতি গোয়ালা হইল।

৬. তৈলকার : গোপের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত তৈলকার জাতি তৈলাদি ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইলেন।

৭. ধীবর : গোপের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ধীবর মৎস্য ব্যবসায়ী হইলেন।

৮ শৌণ্ডিক : শূদ্রাণীর গর্ভে গোপ পিতার ঔরসে শৌণ্ডিক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

৯ নট : মালাকারের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে নটদের উৎপত্তি এবং তাহারা নাচগানে পারদর্শী হইলেন।

১০. শাবক : মাগধের ঔরসে শূদ্রাকন্যার গর্ভে শাবক জাতি জন্মগ্রহণ করিল এবং তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ নাই।

১১. শেখর : শূদ্রা কন্যার গর্ভে মাগধের ঔরসে শেখর জাতি জন্মগ্রহণ করিল এবং ইহাদেরও বৃত্তির উল্লেখ নাই।

১২. জালিক : জালিক জাতি শূদ্রা নারীর গর্ভে মাগধের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিল এবং তাহারা মৎস্যাদি ধরা ও বিক্রয়ে পারদর্শী হইলেন।

অন্ত্যজ বা অধম সঙ্কর পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ

এই অন্ত্যজরা একেবারেই নিম্নপর্যায়ের এবং অস্পৃশ্য। তাহাদেরকে বর্ণ ধর্ম এবং আশ্রম ধর্মেরও বহিষ্কৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ও ইহাদের কাহারও বৃত্তির উল্লেখ নাই। ইহারা হইল, যথাক্রমে :

১. গৃহী : স্বর্ণকারের ঔরসে বৈদ্যপত্নীর গর্ভে গৃহী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

২ কুড়ব : সুবর্ণ বণিকের ঔরসে বৈদ্যপত্নীর গর্ভজাত হইল কুড়ব জাতি।

৩. চণ্ডাল : শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

৪. বরুড় জাতি : বরুড় জাতি আভীরের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

৫. চর্মকার : তক্ষণ জাতির ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান চর্মকার জাতি।

৬. ঘট্টজীবী : করণ জাতির ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে ঘট্টজীবী সম্প্রদায়।

৭. দোলাবাহী : বৈশ্যার গর্ভে তৈলকার জাতির ঔরসে দোলাবাহীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

৮. মণ্ডজাতি : ধীবরের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মণ্ড জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

ম্লেচ্ছ

উপযুক্ত জাতিগুলি ব্যতীত কয়েকটি দেশী-বিদেশী জাতির নাম বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লেখ হইয়াছে। ইহারা সকলেই ম্লেচ্ছ হিসাবে পরিচিত। ইহারা যথাক্রমে : পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, যবন, সুহ্ম, কাম্বোজ, শবর ও খর।[১০৭]

অপর দিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র নামীয় দুইটি (শূদ্র) বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সমস্ত মিশ্রবর্ণ এবং অন্ত্যজ পর্যায়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহারা যথাক্রমে :

সৎশূদ্র

১. করণ : শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে করণ জাতির উদ্ভব।

২ অম্বষ্ঠ : ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রানারীর গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি।

৩. বৈদ্য : ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসজাত বৈদ্যজাতি চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে।

৪ গোপ।

৫. নাপিত।

৬. ভিল্ল।

৭. মোদক।

৮. কুবের।

৯. তাম্বুলী।

১০ স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক শ্রেণী।

১১. মালাকার : মালাকার হইতে স্বর্ণকার পর্যন্ত সকলেই শূদ্রার গর্ভের ও বিশ্বকর্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন।

১২ কর্মকার।

১৩. শঙ্খকার।

১৪. কুবিন্দক।

১৫. কুম্ভকার।

১৬ কংসকার।

১৭. সূত্রধর।

১৮. চিত্রকর।

১৯. স্বর্ণকার।

উপরোক্ত কর্মকার, মালাকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কংসকার ইহারা শিল্পকর্মে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং শেষোক্ত সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার ব্রাহ্মণের অভিশাপে পতিত হইলেন অর্থাৎ তাহাদের সংসর্গে অবস্থান করিলে তিনিও পতিত হইতেন।[১০৮] উল্লেখ্য যে, বল্লালচরিতে সুবর্ণ বণিক জাতির দাম্ভিকতার জন্য বল্লালসেন কর্তৃক তাহাদের অধঃপতিত হইবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[১০৯]

অসৎশূদ্র

১. অট্টালিকাকার : বারবিলাসিনী শূদ্রার গর্ভে চিত্রকরের ঔরসে উৎপন্ন অট্টালিকাকার জাতি।

২. কোটক : অট্টালিকাকারের ঔরসে কুম্ভকার রমণীর গর্ভে কোটক জাতি গৃহনির্মাণ কার্যাদিতে পারদর্শী হইয়াছে।

৩. তৈলকার : কুম্ভকারের ঔরসে কোটক কন্যার গর্ভে তৈলকার জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কুটিল স্বভাব বিশিষ্ট।

৪. তীবর : ক্ষত্রিয় পিতা রাজপুত্র মাতার সন্তান তীবর। ইহাদের কর্ম সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত প্রদান করা হয় নাই।

৫. লেট : তীবরের ঔরসে তৈলকার পত্নীর গর্ভজাত সন্তান লেট জাতির দস্যুবৃত্তিই জীবিকা হইয়াছে। তাই দস্যু নামে তাহারা পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

৬. মল্ল :

৭. মাতব :

৮. ভড় : ইহারা সকলেই মল্লজাতির অনুরূপভাবে সৃষ্টি হইয়াছে।

৯. কোলিন্দ :

১০. কোড় :

১১. চর্মকার : চণ্ডালিনী মাতার তীবর পিতার ঔরসজাত সন্তান চর্মকার।

১২ মাংসচ্ছেদ : চর্মকার রমণীর গর্ভে এবং চণ্ডাল পিতা হইতে মাংসচ্ছেদ জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

১৩. গঙ্গাপুত্র : গঙ্গাতীরে লেটজাতির ঔরসে তীবর কন্যার গর্ভে গঙ্গাপুত্র নামক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

১৪. যুঙ্গী : গঙ্গাপুত্র কন্যার গর্ভে বেশাধারী পিতার ঔরসে যুঙ্গী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

১৫. শুঁড়ি : বৈশ্য তীবর কন্যায় উপগত হইলে শুঁড় জাতির উৎপত্তি হয়।

১৬. পৌণ্ডক : শুঁড়ি কন্যায় বৈশ্যের ঔরসে পৌণ্ডিক জাতির উদ্ভব।[১১০] বর্তমানে পৌণ্ডকরাই পোদ বলিয়া নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করিয়াছেন।[১১১]

১৭. আগুরী : করণ পিতার রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে আগুরী জাতির জন্ম হইয়াছে।

১৮. কৈবর্ত : বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রবীর্য্য হইতে যে জাতি উৎপন্ন হয় ইহা কৈবর্ত জাতি। তীবর সংসর্গে পতিত হইয়া কৈবর্তরা বর্তমানে ধীবর নামে পরিচিত হইয়াছে।

১৯. রজক : তীবর পত্নীর গর্ভে ধীবর ঔরসে যে জাতির জন্ম হয় তাহারা রজক নামে খ্যাত।

২০. কৌয়ালী : রজক স্ত্রীর গর্ভে তীবরের ঔরসে কৌয়ালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

২১. সর্ব্বস্বী : নাপিতের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে সর্ব্বস্বী জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অসৎশূদ্রের পরেও আরও অনেকগুলি জাতির উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে তাহারা একেবারে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

১. ব্যাধ : সর্ব্বস্বী কন্যার ও ক্ষত্রিয় হইতে পশুশিকারী ব্যাধ জাতির উৎপন্ন হইয়াছে।

২. কূদর : ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষি বীর্য্য হইতে কুৎসিত কূদর জাতির উৎপন্ন হয়।

৩. বাগতীত : ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বাগতীত জাতির উদ্ভব হয়।

৪. ম্লেচ্ছ : ক্ষত্রিয় বীর্য্য এবং শূদ্রাণীর গর্ভে ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

৫. জোলা : ম্লেচ্ছ হইতে কুবিন্দ রমণীর গর্ভে জোলা জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

৬. শরাক : জোলার ঔরসে কুবিন্দ কন্যার গর্ভে শরাক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

৭. ব্যালগ্রাহী : বৈদ্যর ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে উৎপন্ন ব্যালগ্রাহীরা সাপুড়ে নামে বিখ্যাত।

৮. কোচ : মাংসচ্ছেদ রমণীর তীবরের ঔরসে কোচ নামক জাতির উৎপন্ন হয়।

৯. কর্ত্তার : কোচ স্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্ত হইতে কর্ত্তার (কাওরা) নামে জাতিব উৎপন্ন হয়।

১০. হড্ডি : লেট জাতির ঔরসে চণ্ডাল কন্যার গর্ভে হড্ডি বা হাড়ি জাতির উৎপন্ন হয়।

১১. ডোম : চণ্ডাল কন্যার গর্ভে লেট জাতির ঔরসে ডোম জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

১২. চণ্ডাল : ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রার ঔরসে সকল জাতির অধম চণ্ডালদের উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইহাছাড়া আরও অনেক জাতি ছিল ইহাতে বর্ণসঙ্কর দোষে সেই সমস্ত জাতির উৎপত্তি বলা হইয়াছে।[১১১]

উপরে বর্ণিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রায়ই একইভাবে শূদ্র পর্যায়ভুক্ত বর্ণ উপবর্ণগুলির বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তম সঙ্কর ও মধ্যম সঙ্কর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যথাক্রমে সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র হিসাবে গণ্য করা যায়। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মিশ্রবর্ণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উল্লেখিত তালিকার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুদর, তাম্বুলী, স্বর্ণকার ও বণিক ইত্যাদি সৎশূদ্র বলিয়া অভিহিত, ইহাদের পর করণ ও অম্বষ্ঠ জাতির বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। তৎপর মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার ও কংসকার জাতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সূত্রধর ও চিত্রকর জাতি পতিত হইয়া নিম্ন পর্যায়ে যাওয়ার কথা আছে। ইহার পর পতিত অসৎশূদ্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে অট্টালিকাকার, কোটক, তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি, মাংসচ্ছেদ, রাজপুত্র, কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর), রজক, কোয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গী প্রভৃতি। অপরদিকে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত মাগধ, গন্ধবণিক, তৈলিক, দাস, বারজীবী ও সূত্রধর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। ইহাদের পরিবর্তে ভিল্ল, কুড়ব ও বৈদ্যদের উল্লেখ হইয়াছে। তাহাছাড়া বৃহদধর্ম্মের উত্তম সঙ্কর বর্ণের রাজপুত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অসৎশূদ্র পর্যায়ে উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং বৃহদধর্ম্মপুরাণে বর্ণিত প্রায় সকল উত্তম সঙ্কর জাতিই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সৎশূদ্র হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবার বৃহদধর্ম্মপুরাণে আভীর, নট, শরাক, শেখর ও জালিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে এবং ইহাদের

পরিবর্তে অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চমকার, শৌণ্ডক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গী, আগরী এবং কৌয়ালী স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মল্ল ও চর্মকার বৃহদধর্ম্মপুরাণে অন্ত্যজ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাছাড়া এই গ্রন্থে ধীবর ও জালিক জাতিদ্বয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তীবর ও কৈবর্ত হিসাবে অনুমান করা যায়। সুতরাং উভয় গ্রন্থের অধিকাংশ মিশ্রবর্ণগুলির যথেষ্ট মিল রহিয়াছে।[১১৩] অপরদিকে বল্লালচরিতে ছত্রী, রাজপুত্র, গোপ, মালী, তাম্বুলী, কাঁসারী, তন্তুবায়, শঙ্খবণিক, কুম্ভকার, কর্মকার, নাপিত, তৈলী, গন্ধবণিক, বৈদ্য প্রভৃতি সৎশূদ্র হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে উল্লেখিত সৎশূদ্র ও বৃহদধর্ম্মপুরাণে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যথাক্রমে উত্তম সঙ্কর ও সৎশূদ্র হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে আমরা এখানে ছত্রী নামক বর্ণটির নাম প্রথম পাইতেছি।[১১৪]

তাহাছাড়া লিপিমালায়ও অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণেরও উল্লেখ দেখা যায়। এই সম্পর্কে শ্রীচন্দ্রের সিলেট তাম্রলিপি প্রথম উল্লেখ করিবার যোগ্য। ইহাতে করণ, কায়স্থ, মালাকার, তৈলিক, কুম্ভকার, শঙ্খবাদক, ডক্কাবাদক, কর্মকার, চর্মকার, নট, সূত্রধর, স্থপতি, নাপিত, এবং রজকের উল্লেখ আছে।[১১৫] তারপর উল্লেখযোগ্য হইল গোবিন্দ কেশব দেবের তাম্রলিপি। ইহাতে গোপ, নাপিত, রজক, নানাসাকার[১১৬] এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে শিল্পগোষ্ঠীর[১১৭] উল্লেখ রহিয়াছে।

অন্ত্যজ পর্যায়ে বৃহদধর্ম্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কয়েকটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদধর্ম্মপুরাণে যথাক্রমে গৃহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বড়ুর, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, মণ্ডজাতি। ইহারা বর্ণশ্রম বহিষ্কৃত ও অন্ত্যজ বলিয়া কথিত হইয়াছে।[১১৮] অপর পুরাণ গ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্যাধ, কুদর, বাগতীত, ম্লেচ্ছ, জোলা, শরাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল, কোচ, কর্ত্তার, হড্ডি, ডম প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতি।[১১৯] তাহাছাড়া ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্য প্রকরণম গ্রন্থে অন্ত্যজ পর্যায়ে কতকগুলি বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। যথা : রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত এবং ভিল্ল।[১২০] তিনি আরও কয়েকটি বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা : নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, চণ্ডাল, পুক্কস ও কাপালিক প্রভৃতি নিম্নতম উপবর্ণ ও ইহাদেরকে পতিত হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে।[১২১] কিন্তু বৃহদধর্ম্মপুরাণে দেখা যায় যে, রজক, তক্ষণ, সুবর্ণবণিক (সুবর্ণকার), শৌণ্ডিক মধ্যম সঙ্কর[১২২] এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সৎশূদ্র হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১২৩] সুতরাং উপর্যুক্ত বিভিন্ন জাতির উল্লেখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই রকম এবং সম্ভবত স্থান ও কাল অনুসারে কিছু কিছু জাতির উন্নতি অবনতি হইয়াছে।

চর্যাপদেও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের উল্লেখ হইয়াছে। বিভিন্ন চর্যায় ডোম, চণ্ডাল ও শবরদের জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডোমরা জনবসতি হইতে দূরে বসবাস করিত এবং অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত। এই ডোমরা নৌকায় যাতায়াত করিত ও বিভিন্ন স্থানে বাঁশের তাঁত, চুপড়ি, চাঙ্গারি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এই ধরনের একটি গীতে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে :

হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ॥

তান্তি বিকনঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া॥

ওলো ডোম্বী, তোকে পুছি সদভাবে। আসিস যাস্ ডোম্বী, কার নায়ে॥ তন্ত্রী বিক্রয় করিস ডোম্বী, বর্ণহীন চাঙ্গাড়ি। তোর জন্যে ছেড়েছি নটপেটিকা॥[১২৪]

এই ডোম মেয়েদের সাধারণত স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না এবং তাহারা নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইত।[১২৫] পাহাড়ের উপর বসবাসকারী শবরদের প্রধান জীবিকা ছিল পশু শিকার করা[১২৬] এবং চণ্ডালরাও ছিল অস্পৃশ্য।[১২৭] তাহাছাড়া চর্যাপদে শুঁড়িপত্নী শুণ্ডিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সম্ভবত ইহারা নিম্নস্তরের অন্ত্যজ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১২৮]

নৈহাটি তাম্রলিপিতে পুলিন্দ নামক আদিম জাতির উল্লেখ আছে। তাহারা বনে বাস করিত এবং তাহাদের মেয়েরা গুঞ্জাফুলের মালা পরিত।[১২৯] পাহাড়পুরে প্রাপ্ত কয়েকটি মূর্তিতেও এই শবর-শবরীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। একজন স্ত্রীলোককে একটি মৃতপশু হস্তে ঝুলাইয়া অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার দৃশ্য দেখা যায়।[১৩০] সম্ভবত তাহাদের খাদ্য হিসাবে এই পশুটি শিকার করিয়াছে। তাহাছাড়া অপর একটি মূর্তিতে শবরেরা তীরধনুক ব্যবহার করিত ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৩১] তৎকালীন সাহিত্যেও এই নিম্নশ্রেণীর উল্লেখ বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলন গ্রন্থে কবি উমাপতিধর সাপুড়েদের জীবনযাত্রার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩২] অন্যত্র উমাপতিধর ব্যাধের পশু শিকারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।[১৩৩] তাহাছাড়া গদাধর বৈদ্য ব্যাধদের জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন :

অস্তো ভজস্ব চিরমস্য যথাভিলাষ
মেতন্ন তাণ্ডবয় সৈরিভ কাননংচ।
দুশ্চেষ্টিতেন যদনেন ভৃশং এবৈষ
ধবস্তাশয়ো ভবতি নিষ্কলষস্তড়াগ॥

হে ব্যাধ (আমি) কৃতাঞ্জলী হইয়াছে ; পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবিকা নাই কি? তুমি পশু পক্ষীগণকে হত্যা করিয়া এই অরণ্যকে কেন বাকশূন্য করিতেছ?[১৩৪]

এই বনচারী ব্যাধের সম্পর্কে আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বনচারী ব্যাধের নিকট কোষকার বা গুটিপোকার (রেশম) গুণ প্রকাশ অহেতুক মূর্খতা, কারণ ব্যাধ তাহাকে হত্যাই করিবে :

ওহে কোষকার, বনেচর ব্যাধের
সম্মুখে তুমি যে গুণ প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে
তাহারা পেট চিরিয়া তোমার গুণ বিচার
করিবে।[১৩৫]

তাহাছাড়া আর্যাসপ্তশতীতে ব্যাধদের দৃষ্টিজাল বিস্তার করিয়া পশুশিকারের দৃষ্টান্তও উল্লেখিত হইয়াছে। চতুর নায়কের প্রতি নায়িকার মুগ্ধতার জন্য বয়স্যের সাবধানবাণী হিসাবে :

হে কুরঙ্গ, তুমি ছদ্ম বিনোদচঞ্চল নয়নাকে
বিশ্বাস করিতেছ কেন? তোমার সরলতার
সুযোগে ব্যাধ বধূ তোমাকে পুচ্ছে
ধরিয়া নিগৃহীত করিবে।[১৩৬]

ব্যাধেরা ইন্দ্রজাল সৃষ্টিপূর্বক যেমন পশুদের নিগৃহীত করে তেমনি চণ্ডালদেরও দৃষ্টিজাল বিস্তারের মাধ্যমে মোহিত করার বিষয় গীতগোবিন্দে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

মুগ্ধে মবিধেহী ময়ী নির্দ্দয়-দন্তদংশ-
দোর্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনপীড় নানি
চণ্ডি ত্বমের মুদমঞ্চন পঞ্চবাণ--
চাণ্ডাল কাণ্ড দলনাদসরঃ প্রয়াস্তু।।

হে মুগ্ধে! তুমি নির্দয়ভাবে দশন-দংশনে, ভুজলতার বন্ধনে এবং নিবিড় স্তনভার পীড়নে আমার দণ্ড বিধানপূবক সুখানুভব কর। কিন্তু হে চণ্ডি! চণ্ডাল মদনের বাণে যেন আমার প্রাণ না যায়।।[১৩৭]

সুতরাং সমকালীন সাহিত্য ও লিপিমালায় এইসব নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর উল্লেখ উচ্চবর্ণীয় সমাজের তাহাদের প্রতি একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচায়ক। অন্যদিকে তাহাদের অস্তিত্ব সমাজে স্বীকৃত ছিল। যদিও তাহারা ছিল বর্ণাশ্রম বহির্ভূত এবং রাষ্ট্রীয় দৃষ্টির বাহিরে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[১৩৮]

এখন ব্রাহ্মণদের সহিত অন্যান্য বর্ণ ও উপবর্ণের সম্পর্ক কি ধরনের ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে।

তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষত ব্রাহ্মণদের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর অন্নগ্রহণ ও পরিণয় সম্পর্কগত বিষয়ে বিধিনিষেধ ছিল। এই সম্পর্কে ভবদেবের মতবাদ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, চণ্ডাল ও অন্ত্যজ জাতির পাত্রে রক্ষিত জল পান করিলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত্য করিতে হইবে।[১৩৯] অন্যত্র আবার তিনি বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা অল্প হইত। এই অন্ত্যজরা সাতটি নিম্নশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা : রজক, চর্মকার, নট, বরুই, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল।[১৪০] ইহা হইতে অনুমিত হয় যে সেনযুগে উপর্যুক্ত অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় নট বা নর্তকীরাও সমাজে খুব বেশি সম্মানিত ছিলেন না। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও ইহাদেরকে মধ্যম সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মালাকারের ঔরসে শূদ্র পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৪১] কিন্তু সমকালীন অন্যান্য তথ্যে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। জয়দেবপত্নী বিবাহপূর্ব জীবনে একজন নটী ছিলেন এবং স্বয়ং জয়দেবও সঙ্গীতে খুবই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন।[১৪২]

তাহাছাড়া সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে গঙ্গোক নামক একজন নটের কাব্য স্থান পাইয়াছে।[১৪৩] ইহা হইতে এই অনুমান করা হয়ত অযৌক্তিক নয় যে, নিজ গুণে নট প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিও সমাজে সমাদৃত হইতেন।

অন্নাদি গ্রহণ বিষয়েও ভট্টভবদেব প্রাচীন শাস্ত্রকারদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালস্পৃষ্ট এবং অন্ত্যজ জাতির পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এখানে অন্ত্যজ হিসাবে ধরা হইয়াছে চণ্ডাল, পুককস, কাপালিক এবং নিম্নশ্রেণী যথা : নট, নর্তক, চর্মকার, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, রজক, কৈবর্ত ইত্যাদি শ্রেণীকে।[১৪৪] তাহাছাড়া আপস্তম্বের একটি শ্লোকে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন গ্রহণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভট্টভবদেব বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বৈশ্যান্ন গ্রহণে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম এবং ক্ষত্রিয় অন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক, ক্ষত্রিয় শূদ্রান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম এবং বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক ও বৈশ্য শূদ্রান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক করিতে হইবে।[১৪৫] তাহাছাড়া হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজন মহাপাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪৬] অবশ্য অন্যত্র তিনি পরাশরের উদ্ধৃতি দিয়া বলিতেছেন যে অত্যন্ত ক্ষুধা বা দুর্ভিক্ষের কারণে ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহে ভক্ষণ করিলে অনুতাপের মাধ্যমে শুদ্ধ হইবে বা "দ্রপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।[১৪৭] আবার ভবদেব ভট্ট বলিতেছেন, শূদ্র হস্তে তেল পক্ক খাদ্য, পায়েস কিংবা শূদ্র পক্ক অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণেরা মনস্তাপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।[১৪৮] চর্যাগীতিতেও ইহার উল্লেখ হইয়াছে এবং ডোম-ডোম্বীদেরকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যতার কথা বলা হইয়াছে।[১৪৯]

বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। স্ববর্ণে বিবাহ সাধারণ বা প্রচলিত নিয়ম হইলেও উচ্চবর্ণের পুরুষদের সহিত নিম্নবর্ণের কন্যাদের বিবাহ হইত। এই সম্পর্কে জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগ গ্রন্থে অনুলোম পরিণীত স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের ধনসম্পদ বিভাগের বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।[১৫০] তিনি আবার মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া স্ববর্ণা স্ত্রী এবং অনুলোম স্ত্রী গ্রহণের বিষয়েও বলিয়াছেন। ইহাতে দ্বিজগণ স্ববর্ণে স্ত্রীগ্রহণ করিয়া পুনঃবিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে বর্ণাক্রমে স্ত্রীগ্রহণ করিবে। তবে শূদ্র কেবল শূদ্রাকে, বৈশ্য বৈশ্যা বা শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে এবং ব্রাহ্মণ চারিবর্ণ হইতেই কন্যাগ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, পুরুষ বর্ণাক্রমে স্ত্রীগ্রহণ করিলেও কোন নারী কখনই নীচ জাতি হইতে পতি গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত হইলেও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল।[১৫১]

জীমূতবাহন আরও বলিয়াছেন, স্ববর্ণা স্ত্রীগ্রহণ না করিয়াই শূদ্রানী বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাইবে এবং তাহারা নরকে গমন করিবে।[১৫২] এমতাবস্থায় জীমূতবাহন হারীতের বচন উল্লেখ করিয়া শূদ্রা কন্যা পরিত্যাগ করিবার বিধান দিয়াছেন।[১৫৩] কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি শূদ্রা কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া তাহাতে উপগত হইয়া শূদ্রা কন্যা সন্তান উৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত এবং দোষও অল্প হওয়ার কথা

বলিয়াছেন।[১৫৪] ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, শূদ্রা কন্যাকে বিবাহ করা দোষাবহ হইলেও ব্যাভিচারে বেশি দোষ ছিল না। জীমূতবাহন ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।[১৫৫] তাহাছাড়া হলায়ুধও তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থে ইহার আভাস দিয়াছেন। তিনি অত্রির বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যায় গমন করিলে অন্তর্জলে তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন এবং বৃদ্ধাপস্তাম্বর বচন উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রা গমন করিলেও অঘমর্ষণ মন্ত্রপাঠপুর্বক জলপান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। তিনি আবার বৃদ্ধাপস্তাম্বর উক্তি উল্লেখ করিয়া (বিপ্র) ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অথবা তপস্যারত নারীর সহিত ব্রাহ্মণেরা যৌনসঙ্গম করিলে অঘমর্ষণ মন্ত্র তিনবার আবৃত্তির মাধ্যমে কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা বলিয়াছেন।[১৫৬] প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম গ্রন্থে ভট্টভবদেব ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন।[১৫৭] ভট্টভবদেব তাহার শবসূতকাশৌচ প্রকরণমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীর পুত্রদের মৃত্যুতে বিভিন্ন রীতিনীতি পালনের কথা বলিয়াছেন।[১৫৮] কিন্তু তিনি অন্যত্র নিন্দিত বিবাহের তালিকায় ব্রাহ্মণ জাতির শূদ্রা কন্যা গ্রহণ বাদ রাখিয়াছেন।[১৫৯]

জীমূতবাহন আবার বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র কন্যা বিবাহ করিলে উক্ত শূদ্রাণী কখনও সহধর্মিণীর মর্যাদা পাইবে না। এইজন্য তিনি নারদের বচন উদ্ধৃতি করিয়া সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছেন।[১৬০] ইহা হইতে ধারণা সম্ভব যে, ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্যা বিবাহে অনুৎসাহিত করা হইয়াছে। এইজন্য পঞ্চদশ–ষোড়শ শতকের শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি (দায়ভাগ টীকা প্রণেতা) সকলকেই স্ববর্ণে স্ত্রীগ্রহণ এবং অসবর্ণা কন্যা গ্রহণ প্রশস্ত নয় বলিয়া অভিমত পোষণ করিয়াছেন।[১৬১] চর্যাপদেও উচ্চশ্রেণীর পুরুষ কর্তৃক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী (ডোম্বী) বিবাহের কথা জানা যায়।[১৬২] তাহাছাড়া একাদশ শতাব্দীর বাঙালি সন্ন্যাসী অভয়কর গুপ্ত তিব্বতে অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছিলেন এবং তিনি ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার পুত্র ছিলেন।[১৬৩]

আবার ভট্টভবদেব তাঁহার সম্বন্ধবিবেক গ্রন্থে অসমর্থিত অসপিণ্ড ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহের কথা বলিয়াছেন।[১৬৪] তাহাছাড়া তিনি বর ও কন্যা সপ্রবর হইলে বিবাহ হইবে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬৫] আবার আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে তিন পুরুষ অথবা পিতার দিক হইতে তিন পুরুষ অথবা পিতার দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের বাহিরে হইলে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু বর ও কনের এইরূপ বিবাহে উভয়েই সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইত।[১৬৬] এইরূপ ক্ষেত্রে কন্যার পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, মাতা ও অন্যরা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হইতেন।[১৬৭] ভট্টভবদেব এই ধরনের পতিত হইবার বা হেয় প্রতিপন্ন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হিসাবে আবার বলিতেছেন যে, এমতাবস্থায় বিবাহযোগ্যা কন্যা বিবাহের জন্য তাহাদের অভিভাবকদের উপর তিন বৎসর নিভর করিবে। অতঃপর সে স্ববর্ণে পছন্দ মতো পতিগ্রহণে সক্ষম হইতে পারিবে। তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর পূর্বে কনিষ্ঠ ভগ্নীর বিবাহ হইবে না।[১৬৮] অনুরূপভাবে জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত হইলে কনিষ্ঠের বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল। এইরূপ বিবাহে উক্ত সহোদরদ্বয় এবং কন্যা, কন্যাদাতা ও পুরোহিত পতিত হইবেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিলেও দোষমুক্ত হইবে না। অবশ্য জ্যেষ্ঠ সহোদর চিরবিদেশস্থ, নপুংসক, বেশ্যাসক্ত,

পতিত, ব্যাধিগ্রস্ত, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, অতিবৃদ্ধ, বিবাহে অসম্মত, অন্যের দত্তক পুত্র, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরা বিকলাঙ্গী, চিররুগ্না ও ব্যাধিগ্রস্তা হইলে তাহাদের অনুমতি না লইয়াও কনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠা বিবাহ করিতে পারিবে।[১৬৯] তবে জ্যেষ্ঠ সহোদর বিদ্যার্জন, ধর্মকর্ম বা ধন উপার্জনের জন্য বিদেশে থাকিলে ব্রাহ্মণ ১২ বৎসর এবং শূদ্র ৬ বৎসর অপেক্ষাপূর্বক বিবাহ করিবে। যমজ সন্তানের মধ্যে যে অগ্রে ভূমিষ্ঠ হইবে সেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য সহোদর বা সহোদরাদিগের একদিনে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ প্রথমে হইলে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ সামাজিক উপহাসের বস্তুতে পরিণত হইত এবং তাহার বিবাহে ব্যাঘাত ঘটিত।[১৭০] অপরদিকে বল্লালচরিতে ব্রহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া ইহাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অন্য বর্ণে বিবাহে অনুৎসাহিত করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে সঙ্গত হইয়া সন্তান উৎপাদনের কথা বলা হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীর পাণিগ্রহণ করিলে পতিত হইবে।[১৭১]

সুতরাং এইসব বর্ণগত বাধানিষেধ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই সময় ব্রাহ্মণেরা শূদ্রশ্রেণীর মানুষ হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা গণ্ডিবদ্ধ সমাজে নিজেদেরকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, তাহারা নিজেরাও বিভিন্ন ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরদিকে আবার বৃহৎশূদ্র সম্প্রদায়ও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধিয়া ছিল।[১৭২] অবশ্য তাহাদের এই বিভক্তি ব্রাহ্মণদেরই সৃষ্টি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদের কল্যাণের জন্য তাহারা নিয়োজিত থাকিত।

খ. শ্রেণীবিন্যাস

প্রাচীন বাংলার সেনযুগীয় সমাজ বর্ণে বর্ণে বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। তখন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যই ধনোৎপাদনের বাহন ছিল। কিন্তু সমাজে সকল মানুষের সম-অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কারণ তখন রাষ্ট্রই ছিল সকল ক্ষমতার অধিকারী ও সকল কিছুতেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় ছিল। তবু কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর তৎকালীন সমাজে তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। উৎপাদন ও বণ্টনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যেকটি শ্রেণী আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছিল।[১৭৩] ইহা হইতে এইরূপ ধারণা করা সম্ভব যে, সমাজ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া গিঁয়াছিল যথা—১. বিত্তবান সমাজ, ২. বিত্তহীন সমাজ। অর্থাৎ সকল অধিকার সম্বলিত সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং অল্প অধিকার প্রাপ্ত শ্রেণী বা সমস্ত অধিকার বঞ্চিত অধিকারহীন শ্রেণী।

এইভাবে সমাজে পরশ্রমভোজী ও কায়িকশ্রমকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পশ্চাতেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণ নিহিত ছিল। কারণ ধন উৎপাদন ও বন্টন ছাড়া সামাজিক কর্তব্য পালন ছিল অপরিহার্য। এই কর্তব্যসমূহ সমাজনায়ক, জ্ঞানী ও গুণীদের

দ্বারাই সম্ভব ছিল। ইহা হইতে সামাজিক বর্ণ ও শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে এবং একটি অন্যটির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। তৎকালীন অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভবও বর্ণভিত্তিক শ্রেণীর উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছিল। এই সময় প্রত্যেকটি বর্ণের এক একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। একেবারে উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। ইহার ফলে সকলে সম-অধিকার বা সমভাবে ধনভোগ করিবার অধিকারী ছিল না। বস্তুত তখন উচ্চশ্রেণীব ব্রাহ্মণগণ সমাজকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে গঠন করিয়াছিলেন এবং নিম্নশ্রেণীর উপর এই শ্রেণীবিভাগ চাপাইয়া দিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহাদের উপর এই ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইল তাহারা কি কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই? হয়ত বা করিয়াছিল। তাই তৎকালীন সাহিত্যের মাধ্যমে ইহার ক্ষীণ আভাস বর্তমান কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। চর্যাপদে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজের সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য ইহার প্রতিধ্বনি খুবই অস্পষ্ট।[১৭৪] সামাজিক অনুশাসনের চাপে ও পীড়নে সম্ভবত তাহাদের সেই প্রতিবাদ মিলাইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, সেনযুগীয় বাংলার শ্রেণীবিন্যাসের আলোচনার উপকরণ হইল সমকালীন লিপিমালা এবং সমসাময়িক সাহিত্য বিশেষত চর্যাগীত, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ। এই সকল উৎস উপকরণে শ্রেণীর উল্লেখ আমরা বর্ণবিন্যাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সেন আমলের পূর্ববর্তী পাল আমলেও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব ও আধিপত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। সমকালীন লিপি সাক্ষ্যে জানা যায় যে, পালবংশের রাজত্বকালে দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র ও গুরব মিশ্র পযায়ক্রমে মহামন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদবিদ ব্রাহ্মণ এবং যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ও রাজনীতি কুশল ছিলেন।[১৭৫] এই যুগের অপর ব্রাহ্মণ বংশ যোগদেব, পুত্র বোধিদেব ও পৌত্র বৈদ্যদেব যথাক্রমে বিগ্রহপাল, রামপাল ও কুমাবপালের মহামন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইহারাও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে জ্ঞানী এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।[১৭৬] ব্রাহ্মণ ভট্টগুরব রাজা নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপির দূতক ছিলেন[১৭৭] এবং ভট্টশ্রীবামন রাজা প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির দূতক ছিলেন।[১৭৮] তাহারা সকলেই নিঃসন্দেহে রাজপুরুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাষ্ট্রগ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা আনয়নে সক্ষম হন। এই ভাবধারা ক্রমান্বয়ে সেনামলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় ভট্টভবদেব ও হলায়ুধের বংশ সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে সেন ও বর্মণবংশীয় রাজাদের মহামন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া অনিরুদ্ধ ভট্টের মত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সমস্ত অগণিত ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রের মর্যাদাসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীভুক্ত নাগরিক ছিলেন। সেন নৃপতিগণ যে অধিকাংশ ভূমি অনুদান হিসাবে দিয়াছিলেন, সেই ভূমি অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ব্রাহ্মণগণ। ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের বিষয় সেন আমলের প্রতিটি লিপিতে উল্লেখ আছে।[১৭৯] সেনরাজা বিজয়সেন ব্রাহ্মণদের এতই সহায়-সম্পদের অধিকারী কবেন যে, তাঁহারা অতি সহজেই বিত্তশালী শ্রেণীতে উন্নীত হন।[১৮০] অন্যদিকে তৎকালীন ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে

ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদান করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে।[১৮১] এই সম্পর্কে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, ভূমিদান করা সকলের পক্ষেই অতিদান। কারণ ভূমি অক্ষয়া ও অচলা, ভূমি সর্বকামপ্রদায়িনী, ভূমিদাতা স্বর্গে গিয়া অনন্তকাল সেখানে ক্রীড়া করিবে। ধনী-দরিদ্র সকলেই ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণ দানের পাত্র, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দানের পাত্র আর নাই। ইহার ফলে ভূমিদাতা ও ভূমিগ্রহীতা উভয়েই স্বর্গে গমন করিবেন ইত্যাদি।[১৮২] সুতরাং ভূমি যে ব্রাহ্মণেরা অনুদান হিসাবে পাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। অবশ্য এই রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সকলেই বিত্তবান স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তবে তাঁহারাই যে রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত শ্রেণী ছিলেন তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাষ্ট্রের আনুকূল্যে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

এই যুগটি ছিল সামন্ততন্ত্রের অপ্রতিহত যুগ। এই সামন্তদের মধ্যে কতকগুলি স্তর ছিল। ইহাদের মধ্যে রাণক, রাজনক, সামন্ত, মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিকগণ ছিলেন সামন্ত প্রভু এবং সামন্ত সিঁড়ি ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছিল। সমাজের নিম্ন সারির সর্বনিম্ন ধাপ ছিল ভূমিহীন চাষী, ভাগচাষী, কুটুম্ব বা ভূমিবান প্রজা, মহত্তর ছিলেন ক্ষুদ্র স্তরের ভূম্যধিকারী এবং মহামহত্তর, সামন্তমাণ্ডলিক, মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক প্রভৃতি সামন্ত বৃহৎ ভূস্বামী ছিলেন। আবার এই স্তরভিত্তিক সমাজে মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক, সামন্ত মাণ্ডলিক শ্রেণী প্রধানত রাজানুকূল্য প্রাপ্ত হইলেও মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতি রাজসেবক ছিলেন।[১৮৩]

১. রাজানুকূল্য প্রাপ্ত শ্রেণী : সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংস্কার ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরাই অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ তাঁহারাই অধিকার করেন। বস্তুত ব্রাহ্মণদের এই প্রভাব পাল আমল হইতে শুরু হইয়াছিল। সেন শাসনামলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ হইতে শুরু করিয়া সর্বত্র তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মহারাজের অধীন রাজা, রাজনক, রাজন্যক, সামন্ত, মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক হইতে গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়াপতি প্রভৃতি কর্মচারী ছিলেন।[১৮৪] ইহারা প্রধানত: যথাক্রমে রাজপাদোপজীবীশ্রেণী এবং রাজসেবক বা সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তবে রাজানুকূল্য প্রাপ্ত শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকেই রাজসরকারে চাকুরি করিতেন কিনা জানা যায় না। তবে তাঁহারা রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়া একত্রিত হইতেন এবং রাজকার্যে রাজাকে সাহায্য করিতেন। ইহাছাড়া গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়াপতি, করণ প্রভৃতি রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাছাড়াও চাটভাট প্রভৃতি নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীদের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং রাজপাদোপজীবীশ্রেণী ও রাজসেবক শ্রেণী প্রায়ই একসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে। অবশ্য এই দুই শ্রেণীভুক্ত লোকেরা পদমর্যাদা ও বেতনাদির ক্ষেত্রে এক স্তরভুক্ত ছিলেন না। ইঁহারা যথাক্রমে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নস্তরের বিত্ত ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের পদমর্যাদা বিভিন্ন স্তরের হইলেও তাঁহারা রাষ্ট্রের স্বার্থে এবং প্রয়োজনের সহিত নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করিতেন।

এই সকল রাজপাদোপজীবী কর্মচারীবা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় ইহাদেরকে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর স্তরগুলি যথাক্রমে প্রথমত মহামাণ্ডলিক, সামন্ত, মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক, দ্বিতীয়ত উপরিক বা ভুক্তিপতি, বিষয়াপতি, মণ্ডলপতি, অমাত্য, সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক, দৌঃ সাধসাধনিক, দূত, দূতক, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাপতিহার, মহাসেনাপতি, রাজামাত্য, রাজস্থানীয় ইত্যাদি। তৃতীয়ত অগ্রহারিক, আবস্থিক, চৌরোদ্ধরনিক, সেনাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, দশাপরাধিক, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠ কায়স্থা, খোল, কোট্টপাল, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, প্রান্তপাল, ষষ্ঠাধিকৃতি ইত্যাদি। চতুর্থত শৌলিক্ক, গৌল্মিক, গ্রামপতি, হট্টপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক, শান্তকিক, বাসাগরিক, পিলুপাতি ইত্যাদি। পঞ্চমত চাটভাট শ্রেণীভুক্ত রাজসেবক।[১৮৫] সুতরাং সুবৃহৎ আমলাতন্ত্রের বিস্তার তৎকালীন সমাজে যে কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এই সকল রাজকর্মচারী ও রাজসেবক শ্রেণী রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহারা রাষ্ট্রের কল্যাণেই নিয়োজিত থাকিতেন।

২. **ধর্ম ও জ্ঞানজীবী শ্রেণী** : এই সমাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণী ছিল ধর্ম ও জ্ঞানজীবী শ্রেণী। এই সময় ব্রাহ্মণেরা বর্ণ হিসাবে যেমন উচ্চ মযাদার অধিকারী ছিলেন তেমনি শ্রেণী হিসাবেও উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেন। ইহারাই ভূমি ও অর্থ অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া সমাজে নিজেদেরকে সম্মানজনক অবস্থানে লইয়া যান। বিশেষত ভূমিদান লাভ করিয়া তাহারা মন্ত্রী, সেনাপতি, সামন্ত, মহাসামন্ত হইয়াছেন। তবে ইহা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণত তাঁহারা পুরোহিত, ধর্মজ্ঞ, রাজপণ্ডিত, স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতা ছিলেন। এই সম্পর্কে হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ হলায়ুধ ভূপতি লক্ষ্মণসেনের যোগ্য মহাপাত্রের পদপ্রাপ্ত হইযাছিলেন। ইহার ফলে মহারাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহার মনোবাঞ্ছারও অধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়া তাঁহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।[১৮৬] আবার হলায়ুধের অপর একটি শ্লোকে রহিয়াছে :

বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিত পদঃ শ্বেতাং শুচি দ্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহও কপটং দত্তানবে যৌবনে।
বস্যে যৌবনশেষ যোগ্য মখিলক্ষ্মাপাল নারায়ণ
শ্রী মাঁল্লক্ষ্মণ সেনদেব নৃপতি ধর্মাধিকাবং দদৌ॥

বাল্যে যাহার রাজপণ্ডিত পদদান করা হইয়াছিল, নবযৌবনে যাহাকে শুভ্রচন্দ্রের মত উজ্জ্বল স্বেতচ্ছত্রের দ্বারা অলংকৃত মহামহত্তকপদ প্রদান করিয়া যৌবন শেষে সমস্ত ভূপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণতুল্য মহারাজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন তাহার যোগ্য ধর্মাধিকার (পদ) প্রদান করিয়াছিলেন।[১৮৭]

এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ একাধারে মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, রাজপণ্ডিত, স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতা ছিলেন। রাজা ও বিত্তবান শ্রেণী তাঁহাদের পরিপোষণ করিতেন। তাঁহারা ভূমিদান, অর্থদান ইত্যাদি লাভ করিয়া ভূমি ও সম্পদের অধিকারী হইতেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজে প্রথম শ্রেণী

নাগরিকের মর্যাদা লাভ করিতেন। অন্যদিকে আবার একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন দরিদ্র। অবশ্য তাঁহারাও রাজানুকূল্য ও বিত্তবান শ্রেণীর অনুগ্রহে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতেন। এই নির্ধন ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে দেওপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, "রাজা বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কৃপা বর্ষণ করিতেন এবং সেই কৃপায় তাঁহারা এতই বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পত্নীগণ নাগরিক রমণীদের নিকট মুক্তা, মরকত, মণি, রৌপ্য, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাস-বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীচি এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য শিক্ষা লাভ করিতেন।[১৮৮] সুতরাং এইভাবে বলা যায় যে, সমাজে ধর্মচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণগণ। তাঁহাদের কর্মের স্বীকৃতি সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই প্রদান করিত। যদিও এই শ্রেণী ধনী ও দরিদ্রের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তথাপি সামাজিক কাঠামোতে তাঁহাদের স্থান ছিল শীর্ষে।

৩. **মধ্যস্বত্ব শ্রেণী** : কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও জনপদবাসী মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহাদের বৃত্তি ও জীবিকা ছিল যথাক্রমে স্বল্পভূমি, গৃহশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসা। ইঁহারা রাজার নিকট হইতে ভূমি অনুদান হিসাবে পাইতেন এবং উক্ত ভূমি নিজ চাষে না আনিয়া ক্ষেত্রকর ও কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন শর্তে বিলি বন্দোবস্ত করিতেন। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ লিপিতে আবাল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মা কয়েকটি গ্রাম ব্যাপিয়া ৩৩৬$\frac{১}{২}$ উন্মান ভূমি রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন। ইহার বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। তাঁহার অধিকাংশ ভূমিতে চাষ কাজ হইত।[১৮৯] ইহা হইতেই নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, হলায়ুধ শমার পক্ষে এই জমি নিজ চাষে আনা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই নিম্ন প্রজাদের মধ্যে বিলি--বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই নিম্ন প্রজাদের মধ্যে যাহারা ভূমি নিজেরাই চাষাবাদ করিতেন তাহারাই ক্ষেত্রকর বলিয়া পরিচিত হইতেন।[১৯০] সুতরাং মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় রাজা এবং কৃষকদের মধ্যবর্তী একটি পরজীবী শ্রেণী হিসাবে সমাজে নিজের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

৪. **ক্ষেত্রকর শ্রেণী** : কৃষক ও ক্ষেত্রকর শ্রেণী একেবারেই নিম্নতর শ্রেণী। ইহারা জমি নিজ চাষে আনিয়া ফসল উৎপাদন করিতেন। ইহাদের হাতে ধনোৎপাদনের দায়িত্ব থাকিলেও বন্টনের ব্যাপারে তাহাদের কোনো হাত ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই ছিলেন স্বল্প ভূমির মালিক অথবা তাহারা ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষী ছিলেন।[১৯১] ইহাদেরকে লিপিমালায় চাষী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৯২]

৫. **শিল্প, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী** : অপর উল্লেখযোগ্য শ্রেণী ছিল শিল্প, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। দেওপাড়া শিলালিপিতে উল্লেখিত বরেন্দ্রের শিল্পী রাণক শূলপানীর নাম সমাজে শিল্পীশ্রেণীর গুরুত্বের পরিচায়ক।[১৯৩] তাহাছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ[১৯৪] ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে[১৯৫] শিল্পীদের মধ্যে তন্তুবায়, কুবিন্দক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কংশকার, শঙ্খকার, তক্ষণ, সূত্রধর, স্বর্ণকার, চিত্রকর, অট্টালিকাকার, কোটক এবং বণিক শ্রেণীর মধ্যে তৈলিক, মোদক, তাম্বুলী, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, ধীবর, তৈলকারের উল্লেখ রহিয়াছে।

বল্লালচরিতে বণিক জাতি বল্লালসেন কর্তৃক অধঃপতিত করিবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় যে, এই বণিকদের অত্যধিক প্রাধান্য খর্ব করিবার জন্য রাজা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন।[১৯৬] ইহা হইতে ধারণা করা হইয়াছে যে, ধনোৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় তাহাদের আধিপত্য থাকিলে অথবা রাষ্ট্র ও সমাজে তাহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হইলে তাহাদেরকে এইরূপ অবদমিত করা সম্ভব হইত না।[১৯৭] সেকালের ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণীর দুর্দশার কথাও সাহিত্যে মিলিতেছে। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে বণিক সম্প্রদায়ের অবনতি এবং কৃষক ও ক্ষেত্রকর শ্রেণীর বর্ণনা করা হইয়াছে :

> "তে শ্রেষ্ঠীন কক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যেঃ কৃতস্তবোচ্ছয়ঃ
> ঈষাং বা মেঢ়িং বাধূনাত নাস্তাং বিধিৎসন্তি

হে শক্রধ্বজ ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেণী শ্রেষ্ঠীরা কোথায় ! ইদানীংকালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।[১৯৮]

সুতরাং বণিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির উল্লেখ দেখিয়া ধারণা করা সম্ভব যে, তখন বণিক ও ব্যবসায়ী যথা তৎকালীন শ্রেষ্ঠীদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই হয়ত কবির কল্পনায় তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদের প্রতিপত্তির বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।

৬. দাস শ্রেণী : এই শ্রেণীভুক্ত লোকেরা শ্রমিক হিসাবে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করিত। তাহাদের অধিকাংশ ভূমি-বঞ্চিত এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত ছিল। এই শ্রেণী অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ ও আদিবাসী কোমের বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ লইয়া গঠিত ছিল। সেন আমলের পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে গৃহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বড়ুর, চর্মকার, ভট্টজীবী, দোলাবাহী, মণ্ডজাতি ও ম্লেচ্ছদেরকে অন্ত্যজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[১৯৯] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্যাধ, কুদর, বাগতীত, ম্লেচ্ছ, জোলা, শরাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল, কোচ, কর্ত্তার, হড্ডি, ডোম প্রভৃতি জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২০০] ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণমে রজক, চর্মকার, বড়ুর, কৈবর্ত এবং ভিল্ল এই নিম্নশ্রেণীদের উল্লেখ করা হইয়াছে।[২০১] তিনি অন্যত্র আরও কয়েকটি অন্ত্যজ পর্যায়ের শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি যথাক্রমে নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, চণ্ডাল, পুক্কশ ও কাপালিক সম্প্রদায়।[২০২] ইহাছাড়া চর্যাপদে শবর, চণ্ডাল, ডোম্বী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৩]

যাহাই হউক, এই দাস শ্রেণী ছিল সর্ব-অধিকার বঞ্চিত এবং অস্পৃশ্য। তাহারা সমাজের সেবা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিত ; অথচ সমাজে অস্পৃশ্য বলিয়াই গণ্য হইত। অবশ্য এই সমস্ত কোমের লোকেরা বিভিন্ন বৃত্তিধারী ছিল। পশু শিকার, মদ্যপ্রস্তুত, সাপ খেলানো, গৃহ ও নৌকা নির্মাণ, নৌকা চালনা, বাঁশের তাঁত ও ঝুড়ি তৈয়ার, নাচগান ও যাদু প্রদর্শন, মাছ ধরা, পাল্কি বহন প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে তাহারা সমাজকে সেবা প্রদান করিত।

অন্যদিকে আবার শ্রেণীবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেনযুগীয় সমাজ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা : ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দরিদ্র শ্রেণী।

১. ধনিক শ্রেণী : ধনিক শ্রেণীর মধ্যমণি ছিলেন রাজা স্বয়ং। তিনি ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহার সর্বময় ক্ষমতার পশ্চাতে ছিল শাস্ত্রকারদের শাস্ত্রীয় বিধান। ইহার পর মহারাজের অধীন সামন্তরাজা, রাজন্যক, সামন্ত–মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিকদের স্থান—ইহাদের স্ব–স্ব জনপদে মহারাজের অপেক্ষা কম প্রভুত্ব ছিল না। অতঃপর বিষয়পতি, আমত্য, সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাসেনাপতি, বাজামাত্য প্রভৃতি আমলা শ্রেণীর স্থান। ইহারা সকলে ছিলেন রাজকর্মচারী এবং রাজকোষ হইতে তাঁহাদের ব্যয় নির্বাহ করা হইত।[১০৪] তাহাছাড়া ধর্ম ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চায় নিয়োজিতদের ভাগ্যে জুটিত রাজানুকূল্য। কারণ ব্রাহ্মণদের দানধ্যান করা রাজার কর্তব্য ছিল। উল্লেখ্য যে, ইহাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত।[১০৫] যাহাই হউক, এই সকল পর্যায়ভুক্ত লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করিত না। অবশ্য রাজা ও বিত্তবানদের আনুকূল্যে ইহাদের সকলেই প্রচুর সহায়–সম্পদের অধিকারী হইতেন। তাই তাহাদের ধনসম্পদের ঐশ্বর্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের নিকট স্বপ্নের বিষয় ছিল।

২. মধ্যবিত্ত শ্রেণী : ইহাদের পরেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্থান। ইহারা ছিল ক্ষুদ্রস্তরের ভূম্যধিকারী, ভূমিস্বত্ববান কৃষক বা ক্ষেত্রকর, শিল্পী, ব্যবসায়ী করণ–কায়স্থ, অম্বষ্ঠ্য–বৈদ্য–গোপ প্রভৃতি। ইহাদের অব্যবহিত পরেই ছিল আর একটি স্তর। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যম সঙ্কর এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অসৎশূদ্র হিসাবে তাহারা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তক্ষণ, সূত্রধর, চিত্রকর, অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি শিল্পজীবী, রজক, আভীর, নট, কৌয়ালী, মাংসচ্ছেদ প্রভৃতি ভূমিহীন কৃষক এবং তৈলকার, শৌণ্ড্রিক, ধীবর–জালিক ইত্যাদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অন্যতম। এই সকল জাতি প্রধানত বৃত্তিনির্ভর হইলেও কমবেশি তাহারা কৃষিকাজের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমতে আধুনিক কালের ভাগচাষী ও অস্থায়ী প্রজা শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ইহাদেরকে ধরা যাইতে পারে।[১০৬]

৩. নিম্নবিত্ত : সর্বনিম্নবিত্তের অধিকারী ছিল অন্ত্যজ ও আদিবাসী কোমের মানুষ। ইহারা শুধু বর্ণগত দিক দিয়াই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ। চণ্ডাল, ব্যাধ, পুলিন্দ, পুক্কস, শবর, বরুড়, ডোম, জোলা, বাগাতীত প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি সমাজসেবক হিসাবে পরিগণিত হইত। নীহাররঞ্জন রায় তাহাদেরকে বর্তমানকালের দিনমজুর ও ভূমিহীন প্রজা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[১০৭] সমাজের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার তাহাদের কাজ হইলেও তাহাদের জীবন খুবই দৈন্যদুর্দশার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইত। শুধু কি অন্ত্যজ ও আদিবাসী কোমের লোকেরা দুঃখ–দারিদ্র্যের ভিতর জীবন অতিবাহিত করিত? সাধারণত তাহারাই দরিদ্র হইত এবং দৈন্যের শিকার হইত। কিন্তু উচ্চবর্ণের অন্তর্গত কিছু কিছু ব্রাহ্মণ ইহার কবল হইতে মুক্ত ছিল না। এই সম্পর্কে আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে :

ভূতিময়ং কুরুতেহ গ্নিস্তৃণ মপি সংলগ্ন মেনমপি ভজতঃ
সৈব সুবর্ণ দশাতে শনেক গরিমাহ পরাধেন।

অগ্নি সংলগ্ন হইলেও অগ্নি তৃণকে ভস্মে পরিণত করে ; হে সুবর্ণ (ব্রাহ্মণ্য), মনে হয়, অহঙ্কার দোষে অগ্নিকে ভজনা করিয়া তোমারও সেই দশা।[২০৮]

সুতরাং ব্রাহ্মণেরা বর্ণপ্রধান বলিয়া আত্মগরিমায় তাহারা ভীষণ উদ্ধত প্রকৃতির হইত ঠিকই, কিন্তু দারিদ্রও তাহাদেরকে স্পর্শ করিত।

যাহাই হউক, সমসাময়িককালের সাহিত্যে মানুষেব দুঃখ-দারিদ্রের করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুভাষিতরত্নকোষে ইহার করুণ বর্ণনা হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিয়াছে :

দরিদ্র গৃহপতি তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে যেভাবেই হউক
তাহাদের গ্রীষ্মের মাসগুলিতে তাহাদের ও শিশুদেরকে
বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। অতঃপর বর্ষাকাল আসিবে
এবং তখন লাউ ও কদু উৎপাদন করিয়া তাহারা রাজার মত
চলিবে।[২০৯]

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও ইহার আভাস পাওয়া যায় :

নিরানন্দে তাহার দেহ জীর্ণ ও শীর্ণ, পরিধানে ছিন্ন
বস্ত্র। ক্ষুধায় তাহার শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া
গিয়াছে। দীন দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল
ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেছে যেন একমন তণ্ডুল একশত
দিন চলিয়া যায়।[২১০]

আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে দরিদ্র গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া ধনী গৃহিণী আক্ষেপচ্ছলে বলিতেছেন :

হে দুর্গত গৃহিণী, তুমি জীর্ণ কুটীরে শয়ন করিয়াও
চন্দ্রকে বন্দনা করিতে পার। আমরা বস্ত্রাচ্ছাদিত
দোলায় বিহার করি, আমরা চন্দ্র দর্শনে বঞ্চিত।[২১১]

চর্যাপদে উল্লেখিত ধনিক শ্রেণীর প্রাসাদ দরিদ্রের নিকট জ্যোস্না আকাশের মতই ছিল।

গগনে গগনে ত্রিতলবাড়ী হৃদয় কুঠার
কণ্ঠে নৈরাত্ম্য বালিকা, জেগে উৎপাটিত করে॥
ছাড়, ছাড়, মায়া মোহ বিষম দ্বন্দ্বকারী
মহাসুখে বিলাস করে শবর নিয়ে শূন্যনারী
দেখি সে আমার তন্ত্রী... বাড়ী শূন্যের ন্যায় সমতূল্য।
সুন্দর এই সেই রে কাপাস ফুটেছে॥
তৃতীয় বাড়ীর পাশের জ্যোৎস্নাবাড়ী উদিত হল।
অন্ধকার দূর হল রে, আকাশ ফ... ।

প্রতিদিন শবরের কিছুই চেতনা হয় না, মহাসুখে (সে) রইল।
চতুর্থ সেই বাস তৈরী হলরে, চঞ্চালী দিয়ে।
তাতে তুলে শবরকে দাহ করল, কাঁদল শকুন শৃগালী।
মারল ভবমণ্ডাকে রে, দশদিকে দিল বালী।
দেখ সে শবরের নির্বাণ হল, ঘুচে গেল সব দুঃখ॥[২১২]

সুতরাং উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং রাষ্ট্রানুকূল্যে তাঁহারা বিশাল ভূমির মালিকানা প্রাপ্ত হয় এবং ভূম্যধিকারী শ্রেণীর পদে উন্নীত হয়। অবশ্য বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর্যসভ্যতার অনুপ্রবেশ হইতেই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেন আমলের পূর্ববর্তী পাল আমলেই এই প্রভাব যেন দারুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্মীয় পাল রাজগণের লিপিমালায় এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের স্বাক্ষর রহিয়াছে।[২১৩] তাঁহারা বৌদ্ধ নরপতি হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদেরকে ভূমি অনুদানসহ সর্বপ্রকার সহায়তা করিতেন। এই সময় সভাকবি, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পদে হিন্দু ব্রাহ্মণগণই বিশেষভাবে রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। সম্ভবত বৌদ্ধ ধমাবলম্বী পালরাজগণ তৎকালীন বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব প্রতিরোধ না করিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতি অধিকতর সহিষ্ণু হওয়ার কারণেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পাল রাজ্যে দারুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহা পরবর্তী গোড়া হিন্দু সেন রাজাদের শাসনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এই সমাজে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই সময়কাল ছিল সামন্ততন্ত্রের যুগ। সুতবাং একদিকে ছিল সমাজ, বৃত্তি ও ধন বিলি-বন্টন ব্যবস্থার উপর সামন্তপ্রভু ও ভূম্যধিকারীর অপ্রতিহত প্রভাব, আর একদিকে সমাজের অবহেলিত, নিষ্পেষিত মানুষের দুর্দশা। সামন্তবাদী আদর্শ ও পরিবেশ অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনেই সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি বজায় ছিল।

বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

শূদ্রবর্ণের মধ্যে করণদের উল্লেখ সর্বপ্রথমে পাওয়া যায়। সম্ভবত তাহারা শূদ্রবর্ণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন। বর্ণ হিসাবে করণ কথাটির শব্দগত অর্থ কারণীভূত বর্ণ অর্থাৎ লেখক, কেরানি বা দলিল সংরক্ষণকারী কর্মচারী। ঐতিহাসিক কলহন করণ শব্দের অর্থ হিসাবে দলিল লেখক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[২১৪] আবার করণ শব্দটি প্রায়ই করণিক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।[২১৫] সেন আমলের পূর্ববর্তী রাজাদের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা একজন সন্ধিবিগ্রহক ও করণ হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছেন[২১৬] এই করণরা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইতেছেন না। অথচ কায়স্থ হইতে করণদের মতই একই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাই হয়ত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে করণ ও কায়স্থ উভয়কে একশ্রেণীর কর্মচারীদের বুঝান হইয়াছে। গাহড়য়াল লিপিমালায় করণ ও কায়স্থ সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।[২১৭] সম্ভবত এই কারণেই করণেরা পরবর্তীকালে কায়স্থ হিসাবে

প্রতিপন্ন হইয়াছেন। অবশ্য এই সম্পর্কে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একেবারেই নীরব। ইহার কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইবার সময়কালে তাহা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে বর্ণরূপে স্বীকৃত না হইবার বিষয় অনুমান করিয়াছেন।[২১৮] তাহাছাড়া বল্লালচরিত গ্রন্থ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে কায়স্থদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া কুলীন, মধ্যম, মৌলিক কায়স্থ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[২১৯]

করণদের পরে সামাজিক মর্যাদায় ছিল অম্বষ্ঠদের অবস্থান। হয়ত তাহারা সমাজে সম্মানজনক স্থান লাভ করিয়া করণদের পরে উল্লেখিত হইয়াছেন। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক ও অভিন্ন জাতি ও শ্রেণী হিসাবে পরিচিত হইলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, এই বৈদ্য জাতি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় নাই।[২২০] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।[২২১] তাহাছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যদের একই বৃত্তির উল্লেখ হইয়াছে। সম্ভবত এই একই পেশাজীবী উভয় জাতি একজাতি ও শ্রেণীতে ক্রমশ পরিচিত হইয়াছিল।[২২২] যাহাই হউক, এই বৈদ্যগণ সমাজে সম্মানজনক পদ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা জয়দেবের গীতগোবিন্দের উল্লেখ হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে।[২২৩]

পালরাজ রামপালের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে কৈবর্তদের বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দিব্য, রুদ্রোক ও ভীম—এই তিন রাজা যথাক্রমে বরেন্দ্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা রামচরিতে উল্লেখিত হইয়াছে।[২২৪] ইহা হইতে অনুমান করা সহজ যে, সেনযুগের পূর্ববর্তী সময়ে কৈবর্তরা সম্ভবত সমাজে উচ্চস্তর ভুক্ত ছিলেন। তাহাদের প্রতিপত্তি অর্জন হইতে ইহা অনুমান করা যায়। ইহা হইতে অজয় রায় ধারণা করিয়াছেন যে, কৈবর্তরা সম্ভবত আর্যপূর্ব কোম ছিল।[২২৫] এই জন্য হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্থানে তাহাদের জায়গা হইয়াছিল। সম্ভবত এই কারণেই ভট্টভবদেব তাহাদেরকে অন্ত্যজ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২২৬] আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানকে কৈবর্ত বলা হইয়াছে এবং তীবর সংসর্গে পতিত হইয়া কলিতে ধীবর নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।[২২৭] আর্যাসপ্তশতীতে জালিকদের মৎস্যজীবী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা মাছ ধরিত এবং মাছ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।[২২৮] যাহাই হউক, কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের কোন ধরনের যোগাযোগের বিষয় উল্লেখ হয় নাই। তাহাছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ধীবর নামক মৎস্য ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে।[২২৯] বল্লালচরিতে উল্লেখ হইয়াছে যে, কৈবর্ত জাতি দাস্য করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় বল্লালসেন তাহাদিগকে দাস্যকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২৩০] ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাহারা পূর্বে অন্য কোনো কার্যে নিযুক্ত ছিল। অবশ্য বল্লালচরিত গ্রন্থটির সাক্ষ্য খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহাছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও ইহাদেরকে মৎস্যজীবী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় কৈবর্ত ও মাহিষ্যদেরকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।[২৩১]

গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়, কবিন্দক, মোদক, তাম্বুলী, গন্ধবণিক, তৈলকার, তৌলিক, দাস, বারজীবী প্রভৃতি সকলেই সমপর্যায়ের জাতি। ইহাদের মধ্যে ধানোৎপাদক শ্রেণী হিসাবে কৃষিজীবী দাস ও বারজীবী এবং শিল্পজীবী কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার ও তন্তুবায় অন্যতম। সমাজসেবক হিসাবে গোপ, নাপিত, মালাকারদের গণ্য করা যায়। তাহাছাড়া ব্যবসায়ী ও অর্থোৎপাদক হিসাবে মোদক, তাম্বুলী, তৈলিক, তৌলকার এবং গন্ধবণিক অন্যতম। অবশ্য করণরা ছিল কেরাণী, পুস্তপাল, হিসাবরক্ষক, দপ্তরকর্মচারী এবং অম্বষ্ঠ বৈদ্যরা চিকিৎসক শ্রেণী। তাই ধনোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য না হইলেও তাহারা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[১৩২]

সমাজে ধনোৎপাদক শ্রেণীভুক্ত শিল্পজীবী, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক সম্প্রদায়ের সকলেই প্রায় মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র হিসাবে গণ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক পূর্বে উত্তম সঙ্করভুক্ত ছিল, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহাদেরকে যথাক্রমে মধ্যম ও অসৎশূদ্র পর্যায়ের বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বল্লাল-চরিতেও[১৩৩] রাজাদেশ অমান্য করিবার জন্য তাহাদের পতিত হইবার কথা রহিয়াছে। হয়ত সেইজন্য বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহাদেরকে উত্তম ও সৎশূদ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাছাড়া কর্মকার, সূত্রধর, শৌণ্ডিক, তক্ষণ, ধীবর, জালিক, কৈবর্ত, অট্টালিকাকার, কোটজাতি, যুঙ্গি, চর্মকার ও নট মধ্যম সঙ্কর ও অসৎশূদ্র হিসাবে উল্লেখ হইয়াছে। ইহার মধ্যে চর্মকার, শৌণ্ডিক, রজক শ্রেণীকে নিম্ন পর্যায়ের বলিয়া গণ্য করা হয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ও ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ যে অন্ত্যজ হিসাবে কর্মকারদের উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবত তাহাদের কর্মের জন্য এইরূপ হইয়াছে। তাহাছাড়া মল্ল ও রজক সমাজসেবক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমাজসেবী শ্রমিকদের স্থান ছিল বর্ণাশ্রম বহির্ভূত। এই নিম্নস্তরভুক্তরা ছিল যথাক্রমে চণ্ডাল, বরুড়, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, হড্ডি, ডোম, বাগতীত জাতি। ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত।[১৩৪] আর্যাসপ্তশতীতে অন্ত্যজ বর্ণের সাপুড়ের উল্লেখ করিয়া তাহাদের সাপ লইয়া খেলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :

> সখি, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হওয়ায় তোমার নয়ন মধুর হইয়া উঠিয়াছে।
> তুমি অপরের জীবন লইয়া বাজি খেলিতেছ কেন? দূরে সরিয়া যাও।
> সাপুড়ে নির্বিঘ্নে গৃহচত্বরে সাপ খেলাক।[১৩৫]

চর্যাগীতিতে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ ও আদিবাসী কোমের জীবিকা ও জীবনযাত্রারও সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাদের বাঁশের তাঁত ও চাঙ্গারি বুনন, নৌকা চালনা, পশুশিকার, নৃত্যগীত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বৌদ্ধ চর্যাকারগণ তাহাদের গীত রচনা করিয়াছেন। সুতরাং কর্মগত ও নৃত্যতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগতভাবে তৎকালীন জাতিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

সেন যুগে ভূমিনির্ভর সামন্ততন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ইহার ফলাফল রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাহাছাড়া এই সময় ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং সমাজজীবন তাঁহাদের দিকনির্দেশনাতেই মূলত পরিচালিত হইতে

থাকে। অবশ্য মার্জিত পরিবেশ গঠন ও প্রতিষ্ঠা জ্ঞানী সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী (ব্রাহ্মণ)দের দায়িত্ব ছিল। উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণগণই তৎকালীন সময়ে সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করিতেন। এই সময় বণিক ও ব্যবসায়ীদের অবনতি বেশ লক্ষণীয়। ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ– ব্যবস্থায় ইহাদের পতন স্বাভাবিক হইলেও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তাঁহাদের মধ্যে সংঘাতের ইঙ্গিত বহন করিয়া থাকে। তাহাছাড়া অন্ত্যজ এবং অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্র সুপ্রসন্ন ছিল না। এইজন্য এই অস্পৃশ্যরা রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ আদর্শকে স্বভাবতই সুনজরে দেখিত না। অধিকাংশ মানুষকে অধিকারবঞ্চিত রাখিয়া এই ধরনের সমাজ গঠন হয়ত রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল এবং দেশের অধিকাংশ মানুষ অভেদ্য বর্ণের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া নিপীড়িত হইতেছিল।

উপর্যুক্ত বর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাস একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সেনরাষ্ট্রের সমাজজীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। একদিকে যেমন বর্ণে বর্ণে বিভক্তি বা কঠোর বিধিনিষেধ তেমনি অপরদিকে অর্থনৈতিক শ্রেণীস্তর বিভক্তি মানুষকে বিচ্ছিন্ন কবিয়া দিয়াছিল। কারণ এই সময প্রাচীন বাংলার সমাজ আদর্শকে পুরাপুরিভাবে অস্বীকাব করা হয় এবং উত্তর ভাবতীয় ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। তাই সামাজিক বন্ধনে উচ্চশ্রেণী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল মানুযেরা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিলেও নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের দুঃখদৈন্যের অন্ত ছিল না। এই অধিকারবঞ্চিতরাই ছিল আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাহাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। পবিণামে সামাজিক বন্ধন কঠিন হইলেও অধিকারবঞ্চিতরা ইহার প্রতি মোটেও সহনশীল হয় নাই, বরং তাহাবা ইহাকে ঘৃণা করিত। তাই ইহার বহিঃপ্রকাশ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনে রাজা বল্লাল সেনের দায়-দায়িত্ব এবং ইহার ঐতিহাসিকতা লইয়া বহুদিন পূর্বেই প্রশ্ন উঠিয়াছে। কারণ বাংলাদেশে রচিত অসংখ্য কুলশাস্ত্রে তাহাকেই জড়িত করিয়া কৌলীন্য প্রথার ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কুলশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে : "গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কারণ বাংলার ব্রাহ্মণেরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পঞ্চব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বাংলাদেশে বসবাস করেন এবং আদিশূর তাহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। কালক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহার ফলে কতক রাঢ় দেশে, কতক বরেন্দ্র ভূমে বাস করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজা বল্লালসেনের রাজত্বকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে তাহারা রাঢ়ী এবং বরেন্দ্র নামে দুইটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। কালক্রমে তাহাদের বংশধরেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল। আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় উনষাট। ক্ষিতিশূর তাহাদের বাসের জন্য উনষাটখানি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামের নাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঞী উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর এই সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয়—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মহারাজা বল্লালসেনের সময় কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। তাঁহাদের গাঞীর সংখ্যা একশত।"[১৩৬]

তবে মূলত ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে কুলগ্রন্থসমূহ রচিত হইলেও বাংলার সকল জাতি সম্পর্কেই কুলপঞ্জি পাওয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশ ঘটকগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে। এই কুলগ্রন্থের বিশেষত জাতিমালার ভিত্তিতে প্রস্তুত ও ইহাদের শাখা-প্রশাখার উদ্ভব বিস্তার ও বিশ্লেষণ কবা হইয়াছে, আবার ইহাদের শাখা-প্রশাখার উদ্ভবে যে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহা নিরসনে পারস্পরিক আহার-বিহার নিরূপণ এবং উদ্ভূত সমস্যাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাছাড়া কুলগ্রন্থগুলিতে পরিবারভিত্তিক কৌলীন্য, কুলক্রিয়া সম্পর্কেও বেশ আলোচনা আছে।

এখন দেখা যাক, রাজা আদিশূর কেন্দ্রিক কুলগ্রন্থের যৌক্তিকতা কতটুকু। কারণ এই আদিশূরকে কেন্দ্র করিয়াই কুলশাস্ত্র রচিত হইয়াছে এবং আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন সকল কুলজি গ্রন্থের ভিত্তিরূপেও গণ্য হইয়াছে। এই আদিশূর কে? বাংলার ইতিহাসে তাহার কোনো অস্তিত্ব আছে কি না এবং তিনি সত্যই কি কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন? কিন্তু বাংলার ইতিহাসে রাজা আদিশূর সম্পকে এবং তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি লইয়া অদ্যাবধি কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। যদিও বাংলাদেশে শূর উপাধিধারী ও শূরবংশীয় বাজাগণের রাজত্ব সম্পকে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রাজা বাজেন্দ্র চোলের লিপিতে[১৩৭] উল্লেখ আছে যে, রণশূর নামক এক শূরবংশীয় রাজা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবার একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পালরাজ রামপালেব পিতৃসাম্রাজ্য উদ্ধারে সহায়তাদানকারী সামন্তরাজ অপরমন্দারাধিপতি লক্ষ্মীশূরের নাম উল্লেখ আছে।[১৩৮] ব্যারাকপুর লিপিতে বিজয়সেনের স্ত্রী রাণী বিলাসদেবীকে শূরবংশ উদ্ভব বলা হইয়াছে।[১৩৯] ইহা হইতে অনুধাবন করা সম্ভব যে, রাজা বিজয়সেন শূরবংশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পালরাজ রামপালের রাজত্বকালে এই বিজয়সেন খুব সম্ভব রাঢ় অঞ্চলের সামন্ত রাজা ছিলেন। আবার এই শূরবংশীয় রাজগণ রাঢ় দেশের কোনো এক অঞ্চলে রাজত্ব কবিতেন।[১৪০] তাই বলা যায়, যেভাবেই হউক সেনবংশীয়দের সহিত শূরবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং প্রমাণিত সত্য হিসাবে বিবেচিত হইতেছে যে, বাংলাদেশের অংশবিশেষ "রাঢ় অঞ্চলে" শূর রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল এবং বল্লালসেন এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে রাজা আদিশূরের ঐতিহাসিকত্ব অদ্যাবধি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় নাই। রমেশচন্দ্র মজুমদার বিভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে এই নামকে ছদ্মনাম হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।[১৪১] আবার কুলশাস্ত্রসমূহে বহুক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সকল কুলশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিতেছেন : "কুলগ্রন্থে অন্য প্রায় সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও রাজা আদিশূরই যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নরূপ আখ্যানের মূলে কোনো সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি থাকিতে

পারে, কিন্তু এই আখ্যান অমূলক হইলেও কোন প্রকৃত রাজার নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহা রচিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষগণের আগমনের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সুপরিচিত অথবা অন্য কোনো প্রকৃত রাজার পরিবর্তে একজন কাল্পনিক রাজাকে এই আখ্যানের কেন্দ্ররূপে প্রচার করিবেন, ইহা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিলে আদিশূর এই নাম বা উপাধিধারী কোনো রাজা সত্য সত্যই বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না।"[১৪২]

তবে ব্রাহ্মণ আনয়নের ক্ষেত্রে তিনি দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন, কারণ বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে উত্তর ভারত হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন, এই ক্ষেত্রে তিনি বলিতেছেন : "ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন ও স্থায়ীভাবে বসবাস অস্বাভাবিক বা বিশিষ্ট কোন ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ...আদিশূরের পূর্বে বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়েই কোনই সন্দেহ নাই। ...সম্ভবত পরবর্তীকালে মধ্যদেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণেরা বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণদের হেয় জ্ঞান করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতা স্থাপনের জন্য কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জের দলে মিশিয়া যাওয়ায় আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।"[১৪৩]

এই আদিশূরের পরবর্তীতে রাজা বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কুলশাস্ত্রে সবিশেষ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। যদিও এই বল্লাল একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং সামন্তসেনের প্রপৌত্র, রাজা হেমন্তসেনের পৌত্র, রাজা বিজয়সেন ও শূরবংশীয়া রাজকন্যা বিলাসদেবীর পুত্র, তবু তাঁহার সহিত কৌলীন্য মর্যাদার সম্পর্ক স্থাপনের যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিতেছেন, "বল্লালসেন ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে দানগ্রহীতা বহু ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে : কিন্তু তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে "কুলীন" এই মর্যাদাসূচক উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থ মতে ব্যক্তিগত গুণ দেখিয়া বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন কৌলীন্য মর্যাদা দিয়াছিলেন অথচ অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি, ধনঞ্জয়, সর্বানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথবা লক্ষ্মণসেনের সভাস্থিত জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্ধন প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ কেহই কুলীন হইলেন না। কুলীন হইলেন কেবল তাঁহারাই, কুলগ্রন্থের বাহিরে যাঁহাদের নাম বা কীর্তির কোন পরিচয় নাই। সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণ ছিলেন অথচ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই কুলীন হইবার যোগ্য বিবেচিত হইলেন না—বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।"[১৪৪]

অনুরূপ কথারই প্রতিধ্বনি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন, "কুলশাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসনসমূহে নব-প্রচলিত আভিজাত্যবিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসন গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ করলেও তাহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্যপ্রথা বল্লালসেন কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।"[২৪৫]

তাই সম্ভবত বল্লালসেন আদৌ কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক ছিলেন না বা এই ধরনের সমাজবিন্যাসমূলক কোনো সংস্কার তিনি করেন নাই। বর্তমানে ইহা লইয়া গবেষণাও চলিতেছে। এই বিষয়ে নরোত্তম কুণ্ডু[২৪৬] অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, কুলীন প্রথার সহিত বল্লালসেনের সংশ্লিষ্টতার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল না। কৌলীন্য প্রথার সাক্ষ্যরূপ কুলশাস্ত্রসমূহ বল্লালসেনের রাজত্বকালের পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে রচিত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইহাব উদ্যোক্তা ছিলেন এবং নিজেদের দাবির ভিত্তিকে মজবুত করিবার জন্য ইহাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রদানের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন এবং বাংলার হিন্দুযুগে এই প্রথার উৎপত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ড. মমিন চৌধুরী বলিয়াছেন যে, এই প্রথা প্রবর্তনে সেই যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় উল্লেখ হওয়া খুবই সঙ্গত ছিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো প্রকাব ইঙ্গিতও সেনযুগের সাহিত্য বা লিপিমালায় নাই। তাহাছাড়া সেনযুগেব বিখ্যাত শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিলেও কৌলীন্য প্রথা সম্পর্কে কোনো প্রকার আকার-ইঙ্গিত পর্যন্ত কবেন নাই। সেনরাজগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান সম্পর্কিত আদেশেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।[২৪৭] তাই বলা সম্ভব যে, বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন নাই এবং খুব সম্ভবত মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের বহু পরে ব্রাহ্মণগণই ইহার প্রবর্তন করেন। এই সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিতেছেন : "যে সময়ে আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের এবং বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্য মর্যাদার প্রতিষ্ঠার আখ্যান পূর্ণাঙ্গভাবে গড়িয়া ওঠে ও কুলাচার্যগণ কর্তৃক সালঙ্কারে লিপিবদ্ধ হয় তখন এ উভয় ব্যাপারই জনপ্রবাদে পর্যবসিত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে। বংশপরম্পরাগত পারিবারিক আখ্যান, প্রচলিত জনশ্রুতি, অসম্পূর্ণ কুলজিগ্রন্থ ও তৎকালে প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস নামে সাধারণে যাহা পরিচিত ছিল এই সমুদয় যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিয়া ইহাদের সাহায্যেই ব্রাহ্মণগণ আদিশূর ও বল্লালসেনের কাহিনী গড়িয়া তোলেন।"[২৪৮]

অন্যদিকে এই কুলশাস্ত্র রচনার সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা কঠিন। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই কুলশাস্ত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২৪৯] এই কুলজি গ্রন্থ রচনার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. মমিন চৌধুরীও রমেশ মজুমদারের অভিমত সঠিক বলিয়া মনে করেন।[২৫০] প্রচলিত প্রথাকে প্রাচীন শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থন করিয়া মধ্যযুগের সমাজের সহিত প্রাচীন হিন্দু সমাজের যোগসূত্র স্থাপনেব প্রচেষ্টাই রঘুনন্দন প্রমুখ কুলশাস্ত্রকারগণের রচনায় প্রতিফলিত হয়। এই

প্রচেষ্টার মধ্যে বাঙালি হিন্দু সমাজকে প্রাচীন গৌরবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াসও সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সমস্ত কুলজি গ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনায় ইহার অনেক দোষক্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ :

১. বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজের কৌলীন্য প্রথা এবং আদিশূর কর্তৃক বাংলার বাহির হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নরূপ কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

২. শুধু ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। অন্য কুলশাস্ত্রগুলি যথা—নূলো পঞ্চাননের 'গোষ্ঠীকথা', বাচস্পতি মিশ্রের 'কুলরাম', ধনঞ্জয়ের 'কুলপ্রদীপ', এডুমিশ্রের 'কারিকা', মহেশের 'নির্দোষ-কুল-পঞ্জিকা', হরিমিশ্রের 'কারিকা' এবং 'মেল পর্যায় গণনা', 'বরেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকা' ও 'কুলার্ণব' প্রভৃতি পরবর্তীকালে রচিত অর্বাচীন গ্রন্থ।

৩. পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের ইতিহাস জ্ঞান ছিল সামান্য। তাই তাঁহাদের লিখিত সামাজিক ইতিহাসেব মূল্যও সীমিত।

৪. বাদল স্তম্ভলিপি ও ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে উল্লেখিত বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারসমূহের উল্লেখ কুলজি গ্রন্থের কোথায়ও নাই, এই সম্পর্কে সকল কুলশাস্ত্র নীরব।

৫. বিভিন্ন কুলশাস্ত্রে একটি ঘটনা একইভাবে বিবৃত না হইয়া বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে তথ্যের মধ্যে গরমিল লক্ষ্য করা যায়।

৬. জাল কুলশাস্ত্রের আধিক্য বেশ লক্ষণীয়।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন, কুলশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের কিছু কিছু উল্লেখ হইলেও ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই।[৫১]

সুতরাং কৌলীন্য প্রথা বর্ণিত কুলশাস্ত্রসমূহের যখন ঐতিহাসিকতাই নাই, তখন এই সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত রাজা বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের মতবাদ ঐতিহাসিকের নিরিখে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে এদেশের শাসনক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হস্তচ্যুত হয়। তখন হইতে তাহারা সামাজিক মর্যাদা হারাইতে থাকে। এই সময় রাজশক্তি মুসলমানদের অধিকারে থাকিবার ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পূর্বের সেই সামাজিক প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের প্রভেদ অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ এই প্রকারের সামাজিক পরিবেশ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। মনে হয় ইসলাম ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর প্রভাবের প্রসাব রোধ করিবার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। সেন আমলে বৌদ্ধধর্মের ছোঁয়াচ হইতেও হিন্দুধর্ম রক্ষার প্রয়াস আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই সমস্ত কুলজি গ্রন্থসমূহ রচনার পশ্চাতেও আমরা সেই প্রকারের বিশেষ মানসিকতার পরিচয় পাইয়া থাকি। অন্যদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা অধিকতর উন্নত কবিবার মানসে নিজেদের দাবিকে ঐতিহাসিকতা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ ৫০–৫১।
২ ডি. আর. ভাণ্ডারকর, ফরেন এলিমেন্টস ইন দি হিন্দু পপুলেশন, ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়্যারি, ভলুম–৪০, পৃ ৩৫।
৩. এ.এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, (ঢাকা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৭), পৃ. ২০৫–২০৬।
৪ অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৮২), পৃ. ৪৯।
৫ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ ২৩৭।
৬. ভবদেবভট্ট, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পা.), (রাজশাহী : বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭), পৃ ভূমিকা–১।
৭ হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ (অনু.), (প্রথম খণ্ড), (কলিকাতা : মহামিলন মঠ, ১৩৯৪), পৃ. ৫।
৮ বল্লালসেন, দানসাগর, ভবতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৫৩), পৃ. ৭।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭–৮।
১০ জীমূতবাহন, দায়ভাগ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), ২য় সংস্করণ, (কলিকাতা : ১৮৯৩), পৃ ২২৩।
১১ জীমূতবাহন, কালবিবেক, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও প্রথমনাথ তর্কভূষণ (সম্পা.), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৫), পৃ ৫৪৪।
১২ বল্লালসেন, দানসাগর, পৃ ২।
১৩ প্রাগুক্ত,
১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
১৫ বল্লালসেন, অদ্ভুতসাগর, মুরলীধর ঝা (সম্পা.), (বেনারস : দি প্রভাকর অ্যান্ড কোং, ১৯০৫), পৃ. ৪।
১৬. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ৬।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
১৯. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃ. ৭১–৭২।
২০ প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।
২১ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ২২–৩১, ব্যারাকপুর তাম্রলিপি এবং লাইন নং ২৯–৩৭, নৈহাটি তাম্রলিপি, পৃ. ৬৬, ৭৮।
২২. প্রাগুক্ত, লাইন নং ২১–২৫, গোবিন্দপুর তাম্রলিপি, পৃ. ১৭।
২৩ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৮–৪৩, ইদিলপুর তাম্রলিপি এবং লাইন নং ৩৮, মদনপাড়া তাম্রলিপি, পৃ. ১২৯, ১৩৮।
২৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৯, দেওপাড়া প্রশস্তি, পৃ ৫১।
২৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৩৮।
২৬. ইন্সক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২৩, দেওপাড়া প্রশস্তি, পৃ. ৫৪।

২৭. কনকতুলাপুরুষ : ইহা একজন মানুষের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করিবার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে চতুর্বেদজ্ঞ পুরোহিত তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ সংস্থাপন করেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যে হোম শুরু হয়। হোম শেষে পুরোহিত ফুল, ধূপ-ধূনা ও পৌরাণিক মন্ত্র সহকারে দাতার (রাজা বা ভূস্বামী) বন্দনা করেন। তখন দাতা স্বর্ণালঙ্কার, কর্ণভূষণ, সোনার হার, অঙ্গুরীয়, বস্ত্র পুরোহিতকে প্রদান করেন এবং পুনরায় স্নানপূর্বক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া এই অনুষ্ঠান পৌরোহিত্যকারী ব্রাহ্মণ ও তাহার সহযোগীদেরকে গ্রাম দান করেন। ইহাছাড়া সম্মানস্বরূপ উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের বিভিন্ন উপহার দেওয়া হয় এবং বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান অনুষ্ঠানের বর্ষটি উৎসর্গ করা হয়।

২৮ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ৩১–৪৩, ব্যারাকপুর তাম্রলিপি, পৃ. ৬৬–৬৭।

২৯. হেমশ্বমহাদান : ষোলটি বৃহৎ দানের একটি দান হইতেছে হেমশ্বমহাদান। সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠানে বৃহৎ দান স্বরূপ একটি সোনার ঘোড়া প্রদান করা হয়। মৎস্য পুরাণে এই দানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

৩০ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ৩৭–৫৪, নৈহাটি তাম্রলিপি, পৃ. ৭৯।

৩১ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৪–৪৬, আনুলিয়া তাম্রলিপি, পৃ. ৯০।

৩২. প্রাগুক্ত,

৩৩ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৩–৪৭, গোবিন্দপুর তাম্রলিপি, পৃ ৯৭–৯৮।

৩৪. হেমশ্বরথ মহাদান : ষোলটি বৃহৎদানের একটি হইল সাত অথবা চারিটি স্বর্ণের ঘোড়াসহ স্বর্ণের চারি চাকার গাড়ি দান। এই অনুষ্ঠানের নাম হেমশ্বরথমহাদান যজ্ঞ অনুষ্ঠান। এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিতেন এবং ইহার বিনিময়ে তাহারা ভূমিদান লাভ করিতেন।

৩৫ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ৩৩–৪৮, তর্পণদীঘি তাম্রলিপি, পৃ ১০৪।

৩৬. প্রাগুক্ত,

৩৭ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, লাইন নং ৩৯–৫১, মাধাইনগর তাম্রলিপি, পৃ ১১৫।

৩৮. প্রাগুক্ত, সুন্দরবন তাম্রলিপি, পৃ ১৬৯–১৭০।

৩৯ প্রাগুক্ত,

৪০. প্রাগুক্ত, লাইন নং ৪৩–৪৬, ইদিলপুর তাম্রলিপি, পৃ ১২৯-১৩০।

৪১ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৪, ইদিলপুর, পৃ. ১২৯।

৪২ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৪১-৫১, মদনপাড়া তাম্রলিপি, পৃ. ১৩৮–১৩৯।

৪৩. ,, সাহিত্য পরিষদ লিপি, পৃ ১৪১–১৪২।

৪৪ ,, শ্লোক নং ৭, চট্টগ্রাম তাম্রলিপি, পৃ. ১৬২।

৪৫ , আদাবাড়ি তাম্রলিপি, পৃ. ১৮১।

৪৬. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩, ভুবনেশ্বর প্রশস্তি, পৃ. ৩৬।

৪৭ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৩–৪৮, তর্পণদীঘি তাম্রলিপি, পৃ ১০৪।

৪৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৪০।

৪৯. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ৫।

৫০ বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃ ৮০–৮১।

৫১ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ২৪, ৬৭, ১৫৭।

৫২. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং–১৩, ভুবনেশ্বর লিপি, পৃ. ৩৭।

৫৩ ,, শ্লোক নং ৩, পৃ. ৩৬।

৫৪ ,, লাইন নং ৪১–৪৯, বেলাব তাম্রলিপি, পৃ. ২৪।

৫৫. এম. চক্রবর্তী, "ভট্টভবদেব অফ বেঙ্গল", জার্নাল অ্যান্ড প্রসিডিংস অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, নিউ সিরিজ, খণ্ড–৮ (১৯১২), পৃ. ৩৪৩।

৫৬. কালবিবেক, পৃ. ভূমিকা : ৮।
৫৭. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, আদাবাড়ি তাম্রলিপি, পৃ. ১৮১।
৫৮. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, শ্লোক নং ৮, পৃ. ৩।
৫৯. ভি সি. ভট্টাচার্য, "ডেট অফ লক্ষ্মণসেন অ্যান্ড হিজ প্রিডিসেসরস্", ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারী, খণ্ড–৫১, পৃ. ১৪৬–১৪৭।
৬০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৪২–২৪৩।
৬১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, সপ্তম সংস্করণ, (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮১), পৃ. ২৪২।
৬২. এস. কে. দে, "অন দি ডেট অফ দি সুভাষিতবলী", জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেটবৃটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড, লন্ডন, ১৯২৭, পৃ. ৪৭২।
৬৩. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা : ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ৩৮।
৬৪. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ১২–১৩।
৬৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃ. ৮৪।
৬৬. এপিগ্র্যাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–১৭, পৃ. ৩৩৬।
৬৭. ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ১২–১৩।
৬৮. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃ. ৮৪-৮৫।
৬৯. অনিরুদ্ধ ভট্ট, পিতৃদয়িতা, দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), (কলিকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৩০), পৃ. ৮।
৭০. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, (কলিকাতা : দীপালী সেন, ১৩৮৪), পৃ. ১৪২।
৭১. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, তৃতীয় মুদ্রণ, (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬), পৃ. ১০৯।
৭২. এপিগ্র্যাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–২, পৃ. ৩৩০।
৭৩. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, প্রথম নব-ভারত সংস্করণ, (কলিকাতা : নব-ভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬) উত্তর খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪০।
৭৪. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, (কলিকাতা : সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৭৮), শ্লোক নং ৩৩১, পৃ. ২২১।
৭৫. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৬।
৭৬. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৬৮৪, পৃ. ২৯৭–২৯৮।
৭৭. প্রাগুক্ত, আলোচনা ও বিচার, পৃ. ৫৭।
৭৮. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রথম নব-ভারত সংস্করণ, (কলিকাতা : নব-ভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১), ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২৭।
৭৯. প্রাগুক্ত,
৮০. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃ. ৮৭।
৮১. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৬।
৮২. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৬০।
৮৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৫।
৮৪. ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ১৭০।
৮৫. দীননাথ ধর (অনূ.), বল্লালচরিত, (কলিকাতা : যোড়াসাঁকো, রাজবাড়ি, ১৩১১), পৃ. ৫৫।

৮৬. এস. হোসেন, সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডিএভল বেঙ্গল, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ২১।

৮৭. এন. কুণ্ডু, কাস্ট অ্যান্ড ক্লাস ইন প্রি-মুসলিম বেঙ্গল, লন্ডন ইউনিভারসিটি পি-এইচ. ডি থিসিস, ১৯৬৩, পৃ. ১০১ ; উদ্ধৃত, এস. হোসেন, সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডিএভল বেঙ্গল, পৃ. ২১।

৮৮. অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লি. ১৯৭৬), পৃ. ৩৬।

৮৯. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৪০০) পৃ ২৪৫।

৯০ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২), পৃ. ৪৩।

৯১ আর. সি মজুমদার (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ১৯৪৩), পৃ ৫৬৭।

৯২ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ২৯৬-৩০০।

৯৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ১১।

৯৪ বল্লালচরিত, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ৭৮-৭৯।

৯৫ ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পৃ ১৭০।

৯৬ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৫৮।

৯৭. দায়ভাগ, পৃ ১৩৪।

৯৮ ইন্সক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, শ্লোক নং-৪, ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, পৃ ৬৫।

৯৯ ডি আর ভাণ্ডারকর, "ফরেন এলিমেন্টস ইন দি হিন্দু পপুলেশন" ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি, খণ্ড-৪০, পৃ. ৩৫।

১০০ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ২৯৯-৩০০।

১০১ আর্যাসপ্তশতী ও গীতগোবিন্দ, শ্লোক নং-২৬৯, পৃ ২০৭।

১০২ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ৩০১।

১০৩. প্রাগুক্ত, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ ৩৩৮-৩৩৯।

১০৪. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ ১২।

১০৫. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৭-৩৪০।

১০৬. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ২৪৫।

১০৭ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায় ও চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৭-৩৪৭।

১০৮. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২১-২৫।

১০৯. দীননাথ ধর (অনু.), বল্লালচরিত, পৃ ১০০।

১১০. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২৬।

১১১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ২৪৮।

১১২ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ ২৭।

১১৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৪৯।

১১৪. প্রাগুক্ত,

১১৫. কমালাকান্ত গুপ্ত (সম্পা.), কপার প্লেটস অফ সিলেট, খণ্ড-১, (সিলেট, ১৯৬৭), লাইন নং ৩৩, সিলেট তাম্রলিপি, পৃ. ৯৮।

১১৬. এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড-১৯, পৃ. ২৮২, ২৮৫, ২৮৬।

১১৭. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৬।

১১৮. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪০।

১১৯. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২৬।

১২০. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ১১৮।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১২২. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৯–৩৪০।

১২৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২৫–২৬।

১২৪. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১০, পৃ. ১৩৩।

১২৫. প্রাগুক্ত, গীত নং ৮, পৃ. ১৩৭।

১২৬. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ২৮, পৃ. ১৪১।

১২৭. প্রাগুক্ত, গীত নং ৪৯, পৃ. ১৫১।

১২৮ ,, গীত নং ৩, পৃ. ১৩০।

১২৯. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, শ্লোক নং ৮, নৈহাটি তাম্রলিপি, পৃ. ৭৭।

১৩০ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, প্লেট নং ৫৫, ১৩৭।

১৩১ প্রাগুক্ত, প্লেট নং ৫২, ১২৭।

১৩২. শ্রীধর দাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), ৪/২৫/৫।

১৩৩ প্রাগুক্ত. ৪/৪৬/৫।

১৩৪ সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/৪৮/১, উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ ৪৩৫, ৪৯৯।

১৩৫. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৯, পৃ ১৪৯।

১৩৬ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১১২, পৃ ১৭০।

১৩৭ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৭২). দশম সর্গ :, শ্লোক নং ১২, পৃ. ১২১–১২২।

১৩৮ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৫৫।

১৩৯. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম. পৃ. ৫১।

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

১৪১. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪০।

১৪২. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দম, পৃ. ৭৮–৮২।

১৪৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস. আদিপর্ব, পৃ. ২৫৪।

১৪৪. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ১১৮।

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৪৬. ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ৪৫।

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১৪৮. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৫৮।

১৪৯. নীলরতন সেন (সম্পা.). চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১০, পৃ. ১৩৩।

১৫০. উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণা স্ত্রীলোকের বিবাহকে অনুলোম বিবাহ এবং নিম্নবর্ণ পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণা স্ত্রীর বিবাহ প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়।

১৫১. দায়ভাগ, পৃ. ১৩৪।

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১৫৪. প্রাগুক্ত,

১৫৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

১৫৬. ব্রাহ্মণসর্বস্বম, পৃ. ১৭০।

১৫৭. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৯০।

১৫৮. ভবদেব ভট্ট, শবসূতকাশৌচ প্রকরণম, রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা (সম্পা.), (কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৯), পৃ. ১৮।

১৫৯. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ১১৭।

১৬০ দায়ভাগ, পৃ. ১৬৮।

১৬১. শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি, দায়ভাগ টিপ্পনী, ভরতচন্দ্র শিরোমনি (সম্পা.), (কলিকাতা : ১৯৬৩), ১১৬।

১৬২ নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, পৃ ২৩৮।

১৬৩. এস, হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৬৪ ভট্টভবদেব, সম্বন্ধবিবেক, এস সি. ব্যানার্জী (সম্পা.), নিউ ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি, খণ্ড-৬, ১৯৪৩-৪৪, পৃ. ২৫৭।

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯।

১৬৬ প্রাগুক্ত,

১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।

১৬৮. ভট্টভবদেব, সম্বন্ধবিবেক, পৃ ২৬০।

১৬৯. শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যার্ণব (সম্পা.), ভবদেব পদ্ধতি, (শিবপুর : কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪৮), সংস্কার-বিবাহ, পৃ ১।

১৭০ এস. হোসেন, দি সোস্যাল লাইফ অফ উইমেন ইন আর্লি মিডিএভল বেঙ্গল, পৃ. ২৯।

১৭১ দীননাথ ধর (অনু.), বল্লালচরিত, পৃ. ৬১-৬২।

১৭২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ২৫৫।

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬১।

১৭৪. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ২৯, পৃ ১৪২।

১৭৫ আর মুখার্জী অ্যান্ড এস. কে. মাইতি, করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশন্স্ বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, (কলিকাতা : ফার্মা কে, এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭), পৃ. ১৬১-১৬২।

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮১।

১৭৭ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৮, ভাগলপুর লিপি, পৃ ১৭৭।

১৭৮ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২০, বাণগড় লিপি, পৃ. ২০৬-২০৭।

১৭৯ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, পৃ ১৬-১৭, ৫৮-৫৯, ৬৯-৭০, ৮৩-৮৪, ৯৩, ৯৪, ১০০, ১০৮, ১১১, ১৩৩, ১৪১, ১৫৯।

১৮০ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং-২৩, পৃ ৫৮।

১৮১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ ২৭১।

১৮২ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৮- ৩৪৯।

১৮৩. প্রাচীন লিপিমালা এই তথ্যের উৎস। উদ্ধৃত, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৬৯।

১৮৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, পৃ ৬৬, ৭৮, ৯০, ১১৪, ১১৫।

১৮৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃ. ২৬৯–২৭০।
১৮৬. ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ৩।
১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
১৮৮. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২৩, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫৪।
১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
১৯০ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপব, পৃ. ২৭১।
১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।
১৯২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড- ৩, পৃ ৬৬, ৭৮, ৯০।
১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬, ৫৬।
১৯৪. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তব খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায় ও চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৭–৩৪৭।
১৯৫. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ. ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, প ২১–২৭।
১৯৬. বল্লালচবিত, পৃ. ১০০।
১৯৭ বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৭৫।
১৯৮. আর্যাসপ্তশতী ও গৌডবঙ্গ, শ্লোক নং ২৬৯, পৃ ২০৭ ; উদ্ধৃত : বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ২৭৬।
১৯৯. বৃহদ্ধর্ম্মপুবাণ, উত্তব খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায, পৃ. ৩৪০।
২০০. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২৬।
২০১. প্রায়শ্চিত্ত প্রকবণম, পৃ. ১১৮।
২০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
২০৩ নীলবতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১০, ১৪, ১৮, ২৮, ৪৭, ৪৯, ও ৫০, পৃ. ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১ ও ১৫২।
২০৪. বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৬৯।
২০৫. বৃহদ্ধর্ম্মপুবাণ, উত্তর খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায, পৃ. ২৯৮–২৯৯।
২০৬. বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৬৮।
২০৭. প্রাগুক্ত,
২০৮. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪১০, পৃ. ২৩৮।
২০৯. বিদ্যাকর, সুভাষিতরত্নকোষ, ডানিয়েল এইচ. এইচ. অ্যাঙ্গেলস্ (অনূ.), (হার্ভাড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড নং ৪৪, ১৯৬৫), শ্লোক নং ১৩০৬, পৃ. ৩৫৯।
২১০. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, শ্লোক নং ২২৪, ৫/৪৯/৪, পৃ. ৬০৯।
২১১. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৯৭, পৃ. ২১৩–২১৪।
২১২. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৫০, পৃ. ১৫২।
২১৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড় লেখামালা (প্রথম স্তবক), (রাজশাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯) পৃ. ২৬, ২৭, ৭৭–৮৩, ৮৫, ১১৬, ১১৭, ১৪৪, ১৪৫।
২১৪. এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–৪, পৃ. ১০৫।
২১৫. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ১৮৪।
২১৬. রামচরিত, পৃ. ১৫৪।
২১৭. এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–৮, পৃ. ১৫২।
২১৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৪৯।

২১৯. বল্লালচরিত, পৃ. ১২, ১৩।
২২০. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, পৃ. ৫৯০।
২২১. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২২-২৫।
২২২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৪৯-২৫০।
২২৩. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, চতুর্থ সর্গঃ, শ্লোক নং ২০, পৃ. ৬২-৬৩।
২২৪. রামচরিত, পৃ. ৩০, ৫৪-৫৭।
২২৫ অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, পৃ. ১১৫।
২২৬. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৫৮।
২২৭. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ২৬।
২২৮. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৭০, পৃ. ৫৫৮।
২২৯. বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৯।
২৩০. বল্লালচরিত, পৃ. ৫৫।
২৩১. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃ. ৯৮।
২৩২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৭২-২৭৬।
২৩৩. বল্লালচরিত, পৃ. ১০০।
২৩৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৫১।
২৩৫. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৮৭, পৃ. ১৮৮।
২৩৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), পৃ. ২৪১-২৪৩।
২৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
২৩৮. এ এম. চৌধুরী, ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (সি: ৭০০-১২০০ এ ডি.) পৃ. ২২৩।
২৩৯ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, শ্লোক নং ৭, ব্যারাকপুর তাম্রলিপি, পৃ. ৬২, ৬৫।
২৪০. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।
২৪১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, (কলিকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৭৩), পৃ. ৯০।
২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।
২৪৩. ,, পৃ. ৯১-৯৩।
২৪৪. ,, পৃ. ১০১-১০২।
২৪৫. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭), পৃ.৩৫৬।
২৪৬. এন কুণ্ড, কাস্ট অ্যান্ড ক্লাস ইন প্রি-মুসলিম বেঙ্গল, লন্ডন ইউনিভারসিটি পি-এইচ.ডি. থিসিস, ১৯৬৩, পৃ. ১৬৭-১৯০ ; উদ্ধৃত : এ এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।
২৪৭. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।
২৪৮. বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, পৃ. ১০৩।
২৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।
২৫০. এ.এম. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।
২৫১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিস্ট্রি অফ অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল, (কলিকাতা : জি. ভরদ্বাজ, ১৯৭১), পৃ. ৪৬৯-৪৮১ ; আর.সি মজুমদার (সম্পা.), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১ পৃ. ৬২৩-৬৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়

সেনযুগে বাংলার ধর্মীয় জীবন

ক. লৌকিক ধর্ম

মানবজীবনের এবং সমাজজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইতেছে ধর্মীয় জীবন। আবার ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা ধর্মীয় জীবন জটিলতায় পূর্ণ। কারণ ইহার পশ্চাতে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধ্যান কল্পনা জড়িত থাকে। কাল ও সময়ের বিবর্তনে ইহার রূপও পরিবর্তিত হয়। তাই বিভিন্ন আবর্তন-বিবর্তনের সমন্বয়ে সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া ইহা সমসাময়িককালের রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। প্রাচীনকালের যত ধর্মবিশ্বাস রহিয়াছে তাহাতে এই ধরনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ ছিল এই রকমের ধর্মীয় উত্তরাধিকারের একটি দেশ। এখানে ছিল ধর্ম-কর্ম-ভাবনা ও সংস্কার, বর্ণ, শ্রেণী ও কোম ভিত্তিক সমাজ। সময়ের স্রোতধারায় ইহারও বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। আবার বর্তমান সময়েও আমাদেব সমাজে ইহার প্রভাব কম নয়। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন :

> সন্ধ্যে হলে আজও আমরা তুলসীতলায় পিদিম জ্বালি, মারী-মড়কে মা-শীতলার পূজা দিই, পালে পার্বণে উৎসবের, আঙিনায় আম্রপল্লবের চিত্র বিচিত্র ঘট সাজাই, মা-ঠাকুরমার কাছে মাথা পেতে ধান-দুর্বোর আশীর্বাদ নিই। প্রাচীন বাংলার অধিবাসী মানুষের ভয়-ভাবনা, বিস্ময় আর বিশ্বাসের অনেক কিছুই আজও আমরা মনের মধ্যে পুষে রেখেছি। আমাদের অনেক ধ্যান-ধারণায় অনেক অভ্যাসে আজও জড়িয়ে আছে প্রাচীন বাঙালী সংস্কার আচ্ছন্ন মন। বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হল জনপদবদ্ধ প্রাচীন বাংলার আদিবাসীদের পুজোআর্চা, ভয়ভক্তি, বিশ্বাস, সংস্কারেরই ইতিহাস।[১]

তাই জটিল ধমীয় পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বাংলার প্রাচীন জনগণের মনের প্রতিচ্ছবিও অস্পষ্ট। ইহার পর বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন কোম, বিভিন্ন জনপদে পূজা অর্চনা হইত বিভিন্ন রকম। এই রকম ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমগ্রদেশে একটি বিচিত্র রূপের সমন্বয় দেখা দিয়াছিল। সেন আমলেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানেও দেখা দিয়াছিল আর্য-অনার্য ধর্ম-কর্ম-সাধনার সমন্বিত রূপ। মূলত আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কল্পনায় কালের বিচিত্র প্রবাহ মিশ্রিত হওয়ায় আদিরূপ হইতে তাহাও অনেকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল।

তাই আদিরূপ হইতে ভিন্নতর হইয়া আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলাদেশীয় রূপে রঞ্জিত হইয়াছে। কারণ প্রাচীন বাংলার তথা প্রাচীন বাঙালির ধর্মকর্ম যথা পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি জন ও কোমের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-কর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা প্রভৃতিও প্রাচীন জন ও কোম সমাজের ধর্মকর্মগত অনেক বিশ্বাস মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। আজও সাধারণত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত গাছপূজা ও ব্রতোৎসব, ইহাছাড়া নবান্ন উৎসব প্রভৃতি আদিবাসী কোম সমাজের উৎসব। তাই আদিবাসী কোম সমাজের ধর্মকর্মের চলমান রূপের আলোচনার মাধ্যমে প্রাচীন সেনযুগীয় বাংলার ধর্মকর্মগত ভয়-বিশ্বাসের আলোচনা শুরু করা যায়।

বিশেষ কোনো বৃক্ষ বিশেষ কোনো দেবতা বা দানবের অধিষ্ঠান স্থান হিসাবে বিবেচিত হইত। এই সকল বিশ্বাস অনার্য বা লৌকিক প্রভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে লৌকিক দেবতার অধিষ্ঠান, কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে লৌকিক দেবতার মন্দির বলা হয় না, থান বলা হয়। এই থানগুলি লোকালয় হইতে দূরে মাটি দ্বারা তৈয়ারি ও পর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার লোকায়ত বিধান হইল তিনদিকে দেওয়াল এবং দেবমূর্তির সম্মুখভাগ উন্মুক্ত। অন্যান্য শাস্ত্রীয় দেবতার জন্য পাকা বা ইটের মন্দির তৈয়ারি হইলেও লোকায়ত ঐতিহ্য অনুসারে ইহা মাটির দ্বারা নির্মিত হয়। গ্রামীণ রীতি অনুসারে এই থানগুলি সাধারণের জমির উপর, কোনো বড় গাছের নিচে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের অর্থ ও সামর্থ্যে নির্মিত হইয়া থাকে। সাধারণত দেবস্থান হইতে স্থান এবং স্থান হইতে থান শব্দ আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।[২] কিন্তু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এই মত সমর্থন করেন না। তাহার মতে, এই ধারণার পশ্চাতে সঙ্গত কোনো যুক্তি নাই। অবশ্য "থানা" হইতে থান শব্দ আসিতে পারে, থানা শব্দের অর্থ ঘাঁটি বা আস্তানাও বুঝাইয়া থাকে। অনেক স্থানে এই থানকে "মাড়ো" বলা হয়।[৩] যাহাই হউক, এই থানে মূর্তিরূপী দেবতার অবস্থান থাকুক বা নাই থাকুক, গ্রামবাসীরা তাহাকে ভয়ভক্তি করেন, তাহার নামে মানত করিয়া পশুপক্ষী বলি দিয়া থাকেন। আবার এই দেবতা কালী, ভৈরব বা ভৈরবী, বনদুর্গা বা চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও পরিচিত হন। তবে যে নামেই দেবতা পূজিত হন না কেন, ইহার পূজা প্রথমে ব্রাহ্মণ্য বিধানে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং এই সমাজে ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

এই থানের সঙ্গে ধ্বজ বা ধ্বজা পূজার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। প্রাচীনকালে ভারত তথা বাংলাদেশে এই পূজার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধ্বজা পূজা যথা : শক্রধ্বজা বা ইন্দ্রধ্বজা, তাম্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, হংসধ্বজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ইহাদের কোনো কোনোটির অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হইয়া অথবা এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের ধ্বংসের কারণেও ইহাদের অবলুপ্তি হইতে পারে। প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠীগণের

উৎসব "শক্রধ্বজা" তাহাদের প্রতিপত্তিনাশে ইহার বিলুপ্তি ঘটাইয়াছে। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী শক্রধ্বজা উৎসব বন্ধে শ্রেষ্ঠীদের প্রতিপত্তি নাশের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।[৪] আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোক হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়।

এখানে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে :

হে শক্রধ্বজ (ইন্দ্রপূজার জন্য প্রোথিত দণ্ড)
সম্প্রতি কোথায় সেই বৈশ্যদল, যাহারা মর্যাদা
দিবার জন্য তোমার পূজা আর্চা করিত।
এখনকার লোকেরা তোমাকে লাঙ্গল দণ্ড বা
গোবন্ধন স্তম্ভ রূপে ব্যবহার করিবে।[৫]

অপরদিকে সামন্ত বা সামন্তরাজগণও ইন্দ্রধ্বজা পূজার ভক্ত—অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উল্লেখ্য, ইহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক ও বাহক ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের মধ্যেও ইহার প্রভাব হ্রাস পায়।

ইহাছাড়া তাম্রধ্বজা, ময়ূর বা হংসধ্বজা প্রভৃতি আদিম পশুপক্ষীর পূজা ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক রূপকল্পনায় স্থানলাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন যথা : দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম প্রভৃতি। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও এই সকল আদিম কোমগত পূজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবেশের কথা বলিয়াছেন।[৬] অন্যদিকে এই সকল ধ্বজপূজা সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোমের মানুষদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত বলিয়া গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[৭]

লৌকিক দেবতার পূজার কেন্দ্র অনেক সময় গাছকে কেন্দ্র করিয়া হইত। এইগুলি সাধারণত গ্রামের বাহিরে থাকিত। এই সকল পূজাস্থান অনেক সময় তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে—ইহা ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে।[৮] এই গাছপূজার বিবরণও প্রাচীন সাহিত্যে বিরল নয়। বটবৃক্ষের পূজা সম্পর্কে কবি গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে :

হে বটবৃক্ষ, কুগ্রামে তোমার অবস্থান,
তোমাতে কুবেরই বাস করুন, আর লক্ষ্মীই
বাস করুন, মহিষমণ্ডীবৃত বলিয়াই পামর
জনের কুঠারাঘাত হইতে তোমার রক্ষা।[৯]

অশ্বত্থ বৃক্ষে ধর্মার্থীগণের তীর্থস্থান হিসাবে উল্লেখ করিয়া গোবর্ধন আচার্য আবার বলিতেছেন:

সৌরভামাত্র মনসামস্তাং মলয় দ্রুমস্যান বিশেষ
ধর্মার্থিনাং তথাপি স মৃগ্যঃ পূজার্থমশ্বত্থ।

সৌরভার্থীদের নিকট মলয়জ বৃক্ষের কোন পার্থক্য নাই, অর্থাৎ সব গাছই গন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের নিকট প্রত্যেক গাছের একই মূল্য, কিন্তু ধর্মার্থীরা পূজার জন্য অশ্বত্থ বৃক্ষই অন্বেষণ করিয়া থাকেন।[১০]

অপরদিকে শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষের গুণকীর্তন করিয়া বলা হইয়াছে :

সাক্ষান্নৈষ করোতি কামপি সুদং নাদৃত্য হন্ত্যাপদো
ন প্রীণাতি মণীষগণং শ্রবণ মশ্যাশ্বাসনাসুক্তি ভিঃ।
তস্যাম্ভোধিযুতাপতে উগ বতোধিষ্ঠান মাত্রাদসৌ
দুঃস্বপ্না- ম্নিনিবেদিতান পংরত্যশ্বত্থভূমিরুহঃ॥

এই অশ্বত্থবৃক্ষ সাক্ষাৎ কোনো আনন্দ দান করে না, আদব করিয়া (কাহারও)বিপদ দুর করে না, সান্ত্বনা বাক্যে মণীযিগণের কর্ণ তৃপ্ত করে না ; শুধু সেই ভগবান লক্ষ্মীপতির অধিষ্ঠান হেতুই সে দুঃস্বপ্নের কথা বলিলে তাহা নষ্ট করে।[১১]

ইহাছাড়াও সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের অপর একটি শ্লোকে লৌকিক পূজা-অর্চনার সুন্দর একটি বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে :

অসংখ্য পশু বলি দিয়া গ্রাম্য লোকেরা পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তার দূর্গার পূজা করে, বৃক্ষতলে ক্ষেত্রপালের পূজা করে এবং দিবস অন্তে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।[১২]

পণ্ডিত সুকুমার সেন সদুক্তিকর্ণামৃতের এই শ্লোকে উল্লেখিত "ববরা'শীলয়ন্তি" কথাগুলির মাধ্যমে এবং কবির ইঙ্গিত হইতে এই জাতীয় পূজাচার সমাজের নিচু স্তরেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করেন।[১৩]

সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এই প্রকারের বৃক্ষের পূজা উৎসব প্রচলিত ছিল, যেগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুজা-অর্চনার সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়াছিল, আবার ইহারা ছিল মূলত লোকায়ত বা লৌকিক ধর্ম হইতে আগত।

নানা ধরনের যাত্রাও ছিল প্রাচীন কোম সমাজের অন্যতম উৎসব। তাহাদের মধ্যে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রচলিত ছিল, ইহারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে। আজও হিন্দু ধর্মের অন্যতম উৎসব হিসাবে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ এই ধরনের ধর্মোৎসব খুব পছন্দ না করিলেও এই লোকায়ত উৎসব সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবিকে অনুভব করিয়াছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই লৌকিক প্রকাশকে অস্বীকার করিতে না পারিয়া স্বধর্মে স্থান করিয়া দিয়াছে।[১৪]

দোললীলা সম্পর্কে "পদ্মপুরাণে" উল্লেখ আছে যে,

দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলায়নং সকৃন্নরাঃ
দৃষ্টাপরাধীন চয়েমুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ।।

দোলে দোলায়মান দক্ষিণমুখ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে এবার দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে জনগণ সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়।[১৫]

বিশেষত "স্নানযাত্রা" প্রাচীন বাংলায় খুব বেশি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে অসংখ্যবার ইহার উল্লেখ আছে এবং গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্যের প্রকাশ বার বার করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের একস্থানে ঋষির উক্তির বর্ণনাচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছে :

যে কালে মানবের মন গঙ্গা দশনাথ ব্যাকুল হইবে, তখনই তথায় গমন করিবে এবং স্নাত হইয়া দেবতা, ঋষিগণ ও পিতৃলোকের অর্চনা করিবে। তথায় শুক্ল--বস্ত্র পরিধান করত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। গঙ্গা গমনকালে মৈথুন, কলহ ও হিংসা পরিহার করিবে এবং মলিন বসন গ্রহণপূর্বক ইষ্টদেব, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, দূর্গা, সরস্বতী, গো, ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা সকলকে বক্ষ্যমাণ বাক্যদ্বারা প্রণাম করিবে। গুরুগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দিকপালগণ, গ্রহগণ, ঋষিগণ, চারণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ দেবদেবীগণ আপনাদের সম্পর্কে আমি এক্ষণে প্রণাম করিতেছি ; আপনারা আমার এই গঙ্গাস্নান যাত্রায় সিদ্ধিদায়ক হউন।[১৬]

অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাস্নানের উপকারিতা বর্ণনা করিয়া বলা হইতেছে :

সেই গঙ্গায় যে ধারা স্বর্গ হইতে হিমালয় মার্গে ও পৃথিবী তলে পতিত হইয়া লবণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম অলকনন্দা,--তাঁহার জলরাশি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তিনি অত্যন্ত বেগবতী। তিনি পাপিগণের পাপরূপ শুষ্ক ইন্ধন দগ্ধ করিতে প্রজ্বলিত--পাবকরূপা। তিনি সগর বংশীয়দিগকে আশ্চর্য মুক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠগামী পুরুষগণের মার্গে সোপন শ্রেণী স্বরূপা।...পাপীপুরুষগণ দৈবযোগে প্রাক্তন কর্মফলে যদি গঙ্গা সলিলে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয় ; এবং তাহারা শিবের পরিষদশ্রেষ্ঠ হইয়া তাহার সমীপে বাস করে ও সেই মৎস্বরূপ পুরুষগণের প্রলয়কালেও মৃত্যু হয় না। মৃত ব্যক্তির শরীর যদি কোনক্রমে গঙ্গা সলিলে নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে লোমপরিমিত বৎসর শ্রীহরির মন্দিরে বাস করে।.... শুদ্ধ দিবসে স্নানের নিমিত্ত যে ব্যক্তি যাত্রা করিয়া সুরেশ্বরীজলে গমন করে সে পাদপ্রমাণ বৎসর বৈকুণ্ঠধামে সানন্দে বাস করে। যদি কোন পাপী ব্যক্তি অন্য কর্ম্মান্তরে গমন করিয়াও আনুষঙ্গিক গঙ্গাস্নান করে, সে যদি পুনর্বার পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়।[১৭]

গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য ও গঙ্গাস্নানের আচার-অনুষ্ঠান সমসাময়িক কবিতা শ্লোক সংকলন গ্রন্থগুলিতেও পুণ্যকর্ম বলিয়া গুরুত্ব পাইয়াছে। গঙ্গাকে অতি পবিত্র মনে করা হইয়া থাকে--ইহা শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত হইতেও অবগত হওয়া যায়।[১৮] ধোয়ীর পবনদূতেও

গঙ্গাস্নানের বিষয় এবং ইহার জন্য পুণ্য লাভের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[১৯] সুভাষিতরত্নকোষ সংকলন কোষ কাব্যে গঙ্গানদীর পবিত্রতা সম্পর্কে একাধিক শ্লোক রহিয়াছে। ইহার একটি শ্লোকে কবি মুরারী অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বলিতেছেন :

> এই সেই গঙ্গা যিনি পদ্ম হইতে উৎপন্ন দেবতার প্রসাদ হইতে আগত হইয়া সাগরে প্রবাহিত হইতেছেন। যিনি সৌভাগ্যশালী শিবের রাজমুকুটও অলংকৃত করেন। যিনি তীব্র স্রোতস্বিনী এবং যাহারা তাহাদের দেহ তাহার নিকট রাখিয়াছে সেইসব আত্মার পথ প্রদর্শন করিয়া স্রোতের বিপরীতে তাহাদের সরাসরি ব্রহ্মার স্বর্গের দিকে প্রবাহিত করিতেছেন।[২০]

সুতরাং বলা যায়, নদীতে স্নানযাত্রা প্রাচীন বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিশেষত গঙ্গাস্নান ছিল প্রাচীন বাঙালির নিকট ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে অতি পবিত্র আচার। সমসাময়িক উৎস আমাদেরকে এই ধারণাই প্রদান করিয়া থাকে।

আবার যাত্রা উৎসবের মতো ব্রতোৎসবের প্রচলন লোকায়ত ধর্ম হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এই ব্রতের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারিগণ ব্রত উৎসবকে নিজেদের উৎসব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে উল্লেখিত পতিত বা ব্রাত্যরাই ব্রতধর্ম পালন করিয়া পতিত হইয়াছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।[২১] সে যাহাই হউক, এই ব্রতোৎসব মূলত মেয়েদের ভিতরই বেশি প্রচলিত। অবশ্য কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রতও ছিল। কিন্তু নারী ব্রতের অধিকাংশই লোকায়ত ধর্ম হইতে আগত এবং গ্রাম্য কৃষিসমাজের গুহ্য যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা হইয়াছে।[২২] বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে আদিম কোম সমাজের দ্বারস্থ হইয়াছিল, অন্যদিকে সমাজের নিম্নতম স্তরের বৃহৎ মানবগোষ্ঠী কোম সমাজের মানুষ নিজনিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা লইয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। ইহার ফলেই আদিম কোম সমাজের অনেক আচার-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রতোৎসবও এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান, ইহা ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং অদ্যাবধি পালিত হইতেছে।[২৩] এই অগণিত ব্রতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি হইল : পুণ্য পুকুর ব্রত, শিবপূজা ব্রত, চম্পাচন্দন ব্রত, পৃথিবী পূজা ব্রত, গোকাল ব্রত, অশ্বত্থ পট ব্রত, হরিচরণ ব্রত, মধু সংক্রান্তি ব্রত, গুপ্তধন ব্রত, ধান গোছানো ব্রত, যাচাপান ব্রত, তেজোদর্শন ব্রত, থোয়াথুয়ি ব্রত, রণেত্রয়ো ব্রত, দশপুতুলের ব্রত, সন্ধ্যামণি ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, জয়মংগলের ব্রত, ভাদুরি ব্রত, তিলকুজারি ব্রত, ইতুপুজা ব্রত, যমপুকুর ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, তুষ্‌তষলি ব্রত, তারণ ব্রত, মাঘমণ্ড ব্রত, ইতুকুমার ব্রত, বসন্তরায় ও উত্তমকুমার ব্রত, সসপাতা ব্রত, নখছুটা ব্রত।

এইগুলি ছাড়াও আরও অনেক ব্রত বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের একান্ত অঙ্গ ছিল। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ইহার প্রমাণ দিয়া থাকে। জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থে বিভিন্ন ব্রতোৎসবের উল্লেখ আছে। সুখরাত্রি ব্রত, কোজাগর ব্রত, পাষাণ ব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত, আশোকাষ্টমী ব্রত, বৈশাখ পূর্ণিমা ব্রত, কৌমুদী ব্রত, যবস্তি ব্রত, একাদশী ব্রত প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য।[২৪] অপরদিকে বৃহদ্ধর্মপুরাণে[২৫] কোজাগরদি ব্রত, একাদশী ব্রত, দ্বাদশী ব্রত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে[২৬] পুণ্যক ব্রত, একাদশী ব্রত প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল ব্রত উৎসবের বর্ণনা হইতে তৎকালীন সমাজে ইহার প্রভাব ও পূজা-অর্চনার বিষয় অনুমান করা সম্ভব। তবে ইহাদের কোনটি তৎকালে কত বেশি প্রচলিত ছিল তাহা বলা যায় না।

বাংলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'ধর্মঠাকুর'। এই 'ধর্মঠাকুর' নামটির উদ্ভব লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। পণ্ডিত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে সূর্যের এক নাম ধর্ম বলিয়া মনে করেন।[২৭] কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য ইহা ঠিক নয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ তাহার মতে যমের এক নাম ধমরাজ হইলেও ধর্ম বলিতে সূর্য বুঝায় না।[২৮] অপরদিকে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্ম শব্দটি কুর্মবাচক প্রাচীন অষ্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ বলিয়া অনুমান করেন।[২৯] সুতরাং ধর্মঠাকুর শব্দটির উদ্ভব সম্পকে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার ফলে আমরা ইহার উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। তবে ইহার উদ্ভব যেভাবেই হউক না কেন এই ধর্মঠাকুর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, যথা : যাত্রাসিদ্ধি রায়, স্বরূপ রায়, বাঁকা রায়, চাঁদ রায়, ক্ষুদি রায়, সুন্দর রায়, কালু রায়, স্বরূপ নারায়ণ, বৃহদাক্ষ, মতিলাল, পুরন্দর প্রভৃতি। এই সকল নামের বিভিন্নতার কারণ হিসাবে গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বলিয়াছেন, "...গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণরা বাংলার বহু বিখ্যাত বা জনপ্রিয় অশাস্ত্রীয় দেবতাদের যেমন-বিষ্ণু বা শিব এবং ঐরূপ দেবীদেব-কালী, দূগা, পৌরাণিক চণ্ডী প্রভৃতি রূপভেদে বা সন্তান বলে প্রচার করে পৌরাণিক আভিজাত্য দিয়েছেন। ঠিক সেইরূপ ধর্মপূর্জার প্রাধান্য কালে এঁর ভক্তরা পল্লী অঞ্চলে পূজিত বিভিন্ন লৌকিক দেবতাদের ধর্মঠাকুর এবং লৌকিক দেবীদের ধর্মঠাকুরের শক্তি বা কামিনা বলে প্রচার করেন, কিন্তু পরেও ঐ সকল দেব-দেবীদের আদিনাম থেকে গিয়েছে।"[৩০] আবার এই অধিক নামে পরিচিত ধর্মঠাকুরকে ইতিপূর্বে বৌদ্ধধর্মের দেবতা বলিয়া মনে করা হইত। শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার 'ডিসকভারি অফ লিভিং বুড্‌ঢিজম্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে উপর্যুক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য এই মন্তব্য সম্পর্কে তিনি নিজেও কিছু সন্দিহান ছিলেন।[৩১] যাহাই হউক আধুনিক গবেষণায় ইহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় ধর্মঠাকুরকে মূলত প্রাক আর্য-আদিবাসী কোমের দেবতা এবং পরবর্তীতে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক নতুন ধর্মঠাকুরের উদ্ভবের কথা বলিয়াছেন।[৩২]

অপরদিকে ধর্মঠাকুর বর্তমানে কোন কোন স্থানে শিব ও বিষ্ণু রূপে পূজিত হইতেন, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা পূজিত হইতেছেন। এই ধর্মঠাকুরের পূজা তিনভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যথা ১. নিত্যপূজা ২. বারমতি পূজা, ৩. বাৎসরিক পূজা। নিত্যপূজা আড়ম্বর শূন্য, বারমতিপূজা বেশ কিছু অঞ্চলের সমষ্টিগত পূজা এবং বাৎসরিক পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তবে নিত্যপূজা মানৎ ধরনের কিছু হইলে বারমতি পূজা বিখ্যাত কোন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং বাৎসরিক পূজায় বহুবিধ বিধিবিধান পরিপালিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত পূজা বৈশাখি পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাকে দেউল

পূজাও বলা হয়।[৩৩] পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলায় ধর্মঠাকুরের পূজা অত্যন্ত বেশি হইত।[৩৪] এবং ধর্মঠাকুরের পূজারীদের বিশ্বাস তিনি কুষ্ঠরোগ নিরাময়কারী এবং বন্ধ্যানারীর পুত্র দান করেন।[৩৫] লোকায়ত বিধানে এই ধর্মপূজার অনুসারী প্রধানত ডোম সম্প্রদায়।[৩৬] অবশ্য কৈবত, শুঁড়ি, বাগ্‌দী, ধোপা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্মপূজার পুরোহিত আছে।[৩৭]

ধর্মঠাকুরের মতই অপর একটি পূজার নাম চড়কপূজা। ইহাকে বৌদ্ধধর্ম হইতে আগত বলিয়া অনুমান করা হয়।[৩৮] অন্যদিকে পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই প্রধানত এই চড়ক উৎসবকে পালন করিয়া থাকে।[৩৯] সুতরাং ইহাও সমাজের নিম্নস্তরের ধর্মানুষ্ঠান। অন্যদিকে চড়ক পূজায় পুরোহিতের দায়িত্বে যিনি থাকেন তাহাকে সন্ন্যাসী বলা হয়। আবার তাহার সহকারী কয়েকজন সন্ন্যাসী তাহাকে এই পূজা অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন। অবশ্য সহকারী সন্ন্যাসী কোচ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়ের হইলেও প্রধান সন্ন্যাসীর দায়িত্বে থাকেন একজন কোচ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। তবে সন্ন্যাসীর ব্রত দীক্ষা গ্রহণের সময় ক্ষৌরকার্য শেষে স্নান করিয়া গলায় উপবীত (সূত্রগুচ্ছ) ধারণ করিবার নিয়ম আছে।[৪০] এই পূজা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উদযাপিত হয়। মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরার পূজা এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে শিবের গাজন হিসাবেই পালিত হয়। আবার চড়ক পূজায় কুমীরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দোলা কাঁটা ও ছুরির উপর লম্ফ, বাণফোড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হইতে দোলা, দানোবরানো বা হাজরা পূজা প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। তবে সাধারণত শ্মাশানেই হাজরা পূজা বা দানোবারানো পুজা করা হয়। সমাজের ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের উপর বিশ্বাস হইতে এই পূজার উদ্ভব। অপর দিকে বাণফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা গ্রহণ এবং রক্তপাত ঘটানো প্রভৃতি প্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার সহিত সম্পর্কযুক্ত।[৪১] সুতরাং চড়ক পূজার অনুষ্ঠানটি পালন যেমন কঠিন, তেমনি ইহা প্রাচীন কোম সমাজের রীতিনীতির সহিত সম্পৃক্ত। ধর্মীয় সাক্ষ্য ও প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নিম্ন বর্ণ ও শ্রেণীর লোকসমাজে চড়ক পূজার প্রচলন ছিল।

চড়ক পূজার পর হোলি বা হোলক উৎসবের কথা আসিয়া যায়। ইহা ছিল কৃষি সমাজেরই পূজা এবং ফসল উৎপাদন কামনায় নরবলি যৌনলীলাময় নৃত্যগীত ছিল ইহার প্রধান অনুষ্ঠান, পরবর্তীতে নরবলীর স্থানে পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ স্থান পাইয়াছে। এই পূজার উদযাপন ঋতু বসন্ত আগমনকালে হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে কামিনীকুমার রায় সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন :

> দোল বা হোলি উৎসব এমনি এক সময় অনুষ্ঠিত হয়, যখন প্রকৃতিতে নবজীবনের সাড়া জাগে। শীতে কুয়াসাচ্ছন্ন জড়ভাব তখন থাকে না, ঋতুরাজ বসন্ত তাহার অপার সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া ধুলা-মাটির পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। দিকে দিকে বনে-উপবনে তখন একটা আনন্দের ধুম পড়িয়া যায়। গাছে গাছে কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের

কুহুতান, থাকিয়া থাকিয়া দক্ষিণ বায়ুর মরমর্ গান, মানুষের চিত্তে কেমন একটা উদাস ভাব আনিয়া দেয়।[৪২]

তবে এই হোলির সঙ্গে বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ ঝুলনের এবং ছল-চাতুরি ও আমোদ-প্রমোদ যুক্ত হইয়াছে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতক হইতে ষোড়শ শতক অবধি উত্তর ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের প্রচলন দেখা যায়। এই উৎসবে নৃত্যগীত, বাদ্য, জুগুপ্সিত উক্তি, যৌনময় অঙ্গভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনা করা হইত। চৈত্র মাসে অশোক ফুলের অবিরাম বষণের নিচে মদন ও রতির পূজা করা হইত। বাংলাদেশের ন্যায় উত্তর ভারতের সর্বত্রই এই উৎসব হইয়া থাকে। অপরদিকে জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া হোলি উৎসবের কথা নীহাররঞ্জন রায় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই ইহা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়াছেন। পরবর্তীতে মুসলমান শাসক আমীর-উমরাহবা ও হেরেমের মহিলারা হোলি উৎসবের দারুণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহা হইতেও ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় হোলি উৎসবকে মদনোৎসবে পরিণত হইবার কথা বলিয়াছেন।[৪৩]

আদিম কোম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা এবং ইহার সঙ্গে বিজড়িত আর একটি অনুষ্ঠান হইল নারী সমাজের বিশেষত বিধবা মহিলাদের অম্বুবাচী পারণ নামক রীতির পালন। এই রীতিতে সাধারণত তাহারা তিন অথবা সাতদিন কোন অগ্নিপক্ব খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকেন, মাটি খুড়েন না, আগুন স্পর্শ, রন্ধনাদি পর্যন্ত করেন না। এমন কি মাতা বসুধার শরীরে কোনো প্রকার আঘাত প্রদান হইতে তাহারা বিরত থাকেন। সম্ভবত মাতা বসুধার ঋতুপর্বের সময় তাহার অঙ্গে আঘাত প্রদান হইতে বিরত থাকাই ছিল এই অম্বুবাচী পারণ পালনের প্রধান উদ্দেশ্য।[৪৪]

এইগুলি ছাড়াও আদিবাসী কোম সমাজের ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাস হইতে উদ্ভূত বহু দেবদেবী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের দেবদেবীর আসন অধিকার করিয়া আছে—তাহাদের মধ্যে মনসাদেবীর উল্লেখ অগ্রগণ্য (প্লেট নং-৩, চিত্র নং-৩)। বাংলা, আসাম ও উড়িষায় মনসা দেবীর পূজা খুব বেশি হইয়া থাকে। এই পূজা আদিবাসী কোম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কারণ বাংলাদেশ প্রধানত জলাভূমির দেশ। এখানে অসংখ্য সর্পাদি বিদ্যমান থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই সর্প মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। মানুষ ভয়ে তাহাকে দেবতারূপে কল্পনা করিতে থাকে এবং তুষ্টি সাধনের জন্য পূজা শুরু করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে সর্পাঘাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে।[৪৫] এই ধরনের সর্পভীতিকর দৃশ্যও তৎকালীন সাহিত্যে ধৃত হইয়াছে, বিষবৈদ্য উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে : "ভাই বিষবৈদ্য, তোমার মুখোচ্চারিত মন্ত্রপূত ধুলি যাহাদের মস্তক নত করে, সেই সাপগুলি ছোট। এই সাপটি বৃদ্ধ, যাহার মস্তক তোমার মত গুণিগণাধ্যুষিত পৃথিবীতে বিচরণ সত্ত্বেও এতটুকু নম্রভাব ধারণ করে না।"[৪৬] অপর একটি শ্লোকে বলা হইতেছে : "হে প্রভু খঞ্জন, তুমি সর্পফেনায় আরোহণের অধ্যাবসায় ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। বন্দনাহ তোমা কর্তৃক আমাদিগকে যে ফল দেয়, তাহা না হউক, দৈববশে যদি প্রদীপ্ত গরল এই সর্প তোমাকে দংশন করে, তাহা হইলে বিশ্বদ্রষ্টা এই শরৎকাল নেত্রহীন হইবে।"[৪৭] সুতরাং এই সর্পভীতি তৎকালীন সমাজের মানুষকে তাহার পূজায় রত করিয়াছিল বলা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই সর্প বা মনসাদেবী আদি সমাজ হইতে কিভাবে উচ্চস্তরে বা ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল? বিস্তৃত পুরাণ কাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্পভয় এবং তাহাদের নিকট হইতে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপরোক্তভাবেই উচ্চতর ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এক জায়গায় এইভাবে বলা হইয়াছে যে, "জরৎকারী, জগদেগীরী, মনসা, সিদ্ধযোগীনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিক মাতা, বিষহরী এবং মহাজ্ঞানযুক্তা বিশ্বপূজ্য মনসাদেবীর পূজা কালে এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি পাঠ করে তাহার এবং তদ্বংশীয়ের সর্প হইতে ভয় হয় না। সর্পভয়যুক্ত শয্যাতে, সর্পসেবিত মন্দিরে সর্পদর্শনে বা সর্প কর্তৃক শরীর বেষ্টিত হইলে যদ্যপি এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে উক্ত সঙ্কটসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহার দর্শন মাত্রেই সর্পসমূহ পলায়ন করে। এই স্তোত্র ব্যক্তি দশ লক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়; সিদ্ধাস্তোত্র ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিতে পারে। মানুষ্য স্তোত্রের মহা সিদ্ধি বলে নাগসমূহ ভূষিত হইয়া নাগ বাহনে আরোহণ, নাগাসনে উপবেশন এবং নাগশয্যায় শয়ন করিতে সমর্থ হয়।[৪৮]

কিন্তু মনসার প্রতিমা পূজা একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই প্রচলিত ছিল। এই প্রতিমাগুলির প্রত্যেকটিতে মনসা দেবীর সহিত অনেকগুলি সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব-শিশু এবং একটি ফল ও কোনো কোনোটিতে একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি রহিয়াছে। আবার এইগুলি প্রত্যেকটি প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ইহার প্রত্নতাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করিয়া ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় "মনসা পূজা" পাল শাসনামলের প্রথমেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত ও পূজিত হইবার কথা বলিয়াছেন।[৪৯] কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হইবার পরও বহুকাল পর্যন্ত তাহাকে সুনির্দিষ্টরূপে রচনা করা হয় নাই, তাহা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫০] এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া পি. কে. মাইতি বলিয়াছেন যে, পাল-শাসনের সময়েই মনসাদেবীর পূজা বাংলাদেশে প্রচলন হয় এবং ১৫ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে তাহা গৃহীত হইয়াছিল।[৫১] সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে মনসা পূজার বহুল প্রচলন হইতেই ইহার জনপ্রিয়তাব কথা অনুমান করা যায়। এই অনুমানের পক্ষে জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থের সমর্থন রহিয়াছে।[৫২] অন্যদিকে মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে রচিত অসংখ্য মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা পূজার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত তথ্যের বিশ্লেষণপূর্বক ড. শাহানারা হোসেন বলিয়াছেন যে, মনসা পূজা প্রথমত নিম্নশ্রেণীর মানুষেব মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং সেখান হইতে উচ্চশ্রেণীর নারী তথা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হইয়াছে।[৫৩]

মনসার পরই উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী, তিনি মনসার মতই সর্ববিষমোরূপিণী এবং তিনি শবর কুমারী রূপিণী ছিলেন। আর জাঙ্গুলী বিষবিদ্যা বলিয়া বিষবৈদ্যের নাম জাঙ্গুলিক বা জাঙ্গলিক। পরবর্তীতে জাঙ্গুলী মনসার সহিত গিয়া মনসার জাগুলি হইয়াছে।[৫৪] অপরদিকে মনসার মত জাঙ্গুলীকে বিদ্যাধরী সরস্বতী বলিয়া কল্পনা কর হইয়াছে, এবং জাঙ্গুলী ও মনসা একই দেবী হিসাবেও বর্ণনা করা হইয়াছে।[৫৫] কিন্তু বৌদ্ধদেবী হিসাবে মহাযান ধর্মের অন্যতম দেবী জাঙ্গুলীব অপরিসীম প্রতিপত্তি ছিল। এমনই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরী

তারা আর্য জাঙ্গুলীর রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহারই প্রতিফলন পরবর্তীকালের মনসামঙ্গল কাব্যে ধরা পড়িয়াছে। ইহা হইতে জাঙ্গুলী দেবীর প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।[৫৬]

কোম সমাজের আদিবাসী মানুষের আরাধ্যা দেবী "পর্ণশবরী" বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম ও বৃক্ষপত্র পরিহিতা, যৌবনরূপিণী, বজ্রকুণ্ডলধারিণী এবং তিনি প্রথমে শবরীদের দেবী ছিলেন। এই শবররা বৌদ্ধ ধর্মে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া ছিল।[৫৭] চর্যাগীতির একাধিক গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্ণশবরীর ধ্যানকল্পনার সুন্দর প্রতীক হিসাবে একটি গীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, শবরপাদ বলিতেছেন :

উঞ্চা উঞ্চা পর্বত তঁহি বসই সবরীবালী।
মোবঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সন্দারী॥
নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সরবী এ বণ হিড্ড হিণ্ডই কর্ণ্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িল সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ গইবামণি দেরী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক পুঁঞ্চআ বিন্ধণি অমণে বার্ণে।
একে সরসন্ধার্ণে নিন্ধই নিন্ধহ পরবা নিবার্ণে॥
উমত সবরো গরুআ রোমে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সহরো লোড়িব কইসে॥

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত শবরী গলায় গুঞ্জরী মালিকা॥ উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, না করিস গোল, দোহাই তোর। নিজ ঘরণী নামে (ও হল) সহজ সুন্দরী॥ নানা তরুবর মুকুলিত হল, গগনে লাগল ডাল। একথা শবর এ-বনে চোঁড়ে, কর্ণে কুণ্ডল বজ্রধারী॥ ত্রিধাতু খাট পাতল শবর, মহাসুখে শয্যাছাইল। শবর ভুজঙ্গ, নৈরাত্মা দারী, প্রেমে রাত পোহাল। চিত্ত-তাম্বুল মহাসুখে কর্পূর খায়। শূণ্য নৈরাত্মাকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত পোহায়॥ গুরুবাক-ধনুকে বিদ্ধকর নিজমন বানের দ্বারা। এক শরসন্ধানে বিদ্ধকর, বিদ্ধকর পরম নির্বাণকে॥ গুরুরোষে শবর উন্মত্ত। গিরিবর শিখর সন্ধিতে প্রবেশ করে, শবর লড়বে কিরূপে।[৫৮]

অপরদিকে পাহাড়পুরের পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে শবরদের জীবনের নানা ধরনের প্রতিচ্ছবি হইতে তৎকালীন বাংলার জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার ইহা হইতে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় উত্তর-পশ্চিম বাংলার শবর

জাতির হিন্দুধর্মে নিম্নতম স্তরভুক্ত হইবার কথা বলিয়াছেন।[৫৯] আর ইহাদের পূজা শাবরোৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এককালে বহুল প্রচলিত ছিল। ইহাতে নগ্ন অবস্থায় বৃক্ষপত্র জড়াইয়া, সমস্ত শরীরে কাদা মাখিয়া যৌন লীলাময় অঙ্গভঙ্গি করিয়া গান গাওয়া হইত। কুমারী, বারবধূ, বাদ্যভাণ্ড ও অশ্লীল নৃত্য আমোদপ্রমোদও ইহার অঙ্গ ছিল।[৬০] আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে :

নীত্বাগারং রজনী জাগরমেকং চ সাদরংদত্ত্বা।
আচিরেণ কৈর্ণতরু ণৈ দুর্গা পত্রীব মুক্তাসি।।

গৃহে লইয়া গিয়া একরাত্রির জন্যে জাগরণ করিয়া সমাদর দেখাইয়া
কোন্ তরুণেরা তোমাকে দুগাপত্রীর মত অচিরে, না বিসর্জন দেয়?[৬১]

উল্লেখ্য যে, এই উৎসব ছিল তরুণদের আনন্দ উৎসব। অবশ্য বর্তমানে ইহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

লৌকিক ধর্ম হতে আগত লক্ষ্মীপূজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। লক্ষ্মীদেবী ছিলেন শস্যপ্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। এই সম্পর্কে আযাসপ্তশতীর একটি শ্লোক হইতে জানা যায়, নায়ক তাহার নায়িকাকে বলিতেছে :

আয়াতি যাতি খেদং করোতি মধুহরতি মধুকরী বান্যা।
অধিদেবতা ত্বমেব শ্রীরিব কমলস্য মম মনসঃ।

মধুকরীর মত অপরা আসে, যায়, গুন গুন করে এবং মধু পান করে মাত্র ;
লক্ষ্মীর মত তুমিই আমার মানস কমলের অধিদেবতা।[৬২]

এখানে দেবতা কমলাসনা লক্ষ্মীর কথা বলা হইয়াছে। এই লক্ষ্মী আবার চঞ্চলা। আজ যাহাকে কারুণ্যদান করেন, কাল তাহাকে ত্যাগ করেন। এই লক্ষ্মীপূজার ধরনটি ছিল লৌকিক ধরনের, কিন্তু ক্রমশ ইহা পৌরাণিক লক্ষ্মীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এই পৌরাণিক লক্ষ্মীপূজাও ছিল প্রাচীন কোম সমাজেরই পূজা। এই সম্পর্কে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলিতেছেন, "সংসারে কেবল জিৎ হয় না—হারজিৎ আছেই আছে। আবার বাড়া ভাতে ছাইও পড়ে। চঞ্চল আশা—সুখ-দুঃখের বাসা—সংসারটা যেন পাশার তামাসা।

মা কমলা বড়ই চঞ্চলা। ...মায়ের এই চঞ্চলতার হেঁচকা টানে কাতর হয় না, তাহাকেই মা লক্ষ্মী অক্ষয় বর প্রদান করেন। যে সম্পদে-বিপদে, আশায়-নিরাশায় পুরুস্কার ছাড়িয়া দেয় না-যে শোক-মোহের নিশীথেও জাগ্রত থাকে-অবসন্ন হয় না-সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র।"[৬৩] তাই শারদীয়া কোজাগর উৎসবের কথা লিখিতে গিয়া নীহাররঞ্জন রায় বলিতেছেন, "বস্তুত, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোন সম্পর্কই ছিল না।"[৬৪] কিন্তু অক্ষক্রীড়া ও জাগরণ দিয়া যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উদযাপিত হইত তাহাও আর্যাসপ্তশতীর অপর একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে :

ভাগ্যবানেরা (পদ্মাঃ) পত্র নির্মিত কপাট

দেওয়া ঘরে সুখে নিদ্রা যায় ; ওহে ধূর্ত
দ্যুতক্রীড়ক, জাগরণ দ্বারা কতক্ষণ লক্ষ্মীকে
রক্ষা করা যায়।[৬৫]

সুতরাং বলা সম্ভব যে, আদি কোম সমাজের লক্ষ্মীদেবী পৌরাণিক সাজে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাক-আর্য বাঙালির ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের এই সকল বিবরণ হইতে অনুমতি হয় যে, প্রাচীন বাংলার (আদিকোম) মানুষের ভয়ভক্তি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, বাঙালি নারী এবং ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের মধ্যে লৌকিক অনুষ্ঠানের যে প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তাহা সকলই আদি কোম সমাজেরই দান। বিশেষত ভূত-প্রেতবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস, প্রজননশক্তি ও যাদুশক্তিতে বিশ্বাস প্রভৃতি আদিবাসী কোম সমাজের বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই আদিম কোম সমাজের ধর্মকর্ম সাধনার উপরই বাংলায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই এই সকল ধর্মে প্রাচীন কোম সমাজের ধ্যান-ধারণা আজও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পূজা পদ্ধতিতে মিশ্রিত হইয়া আছে।

খ. বৌদ্ধধর্ম

খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর ইহার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৌদ্ধধমাবলম্বী পাল রাজন্যবগ বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপরিপোষক ছিলেন। কিন্তু তাহাদের আনুকূল্য ব্রাহ্মণ্যধমের প্রভাব খুব একটা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া পালরাজগণ মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পালশাসনামলেই মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের যে বিবর্তন হয় সে বিবর্তনের ফলে বৌদ্ধধর্মের আদি প্রকৃতি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয় এবং বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও কমিয়া যায় এবং সামাজিক আচার-আচরণে গৃহী বৌদ্ধের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের বড় একটা পার্থক্য থাকে না। পাল আমলের লিপিমালায়ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে ধর্মপালের খালিমপুরলিপি, নারায়ণপালের বাদলস্তম্ভলিপি এবং বৈদ্যদেবের কমৌলী লিপির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্পর্কে বাদল স্তম্ভলিপির কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিগ্রহপাল একজন বৌদ্ধ নরপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, "তাহার (হোম কুণ্ডোত্থিত) অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত।"[৬৬] বৈদ্যদেবের কমৌলী লিপিতে তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতাচরণের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৬৭] এই লিপিতে আরও উল্লেখ আছে, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠিব সকল পণ্ডিতের অগ্রণী হিসাবে বিবেচিত হইতেন। তিনি "শাস্ত্রজ্ঞান পরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়তের

সমুজ্জ্বল যশোনিধি" ছিলেন।[৬৮] নয়পালদেবের শাসন সময়ের প্রস্তরলিপিতে গয়াধামে দ্বিজগণের বেদাভ্যাস ও সেখানে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইবার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৬৯] এবং অপর একস্থানে শূদ্রককে মুরারি ও লক্ষ্মীদেবীর সহিত তুলনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট আনন্দ বর্দ্ধনার্থে অনন্যকর্মা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৭০] অপরদিকে নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতে বেদবিদ্, বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণদের বিবিধ সুবিধা লাভের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৭১] তাহার রাজত্বকালে গরুড় স্তম্ভে গরুড় মূর্তি স্থাপনের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৭২] এই স্তম্ভগাত্রে বাদল প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই লিপিতে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পরিবারের উল্লেখ আছে। শাণ্ডিল্য বংশীয় ব্রাহ্মণ গর্গ পরিবারভুক্ত দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, গুরুবমিশ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া পাল রাজাদের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন।[৭৩] ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে নন্ননারায়ণ দেবতার মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৪] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এই নন্ন-নারায়ণকে নন্দনারায়ণের অপভ্রংশ হিসাবে অনুমান করিয়া এই মন্দিরে নন্দ-দুলাল কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার বিষয় বলিয়াছেন।[৭৫] অন্যদিকে পাল রাজাদের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীও একজন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[৭৬]

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্মীয় পালরাজগণ ধর্মীয় উদারনীতি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদান ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সহায়তা করিয়াছেন। অবশ্য তাহাদের ধর্মীয় নীতি সমসাময়িক ধর্মীয় অবস্থার দ্বারাও নিশ্চয় প্রভাবিত হইয়াছিল। এই সময় সভাকবি, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পদে হিন্দুরাই প্রাধান্য অর্জন করে। বৌদ্ধরাজাদের লিপিতে পৌরাণিক মতবাদ উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সমস্ত সাক্ষ্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের প্রতি সম্প্রীতিসুলভ আচরণের এবং তৎকালীন বাংলার ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দুধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রমাণ। এই সকল কার্যকলাপে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি বৌদ্ধরাজন্যবর্গের আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব তৎকালীন সমাজে নিশ্চয়ই বেশি ছিল এবং রাষ্ট্র ও প্রশাসনে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। এইজন্য বৌদ্ধ রাজগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রগাঢ় ছাপ পড়িয়াছে। এখানে এই ঐতিহাসিক তথ্যও তাৎপর্যপূর্ণ যে পাল নৃপতিগণের অনেকেরই পত্নী ছিলেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয় রাজকুমারী। ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী রাজপরিবারের কন্যাগণ পাল রাজমহিষীরূপে স্বামীদের ধর্মীয় নীতিকে স্বাভাবিক নিয়মেই নিশ্চয় প্রভাবিত করিয়াছেন।[৭৭]

পাল শাসনের শেষপর্বে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী সম্পর্কেও অসংখ্য শ্লোক রচিত হইয়াছে। সুভাষিতরত্নকোষ কাব্যে ১২২টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলি মূলত সম্ভুর প্রশংসাসূচক, শম্ভুর অনুগ্রহে পাপমোচন, বাঙালি হিন্দুর গঙ্গাভক্তি, শিবের রাজমুকুট হিসাবে গঙ্গার অবস্থান, রাধাকৃষ্ণের বন্দনা, হরিরূপ কৃষ্ণের সহিত রাধার লীলা, সূর্যের প্রশংসা, ও সূর্যের বন্দনা[৭৮] বিষয়ক অসংখ্য শ্লোক রচিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া তৎকালীন সময়ের অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব মূর্তির সংখ্যাই অধিক। বৈষ্ণব পরিবারের প্রধান বিষ্ণু স্বয়ং ; তাহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী

ও সরস্বতী নামক দুই পত্নী ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছেন দেবী বসুমতী, নিম্নে গরুড় বাহন। এই সময়ের শৈব মূর্তিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। লিঙ্গরূপী শিব এবং লিঙ্গ সাধারণভাবে একমুখ বিশিষ্ট হইত। একমুখ লিঙ্গ শিব প্রতিমা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য চতুর্মুখ লিঙ্গও পাওয়া গিয়াছে। শাক্তধর্মের সকল মূর্তিই যুক্ত থাকিবার বিষয় পুরাণে উল্লেখিত হইলেও শিবের বিভিন্ন রূপিনী শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল এবং এই রূপেই তাহারা পূজিত হইতেন। সূর্য মূর্তিও যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে উদীচ্য ইরাণী ধ্যান কল্পনা বেশি হইলে সূর্য দেবতার ধ্যানে ব্যাখ্যায় সম্ভবত বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যান–কল্পনা এক সূত্রে মিলিয়া গিয়াছে।[৭৯]

পাল যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী শাখার ধর্মীয় আচার প্রথাকেও প্রভাবিত করে।[৮০] অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রতাপও রাজ পৃষ্ঠপরিপোষকতার কারণে কম ছিল না। তারানাথ পাল রাজা ধর্মপালের পঞ্চাশটি বিহার নির্মাণের বিষয় উল্লেখ হইতে তাহা অনুধাবন করা যায়।[৮১] অন্যদিকে এই সময়ই আবার বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা তান্ত্রিকতার ছোঁয়ায় প্রভাবিত হইয়া পড়ে এবং ইহা ঈশ্বর দর্শনবাদী ধর্মের আকার ধারণ করে ও ইহাকে মণ্ডল, ক্রিয়া প্রভৃতি গ্রাস করে।

পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে প্রভাবিত মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান ধর্মমতে ব্যবহারিক আনুষ্ঠানিকতা কমিয়া যৌগিক রীতিনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই সময় লৌকিক বা লোকোত্তর বুদ্ধকে অস্বীকার করা হয় ; প্রব্রজ্যা, বিনয় শাসন নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইল। দেহকেন্দ্রিক যৌগিক রীতি সম্বলিত এই নূতন বৌদ্ধমতের নাম হইল “হঠযোগ।”[৮২] অপরদিকে বাংলার ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও অনুরূপ বিবর্তন দেখা দিয়াছিল। ফলে এই দুই ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকিল না এবং ইহাদের মিলনও সহজ হইয়া উঠিল। তখন হইতেই স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধতন্ত্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বিলীন শুরু হইল। ইহা হইতে কৌল, নাথ, অবধূত, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[৮৩] এই ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব পাল শাসনামলের শেষ দিক হইতে শুরু হয় এবং ইহা চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ণ পবিণতি লাভ করে।

অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী সিদ্ধাচার্যগণ সপ্তম–অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ–দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে আবির্ভূত হন। তাহারা এদেশের তৎকালীন বেদচর্চা, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা প্রায়শই করিয়াছেন। সরহপাদের একটি দোহায় ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বলিতেছেন :

বহ্মণ্যে হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এ বই পড়িঅউ এ চ্চউবেউ।
মট্টী (পাণী কুস লই পড়ন্ত
ঘরহি বইসী) আগ্‌গি হুণন্তঁ।

কজ্জে বিবহিঅ হুঅবহ হোমেঁ
অকখি উহাবিঅ কুড়এঁ ধুমেঁ।

ব্রাহ্মণেরা সত্যকার ভেদ জানে না ; এইভাবেই চতুর্বেদ পঠিত হয়। তাহারা মাটি–জল–কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয় ; কার্য বিরহিত (ফলহীন) অগ্নি–হোমের ফলে শুধু কটু ধুমের দ্বারা চোখ শুধু পীড়িত হয়।[৮৪]

তাহারা বেদ ধর্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তাহাদের গীতে বেদ আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাদের দৃষ্টিতে এইগুলি সঠিক বেদ ছিল না। অথচ ব্রাহ্মণগণ ইহাই তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য হিসাবে ব্যবহার করিতেন। তাই সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। যেমন :

জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেএঁ বখানী॥

যাহার (সে সহজ স্বরূপের) বণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না, তাহা কিরূপে আগম বেদে ব্যাখ্যাত হইবে?[৮৫]

সুতরাং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতদের প্রতি সিদ্ধাচার্যদের মনোভাব ছিল তীব্র সমালোচনামূলক।

সেন আমল এবং তাহার কিছু পূর্বকাল হইতেই তান্ত্রিক কাপালিক ধর্মেরও বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সহজিয়াগণও কাপালিক যোগী হইতেন। কাহ্নপাদ নিজেই একজন কাপালী যোগী ছিলেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাহার একটি চর্যায় কাপালীদের উল্লেখ একাধিকবার করা হইয়াছে :

আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালী জোই লাঙ্গ॥

....

তু লো ডোম্বী হাঁউ কাপালী
তোহোর অন্তবে মোএ ঘলিল হাড়েরি মালী॥

আলো ডোম্বী, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ,—এইজন্য নিঘৃণ কাহ্ন হইয়াছে নগ্ন কাপালী, যোগী।...তুই হইতেছিস ডোম্বী, আমি কাপালী, তোর জন্য আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা।[৮৬]

অন্য একটি গীতে কাহ্নপাদ বলিতেছেন :

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে
অনহা ডমরু বাজাই ধীরনাদে॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পাইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ॥

আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥
রাগদ্বেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার॥
মারিঅ সাধু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী॥

নাড়ী শক্তি খাটে দৃঢ় করিয়া ধবা হইল ; অনহত ডমুর বীরনাদে বাজে কাহ্ন কাপালী যোগী আচারে প্রবেশ করিল, এবং দেবনগরী একাকারে বিহার করে। আলি কালি ঘণ্টা ও নূপুর তাহার চরণে, রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণ করিল। রাগদ্বেষ মোহেব ছাই লইয়া সে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লভে। ঘরে শাশুড়ী ননদ শালীকে মারিয়া কাহ্ন কাপালী হইল।[৮৭]

সুতরাং এই সকল বর্ণনা হইতে বলা সম্ভব যে, পাল শাসনামলের শেষ পর্ব হইতে বাংলার জনপ্রিয় মতবাদ সহজিয়া ধর্ম মানুষের সহজযান অবলম্বনের কথাই প্রচার করিয়াছিল। তৎকালীন সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। তাহাদের ধ্যান-ধারণাগুলি দোহা ও চর্যাপদের মাধ্যমে জনগণেব মধ্যে প্রচার করিতেন।

অপরদিকে সেনামলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়কালেও বৌদ্ধ দেবালয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আসন করিয়া লইয়াছিল। এই সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলিযাছেন: "নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে মন্দিরে দেখিতেছি, শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রভৃতিরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গে পূজা পাইতেছেন। বাঙলার সোমপুর ও অন্যান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ অনুমানে কিছু বাধা নাই। ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধমের ঔদার্য এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধমের সমন্বয়-ভাবনা বেশ কিছুটা সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকাব করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতেছিলেন এবং বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের লোকায়তন চিবকালই অনেক বেশি সমৃদ্ধতর। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাঙ্গীকরণ শক্তিও বৌদ্ধধর্মের চেয়ে ববাববই ছিল বেশি। অন্যদিকে পাল আমলের শেষ দিক হইতেই নালন্দা মহাবিহারের অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল ; জনসাধারণের ভিতর, বিশেষভাবে উচ্চ ও মধ্যস্তরে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। বিহার ও বাংলাদেশের অন্যান্য বিহারে-সংঘারামেও বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও উচ্চ ও মধ্যকোটির লোকদের অনুদার দৃষ্টি এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সক্রিয় পোষকতা, এই দু'য়ের ফলে বৌদ্ধধর্মের ক্রমসংকুচীয়মান অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়।"[৮৮]

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর পালবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে এবং নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসনকালে বাংলার ধর্মীয় জগতে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশিষ্ট

স্থান দখল করিয়াছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মেরও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং এই সময় বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অপরদিকে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেনরাজগণের বাংলার শাসন–ক্ষমতা দখল পাল আমলের ক্রমবর্ধমান ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাব প্রবল করিয়াছিল। বস্তুত বাংলার শাসনক্ষমতায় সেনদের আবির্ভাব বাংলার ধর্ম ও সামাজিক জীবনে একটি নূতন যুগের সূচনা করে। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা রাজকীয় আক্রোশে পতিত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিনষ্ট হয়। এই সম্পর্কে ট্রেভর লিং বলিয়াছেন যে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান ও সেনদের রাজক্ষমতা গ্রহণ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ঘটাইয়াছে। তিনি আরও বলিতেছেন যে, দাক্ষিণাত্য হইতে আগত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুসারী সেনরাজন্যবর্গ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ আশা কার যায় না।[৮৯] অন্যদিকে বৌদ্ধদের প্রতি হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীও বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। বিশেষত পাল আমলের উদার ধর্মীয় নীতি এই সময় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তৎকালীন তাম্রশাসনগুলিতেও ইহার প্রতিফলন পড়িয়াছে। দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার বর্মণ বংশের রাজা ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রলিপির ৫ নং শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "ত্রয়ী বেদবিদ্যাই পুরুষের প্রকৃত পরিধেয়। তাঁহার অভাব ছিল না বলিয়া অনগ্না অপিচ বেদবিদ্যা সংযুক্ত বলিয়া বৌদ্ধ ক্ষপণকাদি হইতে বিভিন্ন, বেদচর্চায় এবং অদ্ভুত সমরক্রীড়ায় অনুরাগবশত যে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইত, তাহাতেই (বর্মিণঃ) বর্ম্মাবৃত কলেবর বলিয়া প্রতিভাত।"[৯০] সুতরাং এই উক্তিতে বৈদিক ধর্মকে প্রশংসা, অন্যধর্ম বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। অপরদিকে হরিবমণের মন্ত্রী ভট্টভবদেব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং তিনিও বৌদ্ধধমের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সমাজে বৈদিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে তিনি তৌতাতিতমততিলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে তিনি বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধাদি–গ্রন্থের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।[৯১] কারণ তাহাকে "বৌদ্ধাম্ভোনিধি কুম্ভসম্ভবমনিঃ পাষণ্ডবৈতাণ্ডিক–প্রজ্ঞাখণ্ডন পণ্ডিতোয়মবনৌ সবজ্ঞ–লীলায়তে" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৯২] এই প্রসঙ্গে সেনরাজ বল্লাল সেনের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি তাহার দান– সাগর গ্রন্থটি ভণ্ড, পাষণ্ড প্রভৃতি বিরোধী ধর্মাবলম্বীগণের প্রভাব হইতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্যই রচনা করেন বলিয়াছেন।[৯৩] তিনি পুরাণকে প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকার করিলেও পাষণ্ড শাস্ত্রের অনুমোদন লাভকারী পুরাণকে অগ্রাহ্য করেন। এই কারণেই পাষণ্ড বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কর্তৃক তান্ত্রিক আচার–ব্যবহার সমন্বিত দেবীপুরাণকে ধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসাবেও গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার "দানসাগর" গ্রন্থে নিজেই বলিয়াছেন যে, পুরাণ ও উপপুরাণের সংখ্যা হইতে বহির্গত পাপকর্মযুক্ত পাষণ্ড শাস্ত্র অনুমোদিত দেবীপুরাণ এখানে নিবদ্ধ হয় নাই।[৯৪]

ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী পাষণ্ডদের সঙ্গে সকল প্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ এমনকি পাষণ্ডগণের সঙ্গে আলাপাদি করিতেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন।[৯৫] কারণ পাষণ্ডগণ বেদের বিপরীতে ধর্ম

উপদেশ দিয়া থাকেন। এই পাষণ্ড ব্যক্তিগণ বৈদিককর্মের অনুষ্ঠান করেন না এবং নাস্তিকগণ ধর্মবিরুদ্ধ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। আর এইজন্য তাহার নির্দেশ হইল যে, পাষণ্ডগণের সঙ্গে ভাষণাদি করিলে উপবাস করিয়া জপ করা উচিত।[৯৬] এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার এই দানসাগর গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন যে, শ্রী ও সরস্বতী পরিবৃত কলিযুগের "বল্লালসেন" নামক প্রত্যক্ষ নারায়ণের আবির্ভাবই ঘটিয়াছিল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য এবং নাস্তিকদের উচ্ছেদের জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৭]

অপরদিকে কিন্তু রাজা লক্ষ্মণসেন পিতা বল্লালসেনের মতো এতটা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার তপণদীঘি তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে "বৌদ্ধ বিহারের" উল্লেখ আছে।[৯৮] তাই ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তৎকালীন সমাজেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। অথচ ইহাও বেশি গুরুত্ববহ নয়। সুতরাং পূর্বের উল্লেখসমূহ হইতে বলা সম্ভব যে, সেনরাজবংশীয়দের শাসনামলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয়ভাবে নিন্দিত হইয়াছিল। তবে সেনরাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম অনাদৃত এবং সেনরাজগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই ঠিকই, কিন্তু তখনও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না। সমসাময়িক সাহিত্যে ইহার স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। আর্যাসপ্তশতীর একাধিক শ্লোকে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধদের অস্তিত্বের কথা জানা যায় এবং একাধিকবার ক্ষণিক বৌদ্ধবাদের উল্লেখ আছে। এমন একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, নায়কের প্রতি নায়িকার দূতী প্রসঙ্গে :

> আপনি বহুবল্লভ, বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদের মতো আপনার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে ভংগুর। কিন্তু তাহার (নায়িকার) মৈত্রী বহু ভঙ্গা ভ্রুভঙ্গের মতো অবিচ্ছিন্ন।[৯৯]

অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতারও সংক্ষিপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্মণ রাজবংশের রাজা স্যামল বর্মণের বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, রাজা ভীমদেবকে প্রজ্ঞাপারমিতা ও অন্যান্য দেবতার মন্দির নির্মাণের কারণে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।[১০০] অন্যদিকে রাজা হরিবর্মণের রাজত্বের ১৯শ রাজ্যাঙ্কে "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" এবং ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে "লঘুকালচক্রটীকা" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।[১০১] সম্ভবত হরিবর্মণ স্যামলবর্মণের ভ্রাতা ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ রাজগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করিয়াছিল এবং বাংলার মাটিতে তৎকালীন সময়ে একটি জাগ্রত ধর্ম হিসাবে ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে সেনামলে বৌদ্ধধর্ম বাংলার হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালীন সাহিত্যেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একস্থানে দশাবতার বিষয়ক শ্লোক রহিয়াছে। ইহাতে বুদ্ধকে এই দশাবতারের এক অবতার হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সকলের প্রতি সহায়ক হিসাবে বুদ্ধ পরিগণিত হইয়াছেন।[১০২] অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণু অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেবকে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে সেনযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল। যদিও তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

পাল রাজত্বের শেষদিক হইতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশ সংকুচিত হইতে শুরু করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের এই ক্রমাগত সংকটজনক পরিস্থিতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও ধর্মের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর তাঁহাদের এই সহনশীল নীতির ফলে পাল রাষ্ট্র ও সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবাপন্ন জনগোষ্ঠী তাঁহাদের ভিত্তিভূমি শক্ত করিয়া রচনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাল প্রশাসনযন্ত্রে শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠে। আবার এই আমলাতন্ত্র এতই শক্তিশালী হইযা উঠিয়াছিল যে পাল প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমাজগঠনও করিয়াছিলেন। আর গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজাধারী সেনরাজন্যবর্গের পক্ষে সেই সমাজকে স্মৃতি-শাসনের আওতাভুক্ত করিয়া বর্ণ ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজে বিভক্ত করা সহজতর হইয়াছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের গোঁড়ামী লইয়া আগত ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের ক্ষমতা দখল বাংলার ধর্ম-সামাজিক জীবনে একটি অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছিল। তাঁহারা বাংলার চিরায়ত উদারতার নীতি অস্বীকার করেন। তখনই বৌদ্ধধর্মের উপর চরম আঘাত নামিয়া আসে। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হয়।[১০৩] এই সম্পর্কে ট্রেভর লিং বলিতেছেন :

> If Buddhist institutions had declined so noticeably during the Sen period, that is, between about 1050 and 1200, it is not unreasonable to assume that the cause of the decline is to be found in some feature which was present in Bengal during the Sen period but not in the Pala period. One does not have to look very far to find it. The Sens, unlike the Palas, were not Bengalees ; they were south Indians, and upholders of the Brahmanical system...the Sen dynasty in Bengal constituted a menace to the survival of Buddhist life, a menace which soon became a reality. The Sens, coming from the conservative and orthodox Deccan, were unlikely to perpetuate the social liberalism which had been encouraged during the Buddhist Pala period. The society the Sens created was one in which caste differences were emphasised and upheld, and in which a multitude of state officials flourished at the expense of both the peasantry and the merchants. The latter were, traditionally, prominent supporters of the Buddhist Sangha, and their decline during the Sen period would inevitably have had the effect of further depressing the Buddhist....[১০৪]

ট্রেভর লিং-এর কথার প্রতিধ্বনি আবারও ড. মমিন চৌধুরীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেনরাজন্যবর্গের সময় বাংলার অর্থনীতি কৃষি-ভিত্তিক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাঁহাদের আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ব্যবসা-

বাণিজ্য উপেক্ষিত হইতে থাকে এবং বাংলার অর্থনীতি আমলাদের হস্তে কুক্ষিগত হইয়া যায়।[১০৫] ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম পূর্বের সেই পৃষ্ঠপোষকতা হারাইয়া ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। অন্যদিকে আর. সি মজুমদার মনে করেন, বাংলায় মুসলিম অধিকারকালে বৌদ্ধবিহার ধ্বংসের কারণে বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।[১০৬] তাঁহার এই প্রকার মন্তব্যের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে ট্রেভর লিং-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন মনে করি। তিনি বিচার- বিশ্লেষণপূর্বক বলিতেছেন :

> The disappearance of the Buddhist from Bengal could be attributed directly to the Muslim invasion only if Brahmanism also had perished at the hands of the Muslims ; the latter were hardly likely to have extended special favours to the Brahmans which they withheld from the Buddhists. If both Brahmanism and Buddhism had undergone the Islamization of Bengal on equal terms, Buddhism could be expected to have survived at least equaly as well as Brahmanism. This was not the case, and the only reasonable inference is that Buddhism had already been severely crippled before the Muslims reached Bengal.[১০৭]

বিশেষত বলা যায়, সেনরাজবংশের রাজত্বকালে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবের উত্থান বাংলার ধর্মীয় অবস্থায় ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম এই সময় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া পতনের দিকে ধাবিত হয়। ইহাদের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও অনুদার নীতি অনুসৃত হইতে থাকে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের রাজ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন বৌদ্ধধর্মের নিকট মৃত্যুর সমতুল্য ছিল। তাহা ছাড়া পাল আমলের শেষভাগে বৌদ্ধধর্মে বিভক্তি ও বিভিন্ন মতের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল এবং পরবর্তীতে ইহা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে বৌদ্ধধর্মের পূর্বের সেই মর্যাদা বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার কোনো কোনো শাখা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধর্মের অনুরূপ আকার ধারণ করে। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ব্যবধান ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হইয়া যায়। অবশ্য বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের প্রভাব তখন সক্রিয় সচেতন ছিল। এই মতবাদের অনুসারীগণ সকল ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। আমরা ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সময় সেনরাজগণের আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য উপেক্ষিত হইতে থাকে এবং বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হইয়া যায়। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে এদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটিয়াছিল। বিশেষত প্রবল জনশ্রুতি আছে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বাংলার কোন কোন অঞ্চলে মুসলিম সুফি সাধক আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুসারীগণও বাংলায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল সুফি সাধকগণের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরস্থ রামপালের বাবা আদম শহীদ, নেত্রকোনা জেলার মদনপুরস্থ শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমী, বগুড়া জেলার মহাস্থানস্থ শাহ সুলতান মাহী সাওয়ার, পাবনা জেলার শাহজাদপুরের মুখদুম শাহ দোলাহ শহীদ, বর্ধমান

জেলার মঙ্গলকোটে মুখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী, চট্টগ্রামের বায়োজিদ বোস্তামী এবং শেখ ফরিদ, উত্তর বঙ্গের পাণ্ডুয়ায় শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজী প্রভৃতি সূফি সাধকগণের আস্তানা আজও বিদ্যমান এবং তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যগণসহ বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন এবং তৎকালীন উৎপীড়িত ও অধঃপতিত বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মুক্তির জন্য তাহাদের নিকট ভীড় জমাইত। এই সকল সুফিগণ তাঁহাদের আর্দশস্থানীয় চরিত্র, আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং মানব হিতৈষণামূলক কার্যাবলীর দ্বারা বাংলাদেশের মতো একটি অমুসলিম দেশে ইসলাম ধর্মের অনুসারী তৈরি করিতে সক্ষম হন। তাঁহারা এই দেশে ইসলাম বিস্তারে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী এবং শাসকবর্গ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করিয়াছেন এবং জনমানসকে দারুণ প্রভাবান্বিত করিয়া ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত খানকাগুলি আধ্যাত্মিক, মানবকল্যাণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলীর প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ড. আবদুল করিম (সোসাল হিষ্ট্রি অফ দি মুসলিমস্ অফ বেঙ্গল ডাউন টু ১৫৩৮, (ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ৮৬) "বখতিয়ার খলজীর পূর্বে আগত সুফি সাধকগণের বাংলায় আগমন এবং বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনের সঠিক তারিখ নিরূপণ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন এবং প্রচলিত কাহিনীর সূত্র ধরিয়া তিনি মনে করেন, তাঁহারা বখতিয়ারের বাংলা আগমন ও বিজয়ের পরবর্তীতেই বাংলায় আসিয়াছিলেন।" তাই জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনো যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সুফি-দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে এই দেশে আগমন করেন এবং বাংলার ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষাপট ইসলামের অনুকূল হওয়ায় ইসলাম ধর্ম বৌদ্ধধর্মের স্থান দখল করিয়াছিল। তাই এই কথা নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব যে, বাংলায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বন্দ্বে বৌদ্ধধর্মই সবাপেক্ষা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং ইহার করুণ পরিণতিস্বরূপ পরবর্তীকালে এদেশের মাটি হইতে বৌদ্ধধমের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

গ. ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

বাংলায় আর্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহা বাংলার ধর্মীয় সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এদেশে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আর্যদের প্রভাবের বিস্তার হয়। অবশ্য গুপ্তযুগেই ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই যুগের তাম্রশাসনে বাংলাদেশে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপকতার উল্লেখ উক্ত অনুমানের সহায়ক হইয়াছে।[১০৮] এই সময়ই বাংলায় ব্রাহ্মণগণ বসবাসের উদ্দেশ্যে ব্যাপকহারে আগমন করিতে থাকেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ বিভিন্ন গোত্র ও শাখায় বিভক্ত ছিলেন। পূজা-অর্চনার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকীয় অনুদান হিসাবে তাঁহারা ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন।[১০৯]

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই প্রভাব বাংলাদেশ অতিক্রম করিয়া কামরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণের নিধনপুর তাম্রশাসনে শ্রীহট্ট অঞ্চলে দুই শতাধিক

ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া স্থায়িভাবে বসতি স্থাপনের সুযোগ দানের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণও বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত ছিল।[১১০] অপরদিকে সপ্তম শতকে ত্রিপুরা অঞ্চলে মোটামুটি বাংলার পূর্বপ্রান্তবর্তী সীমান্তে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণীসংকুল গভীর অরণ্য অঞ্চলেও মন্দির নির্মাণ ও বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।[১১১] তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বত্র আর্য ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রসার ঘটিয়াছিল বলিয়া ধারণা করা সম্ভব।

বাংলার পাল শাসনামলেও এই প্রভাব অব্যাহত থাকে। পাল রাজারাও বহু বেদ বেদাঙ্গ মীমাংসা ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিতেন। এবং তাঁহারা বৈদিক যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মেও নিজেদেরকে নিয়োজিত করিয়া পারদর্শী হইয়াছেন। খালিমপুর লিপিতে উল্লেখ আছে যে, রাজা ধর্মপাল বৈদিক ধর্মের অনুকূলে বহুবিধ সংস্কারকার্য করিয়াছিলেন।[১১২] বাদল স্তম্ভলিপিতে রাজা প্রথম বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, "তাঁহারা (হোম কুণ্ডোস্থিত) অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন কবিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত।" কেদারমিশ্র" চতুর্বিদ্যা বেদবিদ ব্রাহ্মণ" ছিলেন। তাঁহার পিতা দর্ভপাণিও সমান বেদবিদ্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র নীতি, আগম ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং বেদবিদ্যাধিকারী ছিলেন।[১১৩] নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতে ঐ একই পরিবারের বেদবিদ্, বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন সুবিধা অর্জনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[১১৪]

কিন্তু সেনামলে বাংলাদেশের তৎকালীন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বৈদিক ধর্ম আরও সম্প্রসারিত হয়। ভবদেবভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে বেদবিদ্ সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত শতাধিক গ্রামের উল্লেখ আছে।[১১৫] ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসনে বেদ অধ্যয়নরত পুণ্ড্রবর্ধনে ভূমিদানের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে এবং তাঁহারা উত্তর রাঢ় হইতে আগমন করিয়াছিলেন। এই লিপিতে তাঁহারা নিজেদেরকে বৈদিক ধর্মের রক্ষক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১১৬] ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক সেন বংশের আদিপুরুষ সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে যজ্ঞধূমে পরিপূর্ণ গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র ঋষির আশ্রমে কাটাইয়াছিলেন।[১১৭]

সুতরাং গুপ্তযুগ অথবা তৎপরবর্তী সময় হইতে বাংলাদেশে বৈদিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বৈষ্ণব, শৈব, শক্তি, সৌর প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রসার সেনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল।

১. বৈষ্ণব ধর্ম

প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি এদেশে হিন্দুধর্ম প্রসার লাভ করিতেছিল। আর বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল এবং পাল শাসনামলে ইহার আরো বিকাশ সাধিত হয়। সম্রাট প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সমতটে বণিক লোকদত্তের একটি নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা ইহারই প্রমাণ।[১১৮] কিন্তু আবার সেন শাসনামলেই

ইহা দারুণভাবে সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সময়ের আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি ইহার প্রমাণ দিয়া থাকে।[১১৯] (প্লেট নং ১, চিত্র নং ২, প্লেট নং ২, চিত্র নং ১)।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বংশ বর্মণ বংশের সকল রাজাই 'পরম বিষ্ণুর' ভক্ত ছিলেন। এই বংশের ভোজবমণ কর্তৃক উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, "এই ব্রহ্মাণ্ডে দেবর্ষি অত্রি স্বয়ম্ভুর অপত্য ছিলেন। তাহার চক্ষু হইতে যে জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই জ্যোতি হইতে চন্দ্রমা ভূমিষ্ঠ হন। সেই চন্দ্রমা হইতে রোহিণী নন্দন বুধ জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরুরবা পৃথিবী দর্শন করিয়া কীর্তি, এবং উর্বশী এবং বসুন্ধরা কর্তৃক স্বয়ংবৃত স্বয়ংবরে পতিরূপে গৃহিত হইয়াছেন। ইহাদেরই বংশে বর্মণ পরিবার উদ্ভূত হইয়াছে।"[১২০] এই ভোজবর্মণ একজন সাবর্ণ গোত্রীয়, ভৃগু–চ্যাবন–আপ্নু–বান–ঔব–জমদগ্নি প্রবব, রাজসনেয চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাত্ত্বশাখার ব্রাহ্মণ রামদেব শর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধনে ভূমিদান করিয়াছিলেন। আবার এই রামদেব শমার বেদবিদ্ পূর্বপুরুষগণ মধ্যদেশ হইতে আগমনপূবক উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামে বসবাস শুরু করেন।[১২১] এই ভোজবর্মণের তাম্রশাসনের ৪ নং শ্লোকে বজ্রলীলাব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে : সেই গোপীশত কেলিকার, মহাভারত নাট্যের সূত্রধর (পরম পুরুষ) কৃষ্ণ এখানে ভূমি ভাবোদ্ধারকারী অংশাবতাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[১২২]

অন্যদিকে এই বর্মণ রাষ্ট্রেব বিখ্যাত মন্ত্রী স্মৃতিশাস্ত্রকাব ভবদেবভট্ট বৌদ্ধধমেব ভীষণ বিরোধী ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বৌদ্ধরূপ সমুদ্রেব অগস্ত্য মণি হিসাবে আখ্যায়িত কবা হইয়াছে। আবার তিনি স্বয়ং "পাষণ্ড বৈতাণ্ডিক" বলিয়াও গর্ব অনুভব কবিতেন, অর্থাৎ বলা যায় যে, পাষণ্ড শাস্ত্রগুলির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল।[১২৩] তিনি একজন ব্রহ্মাবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত তন্ত্র–গণিত–ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রেব লেখক, কুমারিল ভট্টের মীমাংসা গ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রসিদ্ধ লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র এবং অস্ত্রবেদে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।[১২৪] তিনি ভুবনেশ্বরে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ ও দীঘি খনন এবং উদ্যান রচনা করিয়া সেখানে অনন্তবাসুদেবেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১২৫] তাঁহার প্রশস্তিটি এই মন্দিরের গাত্রেই পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রথমেই বিষ্ণুর বন্দনা করা হইযাছে :

> কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবার ফলে তাহার কুচকম্ভ পত্রলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বাপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে, "অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয়" এই বলিয়া স্ববস্বতী যাহাকে উপহাস করিয়াছেন, এমন হরি তোমাদের সম্পদের হেতু হোন।[১২৬]

এই ভবদেবভট্ট রাঢ় অঞ্চলেও একটি নারায়ণের মন্দির নির্মাণ করিয়া ইহাতে নারায়ণ অনন্ত এবং নরসিংহের মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সাবর্ণ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ একশত গ্রাম তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।[১২৭]

ভোজবর্মণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, মানুষের অজ্ঞতার উলঙ্গতাকে ঢাকিবার একমাত্র উপায় ত্রিবেদের চর্চা। আর এই চর্চা সম্প্রসারণের জন্য বর্মণ রাজারা অপ্রতিহত

প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।[১২৮] অপরদিকে সেন বংশীয় রাজগণও ইহার আরও সম্প্রসারণ ঘটাইয়াছেন। এই বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিযাছিলেন। এই সকল আশ্রম তপোবন ঋষি সন্ন্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিত ঘৃত-ধূপের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত ; সেখানে মৃগ শাবকেরা তপোবন নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং শুক পাখিরা সমস্ত বেদ আবৃত্ত করিত।[১২৯] এই বংশের শক্তিশালী রাজা বিজয়সেন একজন শৈব ধর্মের অনুসারী হইলেও তাহার লিপিতে হরি এবং হর প্রভৃতি বৈষ্ণব নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন।[১৩০] তাই তিনি সদাশিবের ভক্ত হইয়াও প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরে ভূমিদান করিতে সক্ষম হন। তাহার পৌত্র রাজা লক্ষ্মণসেন একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাহার রাজত্বকালেই রাজকীয় শাসনের প্রারম্ভে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়। তাঁহার আনুলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণদীঘি এবং শক্তিপুর তাম্রশাসনের প্রারম্ভে বিষ্ণুর বন্দনা করা হইয়াছে :

> ফণি পতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দ্র ইন্দ্রধনুস্বরূপ,
> স্বর্গতরঙ্গিনী বারিস্বরূপ, শ্বেত কপালমালা বলাকাস্বরূপ যাহা
> ধ্যানাভ্যাসরূপ সমীরণের দ্বারা প্রেরিত এবং যাহা ভবার্তিতাপ
> ধ্বংসকারী—শম্ভুর জটারূপ সেই মেঘ তোমাদের শ্রেয় :
> শস্যের অঙ্কুরোদ্গমের হেতু হোক।[১৩১]

লক্ষ্মণসেন সমসাময়িক কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র বন্ধুল কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয়, কান্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা আনুলিয়া লিপির দান গ্রহিতা ছিলেন।[১৩২] তাঁহার গোবিন্দপুর পট্টোলীরও দান গ্রহিতা একজন ব্রাহ্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা বৎসগোত্রীয় এবং কৌঠুম শাখা চরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজ গোত্রীয় অপর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেব শর্মাও হেমাশ্বরথ মহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্য-ক্রিয়ার দক্ষিণাস্বরূপ কিছু ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১৩৩] লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর লিপিটি কৌশিক গোত্রীয় অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ সেন অভিষেকের সময় ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভূমিদান পাইয়াছিলেন।[১৩৪] পূর্ববাংলার দেববংশের রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদরদেব একজন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধর শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।[১৩৫]

রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় কৃষ্ণলীলা কাহিনীর বিশেষ সমাদর ছিল। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রগণ, রাজদরবারের সভাসদগণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।[১৩৬] এই সময়ে তাঁহার সভাকবি জয়দেব একজন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার "গীতগোবিন্দ" রচনা করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছেন।[১৩৭] মহাভারত, পুরাণ, বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোবিন্দলীলা বর্ণিত হইয়াছে কবি জয়দেবও তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দে সেই গোবিন্দলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দই তাঁহার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার সঙ্গে গীতগোবিন্দে কীর্তিত হইয়াছেন। মূলত

রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৩৮] ইহার আরম্ভ শ্লোকটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ :

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমি তমাল তরু নিকারে শ্যামল, রাত্রিকাল, কৃষ্ণ ভীত। রাধা তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে যাও। এইরূপ নন্দনিদেশে চলিত যমুনাকূলের প্রতি পথ-তরু-কুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের বিজনকেলি জয়যুক্ত.হউক।[১৩৯]

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। গীতগোবিন্দের অপর একটি শ্লোকে হরিকে রক্ষাকর্তা হিসাবে বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে :

চরণাবজ-সেবিকা বারিধিসুতাকে শত শত নয়নে দেখিবার জন্য শেষ পর্যঙ্কশায়ী যে বিভু, নাগ-নায়কের ফণা শ্রেণীর মণিগণে আপনার বহুল প্রতিবিম্ব-সম্বলিত কায়ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই হরি-আপনাদিগকে রক্ষা করেন।[১৪০]

সুভাষিতরত্নকোষের একাধিক শ্লোকেও বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, রাধার দুজয় মানে কৃষ্ণ হৃদয় বিষণ্ণ, তিনি রাধার নিকট আসিতেছেন না। তখন রাধা বাধ্য হইয়া কৃষ্ণের সন্ধানে দূতীকে এদিকে-ওদিকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তাঁহাকে কোথাও না পাইয়া সখী দূতী রাধার নিকট নিবেদনাচ্ছলে বলিতেছেন :

সখী, এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, অন্য নারীর অভিসারে মিলিত হইতে পারে--এই ভাবিয়া আমি সারা রাত্র ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেই ধূর্তকে খুঁজিয়াছি। কিন্তু মুরারীকে কোথাও দেখিতে পাই নাই—ভাণ্ডীর তলে নয়, গোবর্ধনগিরির তটভূমিতে নয়, কালিন্দীর কূলে নয়, বেতস কুঞ্জেও নয়।[১৪১]

ইহার অপর একটি শ্লোকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, হরি (কৃষ্ণ) নিদ্রিত অবস্থায় পূর্বজন্মের করুণ বিচ্ছেদের স্বপ্ন দেখিতেছেন। রাধা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া হরি কষ্ট পাইতেছেন :

হে লক্ষ্মণ। মেঘমালা আমার সীতাকে হারাইয়াছে, উহারা আমাকে কষ্ট দেয়। নিষ্ঠুর কদম্ব সুরভিত মৃদু বায়ু তীক্ষ্নভাবে আমাকে আঘাত করে। নিদ্রিত হরির এই বচন তাঁহার কোন পূর্বজন্মের বিচ্ছেদের কথা, এবং রাধা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছে। হরি যেন তোমার জন্য আনন্দ আনয়ন করেন।[১৪২]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একাধিক শ্লোকেও রাধা-কৃষ্ণের লীলার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে উমাপতিধরের শ্লোকে বলা হইয়াছে, গোপরমণীগণ কৃষ্ণকে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহারা আশাহত হন নাই, অবশেষে রাধার পিত্রালয়ে তাঁহার সন্ধান মিলিয়াছে :

যমুনার তীরে নয়, পর্বতোপকণ্ঠে নয়, বটবৃক্ষ তলে নয়, রাধার পিতৃগৃহের প্রাঙ্গণে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি—গোপগণ সংযতভাবে এইরূপ বলিলে বিস্মিত যশোদা পতির সম্মুখে নিজ গৃহ হইতে কৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন।[১৪৩]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত উমাপতিধরের অপর একটি শ্লোকে আছে, রাধা কৃষ্ণকেলির অভিপ্রায়ে ধ্যানমগ্ন আছে এবং তাঁহারই বেতসকুঞ্জে অপেক্ষাচ্ছলে :

> যে কৃষ্ণ দ্বারকার রত্ন–শোভামণ্ডিত সমুদ্রযুক্ত মন্দিরে রুক্মিনী কর্তৃক প্রবল পুলকের সহিত আলিঙ্গিতা হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণের যমুনাতীরস্থ স্নিগ্ধ বেতসকুঞ্জে রাধা কেলির সৌরভজনিত ধ্যানমুচ্ছা বিশ্বকে পালন করুক।[১৪৪]

কৃষ্ণ প্রিয়গণের মধ্যে রাধাই শ্রেষ্ঠা, সর্বোত্তমা ও সর্বসৌভাগ্যবতী। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে কৃষ্ণ শিরোভূষণা তুলসী অপেক্ষা রাধার অধিক গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে।[১৪৫] ইহার অপর একটি শ্লোকে প্রেম বিরহে লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধার প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে :

> লক্ষ্মীর উষ্ণ নিশ্বাসে ঘনাবর্ত ক্ষীরজল পান করিয়া যে সকল সুনয়নী ক্ষীরোদ সাগরের কূলে বাস করেন, তাঁহারও নিরন্তর রাধার যশোগান করিয়া থাকেন।[১৪৬]

কৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা। তিনি (রাধা) রাসমণ্ডলেও রাসেশ্বরী। কারণ কৃষ্ণ যখন চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান, তখন মদনদেব রাধাই রাগচপল নয়নে দশদিকবেধনক্ষম বিশুদ্ধ শরসন্ধান করিয়া থাকেন।[১৪৭]

রাধার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তাঁহার প্রেমচাতুর্য ও প্রেমপ্রাবল্য। রাধা বিদগ্ধা আব কৃষ্ণ বহুবল্লভা, রাধা বাকচাতুর্য বিস্তার করিয়াই কৃষ্ণকে লজ্জায় ফেলিতে চাহিতেছেন :

> অনিল গোপীতে আসক্ত মধুরিপুকে লজ্জাদানের উদ্দেশ্যে রাধা অজ্ঞতার ভান করিয়া জানিতে চাহিলেন, দয়িতার অর্ধাঙ্গে তুষ্ট শম্ভু কেমন আছেন।[১৪৮]

আবার আর্যাসপ্তশতীর অপর একটি শ্লোকে বিষ্ণুর কমল নয়নের সুন্দর বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে :

> নাভিরন্ধ্র পথে জঘনদর্শন লালসায় প্রসারিত যে চক্ষু লক্ষ্মীর হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। পুণ্ডরীকাক্ষ্য বিষ্ণুর সেই কমল সদৃশ্য নয়ন তোমাদের সুখপ্রদ হউক।[১৪৯]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, "হরিপ্রাপ্তি সাধনা মানুষের উৎকৃষ্ট সাধনা। তিনি গোপ রমণীগণের পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিত ও তদগত চিত্ত হইয়া সমর ঘূর্ণিতালোচনে হাস্য, নৃত্য ও বাদ্যগীত করত মহানন্দে পরম কৌতুকে আমোদিত থাকেন। এই হরিকে নিবেদন করিলে মানুষ দুর্লভ সম্পদ অর্জন করিতে পারে এবং তাঁহার বিরাগভাজনেই মানুষের অধঃপতন শুরু হয়।[১৫০]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা কৃষ্ণের প্রিয়তমা। ইহাতে রাধার গৌরব ও বৈভব প্রচার অন্যতম বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধার ষোড়শ নামের উল্লেখ আছে এবং এই ষোড়শ নাম সহস্র নামের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি যথাক্রমে :

> রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রাসকেশ্বরী, কৃষ্ণ প্রণাসিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণ স্বরূপিনী, কৃষ্ণ রামাংশসম্ভূতা, পরমানন্দরূপিণী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বন্দা, বৃন্দাবন–বিনোদিনী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকান্তা এবং শতচন্দ্রনিভলনা। এই ষোড়শ নাম সহস্র নামের শ্রেষ্ঠ ও তাঁহারই মধ্যবর্তী।[১৫১]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা সখীগণের নাম উল্লেখিত হইয়াছে যাহাদেরকে গোপিকা বলা হয় : ইহারা ছিল যথাক্রমে "সুশীলা, শশিকলা, যমুনা, মাধবী, রতী, কদম্বমালা, কুন্তী, জাহ্নবী, স্বয়ংপ্রভা, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, পারিজাতা, গৌরী, সর্বমঙ্গলা, কালিকা, কমলা, দূর্গা, ভারতী, সরস্বতী, গঙ্গা, অম্বিকা, মধুমতী, চম্পা, অপর্ণা সুন্দীর, কৃষ্ণপ্রিয়া, সতীনন্দিনী ও নন্দনা প্রভৃতি।[১৫২]

তাহা ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একস্থানে রাধার উপাসনা সম্পর্কে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে :

> যাহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণচম্পক সদৃশ, যিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালিনী, যাঁহার শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্র সদৃশ সুন্দর বদনে শরৎকালীন পদ্ম সদৃশ নেত্রযুগল শোভা পাইতেছে, যিনি সুন্দর নিতম্ব এবং শ্রোণি দ্বারা শোভিতা হইয়াছেন, যাঁহার সুন্দর সুপক্ক বিম্বফলসদৃশ অধর এবং মুক্তাপঙক্তি হইতে মনোহর দন্তপঙক্তিবিশিষ্ট মুখে ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ সূচনাপূর্বক মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজ করিতেছে, যাঁহার অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং রত্নমালা দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সূর্য অপেক্ষা তেজস্বী যাঁহার গণ্ডস্থল অতিশয় তেজ প্রকাশ করিতেছে, মহামূল্য রত্ন নির্মিত কুণ্ডলদ্বারা কর্ণযুগল এবং উৎকৃষ্ট রত্নরাজি বিনির্ম্মিত মুকুট ও কীরিট দ্বারা যিনি উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছেন, রত্নাঙ্গুরীয় এবং রত্ন-নির্ম্মিত পাশক দ্বারা যিনি অতিশয় সুশোভিত হইয়াছে, যিনি মালতীমালা শোভিত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন, যিনি রত্ন নির্ম্মিত কেয়ুর এবং মঞ্জীর সুরঞ্জিতা হইয়াছেন, মনোহর রত্নকেয়ুর যুগল, যাঁহার হস্তদ্বয়ে শোভা পাইতেছেন, যিনি গজেন্দ্র সদৃশ মন্দগামিনী, রূপাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রিয়তমা গোপীগণ কর্তৃক শ্বেতচামরাদি দ্বারা সেবিত হন ; যাঁহার কেশকলাপ কস্তুরী বিন্দুযুক্ত চন্দন এবং সিন্দুর বিন্দু দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ভক্তিপূর্বক যাহাকে পূজা করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এবং পরমা শোভাধিষ্ঠাত্রী দেবী, নির্গুণ স্বরূপিণী ; যিনি পরাৎপর মহাবিষ্ণুর জননী ও সর্বসম্পৎ প্রদায়িনী ; যে মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী শান্তা বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়া কৃষ্ণ প্রেমময়ী সুন্দরী হইতে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়, যিনি রাসমণ্ডলের মধ্যে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন এবং রাসমণ্ডলে রাসবিহারী হরির সহিত বিলাস করেন, সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধাকে উপাসনা করি।[১৫৩]

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসবস্বম গ্রন্থে বৈষ্ণবপদ অর্জনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

> এ বিষয়ে বরাহপুরাণ (বিষ্ণু বলিলেন)—পৌরুষ সুক্ত অথবা সংহিতা অবলম্বন করিয়া যে দ্বিজগণ আমাকে পূজা করেন (আমার যাগ করেন), সেই ব্রাহ্মণগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য ও নরসিংহ পুরাণে (যোগি যাঃ ৯,৯৭। নরসিংহ পুঃ ৬২, ৮) যিনি পুরুষ সুক্তের সাহায্যে পুষ্পসমূহ অথবা জল আমাকে দান করেন, তাঁহা দ্বারা এই চরাচর সমগ্র জগৎই অর্চিত হয়। নরসিংহ পুরাণেও আছে-(৬২-২৮) প্রতিদিন শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কেবল এই সুক্তই পাঠ করিতে হইবে। তাহা হইলে অচ্যুতের তুষ্টি বিধানকারী সেই ব্যক্তি সর্বদুঃখ সম্যগরূপে ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব পদ (বিষ্ণুপদ বা বৈকণ্ঠ্য, প্রাপ্ত হন।[১৫৪]

সুতরাং সেনরাজগণের রাজত্বকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। এই সময়ে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের দুইটি সমৃদ্ধরূপের প্রচলন হয়। একটি বিষ্ণুর দশাবতারের সমন্বিত ও রীতিবদ্ধ রূপ, অন্যটি রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও রূপকল্পনা। এই দশাবতার হইতেছেন যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি। ইহার প্রথম উল্লেখ কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দেই পাওয়া যায়। কবি জয়দেব এই দশাবতারের এক একজনের কার্যের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে দিয়াছেন :

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ংকুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান মুচ্ছর্য়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

মীন অবতারে বেদোদ্ধাব, কূর্ম অবতারে মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে মন্থনকালে কূর্মরূপে দণ্ডধারণ, বরাহাবতাব হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া সাগর জল হইতে পৃথিবী উত্তোলন, নরসিংহাবতারে দৈত্যবিদারণ, বামনাবতারে বলিছলনা, রাম রাবণবধ, বলরামাবতারে হলকর্ষণ, বুদ্ধাবতারে করুণাবিতরণ এবং কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছবধ করেন যে দশবিধরূপধারী কৃষ্ণ তাঁহাকে নমস্কার।[১৫৫]

গীতগোবিন্দে আবার রাধাকৃষ্ণে ধ্যানকল্পনারও প্রথম উল্লেখ বলিয়া ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করিয়াছেন।[১৫৬] কিন্তু হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্মরণাতীত কাল হইতেই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও স্মরণাতীত কাল হইতে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রচলন সম্পর্কে অভিমত পোষণ করিয়াছেন। তিনি তাহার যুক্তির সমর্থনে আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে সেই রহস্যেরও মর্ম উদঘাটিত হয় নাই। তবে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থে রাধা নামের উল্লেখ না থাকিলেও দক্ষিণ ভারতে প্রণীত বহু প্রাচীন গ্রন্থে রাধার নাম রহিয়াছে।[১৫৭] যাহাই হউক, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও অবতার বিষয়ক শ্লোক এবং ইহার মধ্যে আবার কৃষ্ণাবতার সম্পর্কে ষাটটি শ্লোক রহিয়াছে।[১৫৮] কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে কৃষ্ণাবতারের উল্লেখ হইলেও মূলত গীত-গোবিন্দ কাব্যটি রাধাকৃষ্ণের যুগ্মলীলা সম্পর্কেই রচিত হইয়াছে।[১৫৯]

অপরদিকে বাংলায় রাধা-কৃষ্ণের দেবায়ত প্রেমের পূজা পদ্ধতি প্রচলনের সময়কাল সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলক ও ভাস্কর্য কৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীর লোকপ্রিয়তার সাক্ষ্য।[১৬০] এবং সদ্যুক্তিকর্ণামৃত[১৬১] ও কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে[১৬২] রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত কিছু শ্লোক রহিয়াছে। পাহাড়পুরের একটি ভাস্কর্যে[১৬৩] উৎকীর্ণ কৃষ্ণের সহিত একজন রমণীকে কে. এন. দীক্ষিত[১৬৪] রাধা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই ভাস্কর্য অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু এস কে. সরস্বতী[১৬৫] ও পি. সি. বাগচী[১৬৬] ভিন্নমত পোষণ করিয়া উহাকে রুক্মিণী বা সত্যভামার মূর্তি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। অথচ নবম শতাব্দীর বাঙালি কবি সত্যানন্দ,[১৬৭] অভিনন্দ[১৬৮] ও বিদ্যক[১৬৯] রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত শ্লোক (সদুক্তিকর্ণামৃত ও সুভাষিতরত্নকোষ সংকলন গ্রন্থে

উদ্ধৃত) রচনা করিয়াছেন। অপরদিকে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের ভট্টনারায়ণ[১৭০] তাঁহার বেণী সংহার নাটকে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তিনি খুব সম্ভবত বাঙালি ছিলেন। সুতরাং বলা সম্ভব যে, রাধাকৃষ্ণের লীলার বিষয় বহু পূর্ব হইতেই বাংলাদেশের মানুষের নিকট পরিচিত ছিল এবং কবি জয়দেবের সময়কাল একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরদিকে সেন রাজত্বকালে বিষ্ণু লক্ষ্মীনারায়ণ রূপেই পূজিত হইতেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা ও রূপকল্পনা দক্ষিণ ভারত হইতে সেন আমলে বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল।[১৭১] লক্ষ্মনসেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁহার পবনদূত কাব্যে লক্ষ্মীনারায়ণের বর্ণনা করিয়াছেন। সেন রাজগণের কুলদেবতা হিসাবে :

অস্মিন সেনান্বয় নৃপতি না দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ যুষ্মে বসতি কমলাকেলি কাব্যে মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমকৃৎ বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি সুভগাঃ কুঠতে বাররামাঃ।

অর্থাৎ,

সে দেশে যাইলে বীর।
সেন-ভূপতির কীর্ত্তি দেখিবে বিষ্ণুর মন্দির।
সেথা বিরাজেন কমলাকান্ত
মুরারি-মুরতি অতি প্রশান্ত ;
প্রকৃতি-সুভগা দেবদাসীগণ লীলা-কমলিনী হাতে
নিয়ত ঘুরিয়া লক্ষ্মীর মত সেবে যেন প্রাণ নাথে।[১৭২]

সুতরাং সেনামলে বিষ্ণু জনপ্রিয় দেবতা হিসাবে বিবেচিত হইলেন।

সেন আমলের বাংলাদেশে বহু বৈষ্ণব মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষ্ণু মূর্তি চার হস্ত বিশিষ্ট হয় এবং ইহার নিম্ন বাম হস্তে শঙ্খ, উর্ধ্ব বাম হস্তে চক্র, নিম্ন দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং উর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে গদা থাকে এবং ইহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তির অবস্থান। অবশ্য গরুড়, লক্ষ্মী সরস্বতীর পৃথক মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারা সাধারণত বিষ্ণুর বাহন ও পার্শ্বচর হিসাবে অঙ্কিত। রাজশাহী যাদুঘরে রক্ষিত গরুড় মূর্তির করবেষ্টিত মুখশ্রীতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সুন্দর চিত্র পরিস্ফুটিত। লক্ষ্মীদেবীর সাধারণত দুই হস্ত হইলেও সরস্বতীর চারিটি হস্ত এবং তাহার দুইটি দিয়া বীণা ধরিয়া আছেন এবং অন্য দুইটিতে অক্ষমালা ও পুস্তক। তাহার পার্শ্বচর চামরধারিণী, পাদপীঠের বাহন হংস বা মহিষ। তাহা ছাড়া চতুর্মুখ ব্রহ্মার তিনটি মুখ দৃষ্টিগোচর হয় এবং চারি হস্ত বিশিষ্ট। এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, শঙ্খপুরুষ ও চক্রপুরুষ পার্শ্বচরীরূপে দণ্ডায়মান থাকেন এবং একপার্শ্বে ব্রহ্মার বাহন হংস ও অপর পার্শ্বে বিষ্ণুর বাহন গরুড় মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।[১৭৩]

এই সময়ে অবতার মূর্তিও বাংলাদেশের অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বরাহ ও নরসিংহ অবতারই প্রধান ছিল।[১৭৪] চতুর্ভুজ নরসিংহ (বিষ্ণু) স্থানক ভঙ্গিতে

দণ্ডায়মান আছেন। তাহার পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামীয় তাহার স্ত্রীদ্বয়, কখনও আবার দেবী বসুমতিও বিষ্ণুর পার্শ্বে থাকেন, গরুড় তাহার বাহন। অবতার বিষ্ণু এইভাবে উপাসিত হইয়াছেন।[১৭৫] অপরদিকে তৎকালীন রাজন্য লক্ষ্মণসেন নিজকে একজন পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করিতেন।[১৭৬] উপরন্তু বলা যায় যে, রাজা বিজয়সেন একজন সদাশিবের ভক্ত হইয়াও তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরখানি হরিহরের উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১৭৭] লক্ষ্মণসেনের উত্তরসূরি বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন উভয়েই নারায়ণকে উল্লেখ করিয়া তাহাদের লিপির বর্ণনা শুরু করিয়াছেন।[১৭৮] উল্লেখ্য যে, তৎকালে সস্ত্রীক বিষ্ণুমূর্তির পূজাও প্রচলিত ছিল তাহা সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[১৭৯]

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের দারুণ প্রসার ঘটিয়াছিল এবং কালের সাক্ষী হিসাবে লিপি, সাহিত্য এবং প্রতিমাগুলি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছে। বিশেষত রাজন্যবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় আবহাওয়া বাংলায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বাংলার ধর্মীয় পরিমণ্ডল সমৃদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মে অপ্রতিহত গতি সঞ্চার ইহারই ফল।

২. শৈব ধর্ম

বাংলাদেশে প্রবর্তিত শৈব ধর্ম ছিল পাশুপত ধর্ম। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, উত্তর ভারতের পাশুপত ধর্মই আদি শৈব ধর্ম।[১৮০] অপরদিকে পি.সি. বাগচী মহাশয়ের মতে আগমান্ত শৈব ধর্ম গুপ্তযুগেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং পাশুপত ধর্মের ধ্যান-কল্পনার মধ্যেই এই ধর্মের বিকাশ ঘটিয়াছিল।[১৮১] উহা হইতে আবার নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণদের আগমন বাংলাদেশে ঘটিয়াছিল এবং তাহারাই এদেশে পাশুপত ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।[১৮২]

সেন আমলে বাংলায় শৈবধর্ম বহুল প্রসার লাভ করিয়াছিল। সদাশিব ছিলেন সেন বংশের পারিবারিক দেবতা। এই বংশের রাজা বিজয়সেন ও বল্লালসেন শিবের উপাসক ছিলেন।[১৮৩] তাহাদের উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব। বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালিপির আরম্ভ শ্লোকে শম্ভুর উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে :

> দেবীর বক্ষবন্ধনী ও মস্তকোপরি হার সজোরে স্থানচ্যুত করিলে আতঙ্কিত দেবীর বিষণ্ণতার উদ্ভব হইল, তখন চন্দ্রকিরণে-উদ্ভাসিত লজ্জিত দেবীর মুখ দর্শনে শম্ভুর (পঞ্চম) বদনে যে বিজয়োল্লাস, উহাই তোমার আনন্দ বর্ধন করুক।[১৮৪]

অপরদিকে বিজয়সেন যে ধূর্জ্জটি নামে শিবের আবাহন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে (আরম্ভ শ্লোক) সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

ক্রৌঞ্চারি দ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলৌ মিথো
গঙ্গাবারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধ্যজটম্।
শৈবালাবলিমধ্যবদ্ধশফরীবুদ্ধ্যা সমাকর্ষতোর।
আক্রন্দস্ফুট কন্দলেন বিহসন্নব্যাজ জগদধূর্জ্জটিঃ॥

শিশু চাপল্যে পিতার মস্তকে গঙ্গাবারিতে খেলা করিতে করিতে জটামধ্যে শশিকলাকে শৈবালজালে বদ্ধ শফরী মনে করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে বিবদমান ক্রৌঞ্চারি (কার্ত্তিকেয়) এবং দ্বিরদাস্য (গণেশ) দুই ভাইয়ের অস্ফুট কোলাহল শ্রবণে স্মিতমুখ ধূর্জ্জটি জগৎ রক্ষা করুন।[১৮৫]

অন্যদিকে তাহার পুত্র বল্লালসেন "অর্ধ-নারীশ্বর"-এর বন্দনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নৈহাটি লিপিটির প্রারম্ভ শ্লোকে এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

সন্ধ্যাতাণ্ডব সম্বিধান বিলসন্নান্দী নিনাদো-
স্মিতির্ নির্ম্ময্যাদরসার্ণবো দিশতু বঃ
শ্রেয়োহর্দ্ধ নারীশ্বরঃ যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গ
হারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈর নাট্যা-
রম্ভর যৈর্জয়ত্য ভিনবদ্বৈধানুরোধশ্রমঃ।

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ সুললিত অঙ্গ চেষ্টায় এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নাট্যারম্ভ প্রচেষ্টায় অভিনয়দ্বয়ানুরুদ্ধ শ্রম উদ্ভূত হইতেছে, সন্ধ্যাতাণ্ডবোৎসবে উদ্যত নান্দীনিনাদরূপ উর্ম্মিতে উদ্বেলিত রসার্ণব যাঁহার স্বরূপ সেই অর্দ্ধনারীশ্বর তোমাদের শ্রেয় বিধান করুন।[১৮৬]

তৎকালীন সাহিত্যেও শৈবধর্মের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আকর্ষণ প্রতিফলিত হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী একজন বৈষ্ণব ছিলেন এবং শিবের পূজাও করিতেন। তাই তাহার "রামচরিত" কাব্যের প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনা করা হইয়াছে, কণ্ঠাশ্রিত লক্ষ্মী, হস্তে ফণীবলয়, বনমালা পরিহিত ও শশিকলা মণ্ডিত শিবের বর্ণনায় :

শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতঃ ভুজেনাগম্।
দধতং কং দামজটাবলম্বং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে।।

লক্ষ্মী যাহার কণ্ঠাশ্রিত (অথবা কৃষ্ণ শোভা যাঁহার কণ্ঠে), কৃষ্ণ যিনি ভুজে কালিয় নাগকে ধরিয়াছেন (অথবা যাঁহার হস্তে ফণী-বলয়), যিনি সুন্দর (বন) মালাধারী (অথবা যিনি সুন্দর জটাজুটধারী), ও বর্হাপীড় (অথবা শশিকলা মণ্ডিত) তাঁহাকে বন্দনা করি।[১৮৭]

সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, সকল প্রশংসার আধার শম্ভু :

এই জগৎ সাত সমুদ্রসহ পর্বতমালায় আবদ্ধ যাহা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া প্রশস্ত এবং শক্তিশালী মহাদেশ দ্বারা শুরু হয় এবং জগৎ সর্প উপরে শেষের অবলম্বন করিয়া শুধু একটি স্থানের আকার ধারণ করে যাহা তাহার বিস্তৃত মস্তকাবরণের রত্নের ভিতরে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং সকল প্রশংসা শম্ভুর যাহার বাহুতে বলয়রূপে শেষ শম্ভুর সেবা করে।[১৮৮]

ইহার অপর একটি শ্লোকে শিবের বন্দনায় বির্য্যমিত্র প্রার্থনা করিয়াছেন দেবতা শিব রক্ষকর্তারূপে যেন সকলকে রক্ষা করেন :

শিবের মস্তক তোমাকে যেন রক্ষা করে। ইহা গঙ্গার উল্লম্ফন যেন অর্ধচন্দ্রের ন্যায় শীর্ষে উঠা প্রবল বায়ু শো শো শব্দ বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎক্ষিপ্ত করোটিগুলি গহ্বরের অভ্যন্তরে আবর্তিত হইতেছে। ইহার বক্তিম ও জড়ানো কেশগুচ্ছ বিস্তৃতভাবে উড়িতেছে। যেন সর্পমালা নৃত্যের অবিরাম গতিতে অবসন্ন হইয়া পিছলাইতেছে।[১৮৯]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত সংকলন গ্রন্থেও শিবের বন্দনা প্রকাশিত হইয়াছে। গদাধর বৈদ্যের একটি শ্লোকে ত্রিভুবনের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকারী হিসাবে নিবেদনচ্ছলে বলা হইয়াছে :

যখন মুরারী গরুড়কে দূরে উড়াইয়া দিয়াছেন, গ্রহসমূহ ব্যস্ত বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, দিকপতিগণ বায়ুকে বারণ করিয়া নত হইয়াছিলেন তখন যে শিবের সপরূপী হারলতা নিশ্চল হইয়াছিল, ভালেন্দু স্থির হইয়াছিল. স্বর্গ গঙ্গা অচল প্রবাহা হইয়াছিল এবং যাঁহার চিত্ত গভীর সমাধিমগ্ন ও শান্ত ছিল সেই শিব ত্রিভুবন রক্ষা করুন।[১৯০]

কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া শুধু বিষ্ণু ও হরিভক্তি বিষয়ক শ্লোক রচনা করেন নাই, আবার তিনি নিজেও শুধু বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন না। তিনি পঞ্চদেবতারও উপাসক ছিলেন। তাহার অনেক শ্লোক সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একটি শ্লোকে কবি জয়দেব শিবের বন্দনায় বলিতেছেন :

যিনি ভস্মচ্ছলে ভূমি, স্বর্গ গঙ্গাচ্ছলে জল, ভাল নয়নচ্ছলে অগ্নি, সর্পশ্বাস লক্ষিত বায়ু এবং বিশাল ও ভীষণ মুখগহ্বরচ্ছলে আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন (ও) পঞ্চভূতের দ্বারা নিত্য বিশ্বকে বিস্তার করিতেছেন, সেই মৃগাঙ্ক মৌলি (শিব) আপনাদিগকে সম্পদ বিতরণ করুক।[১৯১]

আর্যাসপ্তশতী গ্রন্থের প্রারম্ভেই শিবের বন্দনা করা হইয়াছে। প্রিয়ার ধ্যানে মগ্ন শিবের প্রশস্তি গাহিয়া বলা হইয়াছে :

কঙ্কনরূপ ফণী যে সন্ধ্যার অঞ্জলিরূপে গৃহীত জল পান করিতেছে, ইহাও যাহার অগোচরে, প্রিয়ার ধ্যানে মগ্ন, সখী বিজয়া কর্তৃক যিনি উপহাসিত হইতেছেন সেই শিব জয়যুক্ত হউন।[১৯২]

আর্যাসপ্তশতীর অপর একটি শ্লোকে প্রেমবিহ্বল শিব মানান্তে প্রিয়া কর্তৃক প্রেমালিঙ্গন করিতে এই দৃশ্য বর্ণনাচ্ছলে শিবের গুণকীর্তন করা হইতেছে :

প্রণয় কুপিতা প্রিয়াপদের লাক্ষা সংযোগে যাঁহারা ললাটচন্দ্র সুন্দররূপ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার গ্রীবাদেশ প্রিয়ার বলয়--কনকের কষ্টিপাথর স্বরূপ হইয়াছে. সেই শিব জয়যুক্ত হউন।[১৯৩]

লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বম গ্রন্থে শিবপূজার উল্লেখ আছে, বিবাহিত রমণী ও কুমারী মেয়েরা নিজেদের কল্যাণ কামনায় প্রযুক্তা হইয়া ধর্মীয় নিয়মকানুন মন্ত্রাদির দ্বারা শিবের পূজা বিধেয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন. তিনি অন্যের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

কুমারীগণের বিশিষ্ট পতিলাভ কামনায় এবং স্ত্রীগণের সৌভাগ্য কামনায় দ্বিতীয় ত্র্যম্বক মন্ত্রের দ্বারা শিবপূজা করা কর্তব্য। এ বিষয়ে কাত্যায়ন বলিতেছেন...পরবর্তী মন্ত্রের

দ্বারা কুমারীগণ পতিকামা হইয়া এবং স্ত্রীগণ সৌভাগ্যকামা হইয়া (শিবের পূজা করিবে)।

ত্র্যম্বকং যজামহে...মুক্ষীয় মহামতঃ॥

এই উত্তর ত্র্যম্বক মন্ত্রের ঋষ্যাদি পূর্ববৎ, বিনিয়োগ কেবলমাত্র পরিবর্তিত—কুমারীর অগ্নি পরিক্রমণে। পতি বেদনম্ (পতি=ঈশ্বর, তাঁহার বেদন, প্রাপ্তি ; যিনি জন্মান্তরে পূজাদি দ্বারা আরাধিত হইয়া স্বয়ং পতিরূপে আবির্ভূত হন। সেই ত্র্যম্বকং (শিবকে) যজামহে উপাসনা করি) ; বিশেষণ ও উপমা প্রভৃতির অর্থ পূববমন্ত্রবৎ। 'ইতঃ মুক্ষীয়, মামুতঃ (ইতঃ-এই সংসার হইতে) মুক্ষীয় (মুক্ত করে) মা অমৃত (মোক্ষ হইতে বঞ্চিত করিও না।)[১৯৪]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের একস্থানে লক্ষ্মীর শিবপূজা প্রসঙ্গে শিবভক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

পূর্বে একদা ভগবান শঙ্কর ও আমি পৃথিবীতে গমন করিয়াছিলাম। হে কান্তে ' তথায় আমি প্রিয় প্রাপ্তি কামনায় দশদিক পর্য্যটন করত মনে মনে স্থির করিলাম, আমি এইরূপ দশবিদিকও ভ্রমণ করিব, এইরূপ করিয়া যাহাকে দেখিতে পাইব, সেই আমার অকৃত্রিম প্রিয় হইবে। মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টিপাত হওয়ায় পূর্ব্বজন্মাজিতা বিদ্যার ন্যায় পরস্পর মহতী প্রীতি জন্মিল, সুতরাং সেই মহেশ্বর সেই জানার্দ্দন, আমাতে ঘটদ্বয়স্থিত জলের ন্যায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের অর্চ্চনা করে সেও আমার প্রিয় হইয়া থাকে। হে কমলালয়ে। যে ব্যক্তি শিবপূজায় পরাঙ্মুখ, সে কখনই আমার প্রিয় নহে।[১৯৫]

অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গ্রন্থের শিব শব্দের ভাবার্থের সুন্দর বিশ্লেষণ করা হইয়াছে :

"শি" শব্দে পাপ নাশক ও "ব" শব্দে মুক্তিদায়ক, বোধ হয় এ কারণে মনুষ্যগণের পাপ নাশক ও মুক্তি (দায়ক) মহাদেবকেই পণ্ডিতেরা শিব শব্দে কীর্ত্তণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তির প্রতি কথায় "শব" এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারিত হয়, নিশ্চয় তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।[১৯৬]

সুতরাং এই সকল উল্লেখ হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, সেনামলে বাংলায় শৈব ধর্মের প্রভাবও ছিল প্রবল এবং তৎকালীন গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি এই কারণেই মানুষকে দারুণভাবে শিবভক্তি প্রকাশ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

সেনামলে শিবের বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সদাশিব তাহাদের অন্যতম। উল্লেখ্য যে, সেন নৃপতিগণ সদাশিবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ইহার প্রমাণ রাজকীয় মুদ্রায় সদাশিবের মূর্তি অঙ্কন।[১৯৭] অবশ্য সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলাদেশে সদাশিব মূর্তির প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আর. সি. মজুমদার বলিয়াছেন যে, শৈব আগম হইতে সদাশিব পূজার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা উত্তর ভারতেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। সেখান হইতে দক্ষিণ ভারতে ইহা প্রচলিত হয়। অতঃপর সেনরাজগণ তথা হইতে বাংলাদেশে প্রচলন

করেন।[১৯৮] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও প্রায় একই মত পোষণ করিয়াছেন এবং তিনি আরও মনে করেন যে, উত্তর ভারতের সদাশিব পূজার প্রচলন হইলেও দক্ষিণ ভারত হইতে বাংলাদেশে তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে।[১৯৯] আর ইহার ভক্ত হিসাবে বাংলাদেশে প্রচলনের কৃতিত্ব সেনরাজগণেরই প্রাপ্য।

বাংলাদেশে অর্ধ–নারীশ্বর মূর্তির নিদর্শন খুবই কম আবিষ্কৃত হইয়াছে। উমামহেশ্বরের মিলিত রূপ অর্ধ–নারীশ্বর। দক্ষিণ পার্শ্বে শিব–বাম পার্শ্বে উমা হিসাবে কল্পিত হইলেও একই সঙ্গে অর্ধ–নারীশ্বরের পূজা সম্পন্ন হয়। বর্তমানে রাজশাহী বরেন্দ্র যাদুঘরে অর্ধ–নারীশ্বরের একটি প্রতিমা রক্ষিত আছে (প্লেট নং ৩, চিত্র নং ২)। ইহা মুন্সিগঞ্জের পুরাপাড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহা একাদশ শতকের বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত। শিবপুত্র গণেশ ও কার্তিকের মূর্তিও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২০০] কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে কার্তিকের মন্দির ছিল।[২০১] কিন্তু গণেশের তুলনায় কার্তিকের পূজারী খুব বেশি ছিল না এবং পাহাড়পুরের টেরাকোটা শিল্পে গণেশের মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে।[২০২]

৩. শক্তি ধর্ম

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল হইতেই শক্তি ধর্মের প্রচলন হইয়াছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম–অষ্টম শতকের দেবীপুরাণে বলা হইয়াছে রাঢ়া, বরেন্দ্র, কামরূপ–কামাখ্যা, ভোট্টদেশে বামাচারী শক্তি সম্প্রদায় দেবীর পূজা অর্চ্চনা করিত।[২০৩] ইহা হইতে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় খ্রিষ্টীয় সপ্তম–অষ্টম শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে শক্তি পূজা প্রচলনের কথা এবং ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের স্রোতধারার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি ধর্মের স্রোতধারাও বাংলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়াছেন।[২০৪] অপরদিকে শশিভূষণ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন, "বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবী মূর্তি প্রাপ্ত হইলেও দেবী পূজারূপে শক্তিধর্মকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি গৌণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন করিয়া এবং শক্তিকে অবলম্বন করিয়াও তান্ত্রিক সাধনা এই যুগের মধ্যেই একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।"[২০৫] সুতরাং বলা যায় যে, পরবর্তীকালে বাংলাদেশে শক্তিধর্মের প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শশিভূষণ দাসগুপ্ত খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে এই ধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা বলিয়াছেন।[২০৬] অবশ্য প্রাচীন বাংলাদেশে ইহার প্রচলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং প্রাচীন মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। তাই বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এই তন্ত্র সাধনার প্রচলন ও প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে শুরু হইলেও পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের তন্ত্র প্রভাব খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মহাযান বৌদ্ধধর্মকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছে[২০৭] এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তি ধর্মে ইহার প্রভাব পড়িয়াছে।[২০৮] যদিও বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত তন্ত্রসাহিত্য দ্বাদশ শতাব্দীর পর রচিত হইয়াছে।[২০৯] কিন্তু এই ধ্যান কল্পনা গুপ্তোত্তর বা পালযুগেই সূচনা ও সুপ্রচলিত

হইয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে নীহাররঞ্জন রায় বেশির ভাগ তন্ত্র গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত এবং এখানে তান্ত্রিক ধ্যান কল্পনার একটি সমন্বিত রূপ গড়িয়া উঠিবার কথা বলিয়াছেন।[২১০] এইজন্য শশিভূষণ দাসগুপ্ত বাংলাদেশে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র হিসাবে জাতিভেদ প্রথার পার্থক্য খুব বেশি আছে বলিয়া মনে করেন না। কারণ তাহার মতে, ভারতের তান্ত্রিক সাধনা মূলত একটি সাধনা। এই সাধনার দার্শনিক দিক হইতে দেহকেন্দ্রিক গুহ্য সাধন পদ্ধতিই প্রধান। আবার এই সাধন পন্থাসমূহ পরবর্তীতে লোকায়ত বৌদ্ধ মতবাদে মিলিত হইয়া বৌদ্ধ তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। অপরদিকে এই সাধনা পন্থাই হিন্দু তন্ত্রের রূপ গ্রহণে সাহায্য করিয়াছে। তাই বৌদ্ধ প্রজ্ঞা উপায়ের পরিকল্পনা এবং উক্ত পরিকল্পনা মিশ্রিত সাধনা এবং হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধন পন্থার মধ্যে বিশেষ মৌলিক পার্থক্য অনুভূত হয় না।[২১১]

সেনামলের লিপি তথ্যে সমসাময়িক বাংলাদেশে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের অল্পবিস্তর চচার সংবাদ পাওয়া যায়। ভবদেব ভট্ট তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।[২১২] কিন্তু তন্ত্র সাধনার কোন বিস্তৃত তথ্য সেন আমলের লিপিমালায় পাওয়া যায় না। অবশ্য এই সময়ের কিছু মূর্তি হইতে তৎকালীন শক্তিধর্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়। উমা-মাহেশ্বর, হর-গৌরী, শিব দুর্গা এবং অর্ধনারীশ্বর প্রভৃতি মূর্তিতে তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে।[২১৩] সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, আর্যাসপ্তশতী প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরী, পার্বতী, দুর্গা, অর্ধনারীশ্বর এবং দেবীকালী সম্পর্কেও বহু শ্লোক রহিয়াছে।

দেবদেবীর রূপলাবণ্য এবং গুণকীর্তনের বর্ণনা হইতেও তৎকালীন জনজীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট। দেবদেবীর বর্ণনায় তাঁহাদের ক্রোধ, প্রেম, স্নেহ, ঈর্ষার প্রতিফলনে দৈবীয় মহিমার সহিত সাধারণ মানবের মানসিক স্তর যেন সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কবি রাজশেখরের একটি শ্লোকে সন্ধ্যাচনার বিষয় উত্থাপিত হওয়ায় দেবীর মুখপদ্ম বিকৃত হইয়াছে, তখন মহাদেব দেবীর বিকৃত মুখ পদ্মের তুলনা দিয়া বলিতেছেন : 'দেখ, দেবী, আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখমণ্ডলের ন্যায় ঐ সরোবরে পদ্মগুলির একই দশা উপস্থিত হইয়াছে।' এই বলিয়া দুই হস্তদ্বারা পদ্ম সংকোচনের অনুকরণের ছলে পার্বতীকে বঞ্চিত করিয়া মহাদেব কৃতাঞ্জলি দিয়া সন্ধ্যার্চনা করিয়া ফেলিলেন : অস্পষ্ট আলোকে শম্ভুর চিরাচরিত প্রার্থনা তোমাকে আশীর্বাদ করুক, এমন একটি প্রার্থনা যাহাতে তাহার হস্তগুলি তাহার পত্নীকে প্রতারিত করে, বদ্ধপদ্মের অনুকরণে আবদ্ধ করিয়া যেন বলিতে চায়, "দেখ, দেবী, আকাশ যেমন রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে, ঐ পদ্মগুলিও যাহারা তোমার মুখমণ্ডলের সমতুল্য তাহারা এইরূপ ধারণ করিয়াছে।"[২১৪]

অনেক সময় গৃহিণী স্বয়ং গৃহপতির সান্ধ্য-আহ্নিকাদি অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাইতে সাহসী হইতেন না, তখন এই কাজে শিশুদের উৎসাহিত করিতেন। গৃহপতি কখনও রাগিয়া যান, আবার কখনও সহজে গ্রহণ করেন। সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে হরপার্বতীর সংসারেও এই চিত্র পরিস্ফুটিত। এখানে হস্তের উপর হস্ত মিলাইয়া আসনে শঙ্কর সন্ধ্যাঞ্জলি দান করিতেছেন ; তাহা দেখিয়া মাতা পার্বতীকে কার্তিক বলিতেছে, "মা, বাবা অঞ্জলিপুটে কি লুকাইয়া রাখিয়াছেন?" পার্বতী বলিলেন, 'বৎস, নিশ্চয় একটি স্বাদু ফল।' কার্তিক বলিল,

তিনি ইহা আমাকে দিবেন না।' পার্বতী বলিলেন, তুমি নিজে যাও এবং উহা গ্রহণ কর এইরূপে মাতা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া অগ্রসর হইয়া শম্ভুর সান্ধ্যবর আরাধনায় করবেষ্টিত সন্ধ্যাঞ্জলি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, শম্ভুর ধ্যান ভগ্ন হইল. কিন্তু তিনি ক্রোধ প্রশমিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন।"[১১৫] আবার অর্ধনারীশ্বর শম্ভু সন্ধ্যাচনা করণার্থে হস্তে জল নিয়াছেন ; সেই জলে গৌরীর মুখে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহা দৃষ্টে শিবের সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইল, হস্ত কম্পমান, তাই সন্ধ্যাচনার জল মাটিতে পতিত হইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ স্বেদোদ্গম হইতেছে, ইহাতে শূন্য হস্ত স্বেদজলে পূর্ণ হইতেছে। সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে যুগপৎ কম্প ও স্বেদে অভিভূত প্রেমিক মহাদেবের চিত্রটি আকর্ষণীয় :

> জয়যুক্ত হউক শম্ভুর সেই সলিলাঞ্জলি, গৌরীর প্রতিবিম্বিত মুখ দৃষ্টগোচর হওয়ায় মহাদেবের প্রকম্পিত শিথিল হইতে জল পড়িয়া যাইতেছে. আবার স্বেদজলে তাহা পূর্ণ হইতেছে।[১১৬]

আচার্য গোবর্ধনও দেবায়ত প্রেমের বর্ণনায় শিব ও পার্বতীকে বিভাব হিসারেও গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কবি পারিবারিক পরিবেশে মানবীয় প্রেমকে দেব জীবনে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শিবের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া একটি চিত্রের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে :

> জয় হউক সেই দেবতনু, যে দেবীর পাণিস্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়াছে ; মনে হইতেছে, ভস্মাবশেষ মদনই যেন তাহাতে রোমাঞ্চরূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে।[১১৭]

অন্যদিকে বর শিবের সহচর সর্প ভূতাদির ভয়ে ভীত পার্বতী ও তাহার মাতা মেনকা বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র ও ঔষধি ব্যবহার করিয়াছেন। সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে এই উদ্দেশ্যে পার্বতীকে বিবাহের পূর্বে এক একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একটি প্রতিষেধক ব্যবহার করিতে দেখা যায় :

> পার্বতী শিবের অঙ্গস্থিত গোনাস সাপের জন্য বিষনাশক ধূলি লইয়াছেন, সর্পের জন্য দেহে বন্ধন করিয়াছেন ঔষধি ; হস্তস্থিত মহাশক্তিশালী বিষের প্রতিকারার্থে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন মণি, আর ভূতগণের প্রতিষেধার্থ গ্রহণ করিয়াছেন গোত্রজরতী নির্দিষ্ট মন্ত্রাক্ষর ; বিবাহকালে এইরূপে সজ্জিতা পার্বতী প্রীত এবং ভীত হইতেছেন।[১১৮]

এই সর্প আবার স্থূল রসিকতার জিনিসও বটে। সর্পবন্ধন করিয়া মহাদেব অজিনবসন বা ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান করিতেন। ধর্মাশোকের একটি শ্লোকে ইন্দ্র গারুত্মতমণি ধারণ করিয়া শিবের সম্মুখে অবনত হইয়া আছেন ; মণি-ভয়ে অজিন বন্ধনের ফণিপতি পলাইয়া যাইতে থাকিলে শিব বসনাঞ্চল সম্বরণে ব্যস্ততা দেখাইতেছে ; অদূরে পার্বতী আপাঙ্গ বিক্ষেপসহ হাস্যমুখী হইয়া উঠেন।[১১৯]

অন্যত্র শিব কর্তৃক দেবী সম্ভোগের বিচিত্র বর্ণনা বেশ আকর্ষণীয়। কবি রাজশেখর বলিতেছেন :

> শম্ভু যখন অচলদুহিতা (পার্বতী)-র মুখ কমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্ম গহন

জটাগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত করিয়া স্কন্ধ হইতে নামিয়া যাইতেছে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা গ্রহণপূর্বক খুরাগ্র দিয়া নয়ন ঘষিতে থাকে।[২২০]

কবি গোবর্ধন বলিতেছেন, নিশা সম্ভোগে গৌরীর নয়নের কাজল শম্ভুর অধরে লাগিয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা মনে করিতেছেন, নীলকণ্ঠ সম্ভবত গরল বমনে উদ্যত। তাই সৃষ্টি ধ্বংস ভয়ে তিনি আতঙ্কিত। কিন্তু সম্ভোগ চিহ্ন দেহে প্রকট, শম্ভু সেই লজ্জায় অবনত :

এই বিষ বমন করিও না, সংবরণ কর সভয়ে পিতামহ দ্বারা এইরূপ উক্ত হওয়ায় যিনি লজ্জিত, প্রভাতের সেই কজ্জল মলিনাধর শম্ভু জয়যুক্ত হউন।[২২১]

নববিবাহিতা কন্যার পতি সোহাগিনী হইবেন, ইহাই মাতার কামনা ; তাই অনেক সময় কন্যা জামাতার দেহে সম্ভোগ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। তখন পাড়াপ্রতিবেশীদের কানাকানিতে মাতার আনন্দ বৃদ্ধিই পায়। গৌরী মাতা মেনকাও সেইরূপ আনন্দিত : প্রভাতে উঠিয়া হাস্য উজ্জ্বল বধূগণ জামাতা শিবের ওষ্ঠে অঞ্জনের কাল অঙ্কন, আর কন্যা গৌরীর স্তনদ্বয়ে অঙ্গুলির ভস্ম-চিহ্ন দৃষ্টে ; তাহারা তখন নারীসুলভ স্বাভাবিক প্রেমোল্লাসে গৌরীর মাতার কানে কানে কি যেন সব বলিতে লাগিল।[২২২]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত কোষ কাব্যে আছে, বিবাহ পরবর্তীকালে সুন্দবী গৌবী শিবের অতিশয় আদরিণীয় হইয়াছেন। এইজন্য কবি ভগীরথদত্ত গৌরী হর-হৃদয়-তড়াগ-রাজংসী বলিয়াছেন।[২২৩] তাঁহার নববিবাহের মধুর দিবসগুলি বিবিধ কর্মলীলায় অতিবাহিত হইয়াছে। মহাদেব রতিসমুৎসুকা অথচ অন্যভাবে ভীতা নববিবাহিতা বধূকে বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত করিয়া গৌরীকে সংগম প্রার্থনা করিতেছেন। কবি কঙ্কোলের একটি শ্লোকে : জন্মথকেলি কৌতুক বিধিতে নববধূ পার্বতী স্বভাবতই ক্রীড়াবর্তী ; শিবকে তাই তাহাকে নানাভাবে প্রতিবোধিত করিতে হইতেছে। শিব পার্বতীকে লজ্জিতা দেখিয়া বলিতেছেন, হে সুন্দরী, চন্দু শিশু, তাহাকে স্রুতসুধাধারা দিয়াই আপ্যায়ন করা হইয়াছে (সুতরাং তাহাকে লজ্জা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই) ; ফণীশ্বর এখন ঘুমাইয়া আছেন ; আর সুরধুনীকে জটামণ্ডলে রুদ্ধ করা হইয়াছে (বাহির হইতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না।)[২২৪]

শম্ভুর সম্ভোগে সর্বেন্দ্রিয় গৌরীতে আসক্ত। উমাপতিধরের একটি সম্ভোগ বর্ণনার দৃশ্যে :

পুরারি (ত্রিপুরারি) শিবের কর্ণ সংসক্ত গৌরীর মুগ্ধ বচনে ; দৃষ্টি নিপতিত গৌরীর বদন ইন্দুতে ; বসনা মগ্ন স্বাদু বিম্বাধর-মধুতে ; নাসিকা নিষণ্ণ-অঙ্গ পরিমলে ; আর শৈল সুতার গাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দে শিবের দেহও বিলীন হইয়া গিয়াছে।[২২৫]

সাহিত্যে অন্য ধরনের চিত্রও বর্তমান। গৌরী অভিমান করিয়া আছেন, কারণ হরের মুখে অপর রমণীর নাম শুনিয়াছেন। চক্রপাণি কবির একটি শ্লোকে আছে :

কুপিতা গৌরীকে শিব অনেক অনুনয়-বিনয়পূর্বক প্রেমাঞ্জলি দিয়া বলিতেছেন, তাহার (উক্ত নারী) নাম ভ্রান্তিবশতই আমি বলিয়া ফেলিয়াছি ; হে গৌরী, তোমার জন্যই তো আমি। তাহা তোমার অজানা নয়। তাই প্রসন্ন হও দেবী ; হে দয়াবতী, ক্রোধ পরিত্যাগ কর।[২২৬]

প্রিয়ার মানভঞ্জনে প্রযুক্ত মহাদেবের চিত্র সত্যই আকর্ষণীয়। এই কারণে আবার কখনও প্রিয়ার প্রণামে নিযুক্ত আছেন। গৌরীর পদে নত হইয়া শিব বারবার প্রণাম করিতেছেন। শম্ভু গৌরীর পদানত হইয়া আছেন ; গৌরীর পদের দশটি নখদর্পণে দশটি শিবের প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; তাহার সঙ্গে প্রযুক্ত স্বয়ং শম্ভু যেন একাদশ শিব রূপে শোভা পাইতেছেন।[২২৭] আবার কখনও মানান্ত মিলনে প্রিয়া কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইতেছেন। প্রতিটি চিত্র মানবীয় প্রেমরঙে রঞ্জিত। তিনি রতিপণে মানবের ন্যায়ই দ্যুত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত প্রিয়ার অধর সুধার আশায় ললাটের চন্দ্রকলাকে পণ ধাবিতেছেন, গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন :

> একমাত্র মহাদেবই প্রিয়ার অধর সুধার মর্যাদা অনুধাবন করিতে পারেন। তাই তিনি বিষে আর অমৃতে ভেদাভেদ না করিয়াই বিষপান করেন। তাহার নিকট একমাত্র অমৃত প্রিয়ার অধরসুধা। অন্য দেবতারা এই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ।[২২৮]

এই প্রেম তরঙ্গের নায়িকা পাবতী উমা। তাঁহার হুঙ্কারে কণ্ঠালিঙ্গনযোগ্য চন্দ্রশেখর তদান্তে পতিত হন। রতিদূতে তিনি প্রতিপণরূপে স্বয়ং বিম্বাধার পণ রাখেন। তিনি পত্নীরূপেও সৌভাগ্যশালিনী। এই সৌভাগ্যবশে তিনি পতিকে বশীভূত করিয়াছেন। আর্যাসপ্তশতীর একটি আর্যায় উমার প্রেমের প্রশংসা এইভাবে করা হইয়াছে :

> ভস্ম-মলিন গিরিশের প্রতি তুমি যথার্থই প্রেয়সী। অন্যরা বলে তুমি ঔর্যধি প্রস্থের দুহিতা, ঔষধ গুণে পতিকে বশ করিয়াছ—এই জনপ্রবাদ সত্যিই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।[২২৯]

এই কারণে দেবী পার্বতী অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই তাহাকে অন্যান্য দেবতার সহিত সকলকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত উমাপতিধরের একটি শ্লোকে আছে :

> যে কার্তিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় না, গণেশের প্রতি মস্তক অবনত করে না, বিনীত দেবগণের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয় না ; আর অধিক কি, যে পার্বতী দেবীকে প্রণাম করে না, সেই অকপট ক্ষীণ ভৃঙ্গীর একনিষ্ঠ ভক্তি জয়লাভ করুক।[২৩০]

শিবের নিকট দেবী পার্বতী নৃত্য শিক্ষাভিলাষিণী লাস্যময়ী হিসাবে বিরাজিত আছেন। নটরাজ শিব-নৃত্যে আদিগুরু, লাস্যময়ী পার্বতী স্বয়ং এই নটরাজের শিষ্যা। তাই শিব নানা প্রকারের নৃত্যে পার্বতীকে প্রশিক্ষণ দিতেছেন। হর পার্বতী শিবের হস্ত ধরিয়া নৃত্যের প্রতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ লইতেছেন, যোগেশ্বর বলিতেছেন,

"প্রথমে শিব পার্বতীকে দেখাইতেছেন, হে সুভ্র, বাহুলতা এইভাবে স্থাপন কর, এবং এইরূপ ভাবভঙ্গি ধারণ কর ; বেশি নমিত হইও না, চরণের অগ্রভাগ কুঞ্চিত কর—কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাও। এইভাবে শিব বলিতেছেন, নিজের মুখ-মরুজের দ্বারাই বজ্রধ্বনি মধুর গুরুগম্ভীর ধ্বনি করিতেছেন, তাল দিয়া দিয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন।"[২৩১]

যাহাই হউক, এই শক্তি উপাসনায় শাস্ত্রীয় বহু বিধিনিষেধ আছে। লক্ষ্মণসেনের মহামন্ত্রী হলায়ুধ তাহার ব্রাহ্মণসর্বস্বম গ্রন্থে বলিতেছেন যে—

> অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা। উক্ত মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি অশ্ব দেবতা, অনুষ্টপ ছন্দ, অন্বমেধ-যজ্ঞের পত্নীবাচনে ইহার বিনিয়োগ। এই মন্ত্রের এইরূপ

বিনিয়োগ হইলেও মন্ত্রের দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, চণ্ডীপূজায় ইহার বিনিয়োগ হইতে পারে।

অম্বে অম্বিকে. .কাম্পীলবাসিনীম্॥

অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা এইগুলি দুর্গার নাম।

অর্থাৎ,

হে অম্বে ! হে অম্বিকে ! হে অম্বালিকে !

আমাকে কেহই স্বামীর নিকট লইয়া যাইতেছে না। সেই কুস্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়া সুভদ্রা কম্পীলবাসিনী অন্য নারীকে সঙ্গে লইয়া শয়ন করে।

এখানে আমার দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবতী আমাকে স্বামীযুক্তা করুন, ইহাই অভিপ্রায়।[১১২]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে : "শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধকালে বিষয়াসক্ত মানব মদ্য, মৎস্য, ও নরবলি দ্বারা শক্তির উপাসনা করিবেন না।"[১১৩]

অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শক্তি-দেবী সম্পর্কে সুন্দর উক্তি করা হইয়াছে :

নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা, আকাশ, কাল, দিক যেরূপ নিত্য, গোলকও সেইরূপ নিত্য; তাহার একদেশ বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ। পরমব্রহ্মে সর্বদা লীনা সনাতনী নিদ্রারূপিণী প্রকৃতিও নিত্যা। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি চন্দ্র ও পদ্মে শোভা এবং সূর্যে প্রভা যে রূপ নিয়ত যুক্তা, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার সহিত নিয়ত সংযুক্তা একা মুহূর্তও ভিন্না নহেন। যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণভিন্ন কুণ্ডল গঠন করিতে সক্ষম হয় না। কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট গঠন করিতে সক্ষম হয় না। সেইরূপ পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। তিনি সকল শক্তিরূপিণী, তাঁহার দ্বারা সকল লোক শক্তিমান। "শক" শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায় এবং "তি" শব্দ পরাক্রমবাচক। যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী হইয়া তাহা প্রদান করেন, তিনিই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।[১১৪]

সুতরাং তৎকালীন সমাজজীবনে শক্তিধর্মের প্রভাব নিশ্চয়ই অধিক ছিল, তাহাই তৎকালীন সাহিত্যে বিধৃত হইয়াছে এবং গার্হস্থ জীবনের পটভূমির উপরেই তাহা চিত্র বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। দেবদেবীকে লইয়া ভাষা সাহিত্যের কবি-সাহিত্যিকগণ তাহাদের যুগে নিজেদের সমাজ ও পরিবারের চিত্র অবলম্বন করিয়াই জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই শ্লোকে দেবীর পূর্বরাগ, বিবাহ, নবোঢ়ারূপ, নবসম্ভোগ, প্রেম- কৌটিল্য, মান--অভিমানের যে আতিশয্য বর্ণনা তাহার আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য লক্ষণীয় তাহা অনস্বীকার্য। মানবীয় দাম্পত্য প্রেম স্বীয় মহিমায় হরগৌরীকে তুলিত করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে গার্হস্থ জীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে নিখুঁত বলা যায়। দেবদেবী শুধু আরাধ্যই নয় তাহারা সাধারণ মানুষের অতি প্রিয়। তাই সমসাময়িক সাহিত্যে তাহাদের প্রেম, ভালোবাসা ও জীবনযাত্রার চিত্র যেন সমকালীন সমাজজীবনেরই প্রতিফলন।

সেন আমলে শক্তি ধর্মের প্রতিমা কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে (প্লেট নং ২, চিত্র নং-৩)। উত্তর বাংলায় চতুর্ভুজা দেবীর একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। এই দেবীর

হস্তদ্বয়ের একটিতে পদ্ম, অন্যটিতে দর্পণ। তাহার পাদপৃষ্ঠে গোধিকার প্রতিকৃতি, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে পদ্মকলি হস্তে এক নারী দণ্ডায়মান। এই প্রতিমাটি বর্তমানে কলিকাতা চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।[২৩৫] রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে "চণ্ডী দেবী" নামক একটি চতুর্ভুজা প্রতিমা মূর্তি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই চণ্ডী মূর্তিটি ঢাকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বাহন হইল সিংহ, দেবীর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের একটিতে পদ্মফুল ও অন্যটিতে জলপাত্র রহিয়াছে এবং বাম হস্তদ্বয়ের একটিতে দেবী কুঠার ও অন্যটিতে বরাভয় মুদ্রা ধরিয়া আছেন। দেবীর দুই পার্শ্বে দুই সখী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পাদপৃষ্ঠের নিম্নের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মল্লদেবীর পুত্র রাজকর্মচারী দামোদর মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ লইয়াছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[২৩৬] কিন্তু ইহাকে কেন "চণ্ডী" বলা হইয়াছে তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নাই। কারণ অন্য প্রমাণযোগ্য তথ্যে ইহাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[২৩৭] যাহাই হউক ইহাকে সেন আমলের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায়।

৪. সৌর ধর্ম

সৌর ধর্মের প্রচলন ও প্রসার সেনযুগের ধর্মীয় অবস্থার আরেকটি বিশিষ্ট দিক। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় গুপ্তযুগের বাংলাদেশে সৌর ধর্মের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণরাই উদীচ্য বেশী সূর্য প্রতিমা ও ইহার পূজার প্রচলন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন এবং ক্রমশ তাহা পূর্বভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল।[২৩৮] যাহাই হউক সেন রাজত্বে ইহার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সৌর পূজা রাজকীয় ধর্ম হিসাবে গণ্য হয়। রাজা লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ছিলেন সূর্যভক্ত, পরম সৌর। তাঁহাদের লিপিমালার সূচনা শ্লোকেই সূর্যের বন্দনা প্রকাশিত হইয়াছে :

> আমি তাহাকে (সূর্যকে) পূজা করি, যিনি কমলবনের সখা, তিমির কারাবদ্ধ ত্রিলোকের মুক্তিদাতা এবং বেদবৃক্ষের আশ্চর্য পক্ষী।[২৩৯]

সুভাষিতরত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও সূর্যের অনেক বন্দনা শ্লোক রহিয়াছে। সুভাষিতরত্নকোষে উদ্ধৃত রাজশেখরের একটি সুন্দর শ্লোকে বলা হইয়াছে :

> তীব্র আলোকময় সূর্য যিনি সীমাহীন ধরণীর ঊর্ধ্বে ও নিম্নে তাহার অশ্বদের লইয়া শকট চালনা করিতেছেন, যাহার চক্র ইহার ফলে আবর্তিত তরবারির ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছে, আমি প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাহার আলোর তীর দ্বারা যাহা প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণের বর্শার মত, সকল অন্ধকার দূরীভূত করিয়া যেন তোমাকে সহায়তা করেন।[২৪০]

আবার এই গ্রন্থে বরাহ মিহিরের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে :

> সূর্যের প্রশংসা করি, যিনি সর্পের মস্তকাবরণ তথা পূর্ব পাহাড়ের মণি ;
>
> যিনি স্বর্গের নীলাকান্ত বৃক্ষের স্বর্ণালী ফুল, যিনি প্রধান সাধুর বিদায় পাত্র, যিনি জন্ম জন্মান্তরের সমুদ্র অতিক্রম করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।[২৪১]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে উমাপতিধরের একটি শ্লোকে সৌরভময় পূর্বদিককে নমস্কার করা হইয়াছে :

> সুর যুবতীগণের গান শ্রবণে উদগ্রীব হরিণের শৃঙ্গ দ্বারা উল্লেখিত শশাঙ্কের সুধারূপ জলে শ্যামল উদ্যান শোভিত এবং দেবেন্দ্রের করিকপোলস্রাবী মদবারির সৌরভযুক্ত পূর্বদিককে নমস্কার করি।[২৪২]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত উমাপতিধরের অপর একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে :

> যিনি সকলের জাগরণের ব্যবস্থা করিতে করিতে আনুষঙ্গিকভাবে স্বকীয় সরোরূহসমূহের শ্রীবিধান করেন, সেই ভগবান সূর্য উত্তপ্ত হইলেও সেবিতব্য। তাহার উদয়ে শুধু তাহার বন্ধু কুমুদই জাগ্রত হয়, কিন্তু এই সমগ্র জগতের শির ঘূর্ণিত হয়, সেই শশাঙ্ক শীতল হইলেও তাহার কি প্রয়োজন?[২৪৩]

ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে ভাগীরথী নদী তীরবর্তী সূর্যের মন্দিরের উল্লেখ করিয়া অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনা করিয়া বলা হইতেছে :

প্রণমি সেখানে সখা ভাগীরথী তীরে
রঘুকুল দেবতারে সূর্যের মন্দিরে যাইও
চলিয়া যেথা মহাদেব তাহার প্রিয়ার
করিয়া দান অর্ধ-আপনার আধ-নর
আধ-নারী প্রেমের লাগিয়া। তাঁহারে
হেরিলে হইবে পুলকিত হিয়া !
নেহারি' সে-অপরূপ মুরতি প্রেমের
অনুপম ভুরুধনু যত নারীদের
প্রেম- অভিমান টুটিয়া, বুঝি তাহারা চায়
গৌড়ীর সমান হইতে প্রেম গরিমায়।[২৪৪]

সেনযুগের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার হলায়ুধ, যাঁহার অদম্য প্রচেষ্টা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বিস্তার, তাঁহার ব্রাহ্মণ সর্বস্বম গ্রন্থে প্রারম্ভের মঙ্গলাচরণটিতে তিনি সূর্যের বন্দনা করিয়াছেন :

দীপ বদ্দ্যোতয়তি যো ভূর্ভুবঃ স্বর্জগৎত্রযীম।
সবিতুস্তং বয়ং ভর্গমপবর্গকং স্তুমঃ।।
দধানং চতুরাম্নায পুতাং মুখচতষ য়ীম্।
ত্রিদিবাভরণং কালত্রয় হেতু স্ত্রয়ীময়ঃ
ত্রিবর্গ প্রাপ্তি সরণিস্তরণিঃ শ্রেয় সেহস্তুবঃ।।
ত্রিলোক পূজ্যাং নমতি ত্রিসন্ধ্যাং যং ত্রিলোচনঃ।
ত্রিবর্গফলনির্মাত্রীং গামন্ত্রীং তামুপাস্মহে।।

> সবিতার (সূযের) যে ভর্গ (তেজঃ) ভূ, ভবঃ ও স্বঃ-এই ত্রিজগৎকে দীপের মতো আলোক দান করে সেই অপরর্গকর তেজের আমি স্তব (প্রশংসা) করি। সেই আদি মুনি (ব্রহ্মা) কে আমি প্রণাম করিতেছি, যিনি চারি বেদের দ্বারা পূত চারি মুখ ধারণ করিতেছেন এবং পদ্মকুসুমরূপ উটজে (কুটীরে) বাস করেন। সেই তরণি (সূর্যদেব)

আমাদের মঙ্গল বিধায়ক হউন, যিনি স্বর্গের (আকাশের) আভরণ স্বরূপ, অতীতাদিকাল ত্রয়ের হেতু, বেদময় (ঋক, সাম, যজুঃ) এবং ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ। যিনি ত্রিলোকের পূজ্যা, সাক্ষাৎ ত্রিলোচন যাহাকে ত্রিসন্ধ্যায় নমস্কার করেন, সেই ত্রিবর্গফল নিস্মত্রী গায়ত্রী দেবীর আমি উপাসনা করিতেছি।[২৪৫]

হলায়ুধ তাহার গ্রন্থের অপর একস্থানে আবার সূর্যপূজার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন :

সবিতা (আদিত্য) আয়াতি (আসিতেছেন)। কিরূপ সেই সবিতা? দেব (স্তুতি প্রভৃতি গুণযুক্ত)। কিসে আরোহণ করিয়া? রথেন (রথে)। কিরূপ রথে?—হিরণয়েন (সুবর্ণময়)। কি করিতে করিতে আসিতেছেন? ভুবনানি পশ্যন্ ভুবন মধ্যবর্ত্তী মনুষ্য-গণকে দেখিতে দেখিতে। পৃথিবীরূপ কমভূমিস্থিত এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাপ ও পুণ্যসমূহের কারক মানুষ্যগণের সকল কর্মের সাক্ষিবৎ দ্রষ্টা হইয়া। কেবল তাহাই নহে। অমৃতং (দেবতাকে), মর্ত্ত্যং (মানুষ্যকে), নিবেশয়ন্ (নিজ নিজ কমে নিযুক্ত করাইয়া)। মনুষ্যগণ সূর্যোদয় হইলে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া দেবগণকে প্রীত করে, দেবগণও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা মনুষ্যগণকে আপ্যায়িত করেন ; এইভাবে দেবতা ও মনুষ্যগণের পরস্পর কর্মে সহযোগিতা পুনঃপুনঃ প্রতিদিন এই দেশে আসিয়া সবিতা এই কর্ম-সম্পাদন করেন। কাহার সহিত আসিয়া? —রজসা (রাত্রিকালের সহিত)। কিরূপ রাত্রিকালের সহিত?—কৃষ্ণেন (মলিনেন-মলিন)। রাত্রিকালে সাধারণত পুণ্যকর্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া রাত্রিকালকে কৃষ্ণ অর্থাৎ মলিনতাযুক্ত বলা হইয়াছে। ইহাই বাক্যার্থ-যে সবিতা দেবতা ও মনুষ্যগণের কম ব্যাপারে ব্যবস্থাপক, যিনি কর্মভূমি পৃথিবীলোকে অবস্থিত মনুষ্যকুলের পুণ্য ও পাপের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া প্রত্যহ আবির্ভূত হন, তাঁহার পূজা করি।[২৪৬]

এই সম্পর্কে বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হইয়াছে :

যে ব্যক্তি...সূর্যের অর্চ্চনা করে, তাহার এই জন্মেই আরোগ্য, ধন ও ধান্য লাভ হয় এবং দেহান্তে পবিত্র অক্ষয় পদ প্রাপ্তি হয়। ...যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে বারংবার সূর্যপূজা ও নক্ত ভোজন করে সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়।[২৪৭]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অভিমতে সূর্য উপাসনাকারী বিভিন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে :

"ব্রহ্মা বলিলেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া বক্ষ্যমান মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক ভাস্করের সেবা করিলে তোমরা নিরোগ হইবে। "ওঁ হ্রীং নমোভগবতে সূর্যোয় পরমাত্ম নে স্বাহা", এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অতি সাবধানে ভগবান সূর্যকে ষোড়শপচারে এক বৎসর কাল পূজা করিলে নিশ্চয়ই তোমরা রোগ হইতে মুক্ত হইবে। সেই সূর্য্যের অপূর্ব্ব কবচ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি।

...যেমন গরুড়কে দেখিয়া সর্পগণ ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ এই কবচধারীর নিকটে ব্যাধিগণ ভয়ে গমন করে না। এই কবচ বিশুদ্ধ স্বভাব গুরুভক্ত আপন শিষ্যের নিকটেই

প্রকাশ করিবে। খল স্বভাব অপরের শিষ্যকে এই কবচ দান করিলে দাতার মৃত্যু হইবে। জগদ্বিলক্ষণ নামক এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী এবং স্বয়ং সূর্য দেবতা ; সকল প্রকাশ ব্যাধির বিনাশ এবং সৌন্দর্য লাভার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। এই কবচ ধারণ করিবা মাত্র পবিত্রতা লাভ হয় ; ইহা সকলের সার স্বরূপ এবং সকল প্রকার পাপের বিনাশক।...মহাকুষ্ঠী, গলিতাঙ্গ, চক্ষুহীন মহাব্রণী, যক্ষাক্রান্ত, মহাশূল-রোগাক্রান্ত এবং নানাবিধ ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য, একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া যদি এই স্তব শ্রবণ করে ; তাহা হইলে সে রোগ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয় এবং সর্বতীর্থ স্নানের ফল লাভ করে ; সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই।"[১৪৮]

সুতরাং এই সকল সাক্ষ্য তৎকালীন বাংলাদেশে সৌরধর্মের প্রভাব ও প্রসারের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই সৌরধর্মের প্রভাবের আর একটি নির্দশন হইল ঐ যুগের প্রাপ্ত প্রতিমা মূর্তি। সেনযুগের সৌর প্রতিমা অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে (প্লেট নং ২, চিত্র নং ২ ; প্লেট নং ৩, চিত্র নং ১)। রাজশাহী অঞ্চলে তিনমুখ ও দশ বাহু বিশিষ্ট সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিন মুখের দুইটি অতিশয় উগ্ররূপধারী এবং দশবাহুর আটটিতে শক্তি, খট্টাঙ্গ, পদ্ম, নীলোৎপল এবং ডমরু আছে।[১৪৯] ইহার এই সকল দৃষ্টে জীতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয় ইহাকে মার্তণ্ড ভৈরবের মূর্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১৫০] সূর্যের পুত্র রেবন্ত তাহার কয়েকটি মূর্তিও বাংলাদেশের অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরে প্রাপ্ত হস্ত মূর্তিটি বেশ উল্লেখযোগ্য। ইহা রাজশাহী যাদুঘরে রক্ষিত আছে। মূর্তিটি বুট জুতা পরিহিত এবং অশ্বারূঢ় ; এক হস্তে কশা, অপর হস্তে অশ্বের বলগা ; একজন অনুচর একটি ধরিয়া আছেন, ইহাতে দুইজন দস্যুর প্রতিকৃতিও রহিয়াছে ; একজন বৃক্ষ শীর্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া রেবন্তকে আক্রমণ করিতে উদ্যত।[১৫১] তাহা ছাড়া বাংলাদেশে অসংখ্য নবগ্রহের প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা নিশ্চয়ই সৌরধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাংলার এই নবগ্রহ ছিল নয়টি গ্রহের প্রতিকৃতি। ২৪ পরগণা জেলায় নবগ্রহের একটি প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে এই নবগ্রহের পৃথক মাত্র চন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রতিকৃতি রহিয়াছে।[১৫২]

তথ্যনির্দেশ

১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বাঙালীর ইতিহাস, (সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব), ১২শ সংস্করণ, (কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৮৩), পৃ. ১২২।

২ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ৪৮১।

৩ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১ম সংস্করণ, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭), পৃ. ২৪১।

৪ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, (কলিকাতা : সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১৩৫৮), আলোচনা ও বিচার, পৃ. ৬৮।

৫ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৬৯, পৃ. ২০৭।

৬ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮১-৪৮২।

৭. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮১।

৯ ঐ, শ্লোক নং ২৬২, পৃ. ২০৫।

১০ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬৪১, পৃ. ২৮৮।

১১ শ্রীধর দাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), ৪/৫২/৪ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, (কলিকাতা : এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, ১৯৭১), পৃ. ২২৮, ৪৯৫।

১২ প্রাগুক্ত, ৫/১/২ ; উদ্ধৃত : নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮২।

১৩ সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০–১২৫০ খ্রিষ্টপর) (কলিকাতা : ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৪), পৃ. ১৮০–১৮১।

১৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ৪৮৩।

১৫ অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ, (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬), পৃ ৮৬।

১৬ পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), বৃহদ্ধর্মপুরাণ, প্রথম নবভারত সংস্করণ, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬), মধ্যখণ্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ ২৫৭।

১৭ পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রথম নবভারত সংস্করণ, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১), শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩২–৪৩৩।

১৮. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/২০/৪।

১৯ ধোয়ী পবনদূত, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (অনূদিত), নতুন সংস্করণ, (কলিকাতা : এইচ চ্যাটার্জি এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৭), শ্লোক নং ৩০, পৃ ১০–১১।

২০ বিদ্যাকর, সুভাষিতরত্নকোষ ডি এইচ এইচ এ্যাঙ্গেলস (অনু.), হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, নং ৪৪, ১৯৬৫, শ্লোক নং ৭৯, পৃ ৮৮।

২১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ৪৮৩–৪৮৪।

২২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৬), পৃ ৩–১০।

২৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮৪।

২৪. জীমূতবাহন, কালবিবেক, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও প্রমথনাথ তর্করত্ন (সম্পা.), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৫), পৃ. ৫০৩–৫০৪, ৪৭০, ৪০৬–৪০৭, ৪১১, ৪০৯, ১১৩, ৪৯৪-৪৯৫, ৪৫৬।

২৫ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ডম, ২৩ অধ্যায়, পৃ. ৯৩–৯৯ এবং উত্তর খণ্ডম, ১০ম অধ্যায়, পৃ. ৩২১।

২৬. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ. ২২২–২২৫, এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ১৬তম অধ্যায় পৃ. ৪০৩–৪০৬।

২৭. এস. সি. রায় ও অন্যান্য, দি খারিয়াস, ২য় খণ্ড (রাচী : 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' অফিস, ১৯৩৭), পৃ. ৩২১।

২৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্করণ, (কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৫), পৃ. ৬১১।

২৯ এস. কে. চ্যাটার্জী, "বুড্‌ডিস্ট্‌ সারভাইভালস ইন বেঙ্গল", বি. সি.-ল ভল্যুম, পর্ব-১, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৭৯–৮০।

৩০. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃ. ২১৯।

৩১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডিসকভারী অব লিভিং বুড্‌ডিজম্‌ ইন বেঙ্গল, (কলিকাতা : ১৮৯৭) পৃ ৯–৩০।

৩২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮৬।

৩৩. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃ. ২২৬–২২৭।

৩৪. এস. কে. চ্যাটার্জী, “বুড্‌ডিস্ট্‌ সারভাইভালস ইন বেঙ্গল” প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৩৫. ধর্মমঙ্গল, পর্ব–১, সুকুমার সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), ২য় সং. (কলিকাতা : ১৯৫৬), পৃ. ২৯, ৫১।

৩৬. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৫১১–৫১২।

৩৭. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃ. ২২৬।

৩৮. বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ, পৃ ৮৭।

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭–৯০।

৪০. কামিনী কুমার রায়, বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, (কলিকাতা : বাসন্তী লাইব্রেরি, ১৯৮০), পৃ. ১৭৯।

৪১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮৬–৪৮৭।

৪২. কামিনীকুমার রায়, বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, পৃ. ১৪৩।

৪৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮৭।

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৮।

৪৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলায় ধর্ম সাহিত্য (লৌকিক), (কলিকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৩৮৮), পৃ. ১৫০–১৫২।

৪৬. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/২৫/৫ : উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ৪৮৬।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৪/৭১/১ ; উদ্ধৃত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ৫০২।

৪৮ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়, পৃ ১৭১–১৭৩।

৪৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮৯।

৫০. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়, পৃ. ১৭২–১৭৭।

৫১ এস হোসেন, সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আর্বলি মিডীএভল্‌ বেঙ্গল, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ৮৮।

৫২. জীমূতবাহন, কালবিবেক, পৃ. ৪১৪।

৫৩ এস হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮–৮৯।

৫৪ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বাধ, ৪র্থ সং, (কলিকাতা : ইষ্টাণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ ২২২।

৫৫ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৬৩–২৬৪।

৫৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ২২২।

৫৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৯০।

৫৮. নীলরতন সেন (সম্পাদিত), চর্যাগীতিকোষ, (কলিকাতা : দীপালী সেন, ১৩৮৪), গীত নং ২৮, পৃ ১৪১।

৫৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৯০।

৬০. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, আলোচনা ও বিচার, পৃ. ৬৬।

৬১ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩৪০, পৃ. ২২৩।

৬২ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬০৮, পৃ ১৬৪।

৬৩ বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ, পৃ ৫৪।

৬৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৯১।

৬৫ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২১৯, পৃ. ১৯৫।

৬৬. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড় লেখমালা (প্রথম স্তবক), (রাজশাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯), শ্লোক নং ১১, গরুড় স্তম্ভলিপি, পৃ. ৮০।

৬৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৬, কমৌলি লিপি, পৃ. ১৪৫।

৬৮. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২২–২৩, পৃ. ১৪৪।

৬৯. গৌড় লেখমালা, (প্রথম স্তবক), শ্লোক নং ৩, কৃষ্ণদাবিকা মন্দির লিপি, পৃ. ১১৬।

৭০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭, পৃ. ১১৭।

৭১ করপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশন্স, পৃ. ১৬৩–১৮৪।

৭২. গৌড় লেখমালা (প্রথম স্তবক), শ্লোক নং ২৭–২৮, গরুড় স্তম্ভলিপি, পৃ. ৮৫।

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭–৮৩।

৭৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৪, খালিমপুর লিপি, পৃ ২৬–২৭।

৭৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১১।

৭৬. সন্ধ্যাকাব নন্দী, রামচবিত, আর. সি. মজুমদাব ও অন্যান্য, (সম্পা. ও অনু.), (রাজশাহী দি ববেন্দ্র বিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৩৯), শ্লোক নং ১, পৃ. ৭৬।

৭৭. বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫২২–৫২৩।

৭৮. বিদ্যাকর, সুভাষিতবত্নকোষ, ডানিয়েল এইচ. এইচ. এ্যাঙ্গেলস (অনু.), হার্ভাড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড নং ৪৪, ১৯৬৫, শ্লোক নং ৩৮, ৪০, ৭৮, ৭৯, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, পৃ. ৭৬–১০৮।

৭৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১১–১১৯।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৭, ৫৫২, ৫৫৪।

৮১. প্রাগুক্ত. পৃ. ৫২৪।

৮২. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ. ৪২২।

৮৩. গাযত্রীসেন মজুমদাব, বুড্‌ঢিজম্ ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল, (কলিকাতা : নাভানা, ১৯৮৩), পৃ. ১১০।

৮৪. শশিভূষণ দাসগুপ্ত (সম্পা.), বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীত, তৃতীয় মুদ্রণ, (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬), পৃ. ১০৯।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৮৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৫৫।

৮৯. ট্রেভর লিং, "বুড্‌ঢিস্ট্ বেঙ্গল, অ্যাণ্ড আফটার", দেবীপ্রসাদ চট্টপাধ্যায় (সম্পা.), হিস্ট্রি অ্যাণ্ড সোসাইটি, (কলিকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৭৬), পৃ. ৩২০–৩২৩।

৯০. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.), সাহিত্য (মাসিক ও সমালোচনা), ২৩শ বর্ষ (১ম–১২শ) সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ৩৮১–৩৯৯।

৯১. ভবদেব ভট্ট, তৌতাতিতমততিলক, এ. এম. এম. অচিন্নস্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাজ শাস্ত্রী (সম্পা.), (বেনারস : গভর্ণমেন্ট এস. লাইব্রেরি, ১৯৩৯), পৃ. ৮১।

৯২. ভবদেব ভট্ট, প্রায়শ্চিত্ত প্রকবণম, গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পা.), (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭), পৃ. ১।

৯৩. বল্লাল সেন, দানসাগর, ভবতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৫৩), পৃ. ৭।

৯৪. প্রাগুক্ত,

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৯৬. প্রাগুক্ত,

৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০।

৯৮ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, পৃ ১০৪।

৯৯ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৫৮, পৃ. ২৩৭–২৩৮।

১০০ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড ৩০, পৃ ২৬১।

১০১ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, পৃ ২৮।

১০২ জয়দেব, গীতগোবিন্দম, বসময়দাসকৃত পদ্যানুবাদ এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, পুনর্মুদ্রিত, (কলিকাতা : বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৯৬৯), প্রথম সর্গ : শ্লোক নং ১৬, পৃ. ২২–২৩।

১০৩ সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০–১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ), (কলিকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৪), পৃ ৮৩, ১৩১–১৩২।

১০৪ ট্রেভর লিং, "বুড্ডিস্ট বেঙ্গল, অ্যাণ্ড আফটার", প্রাগুক্ত, পৃ ৩১১।

১০৫ আবদুল মমিন চৌধুরী, "কনভারসন টু ইসলাম ইন বেঙ্গল : এ্যান এক্সপ্লোরেশন", রফিউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), ইসলাম ইন বাংলাদেশ : সোসাইটি কালচার অ্যাণ্ড পলিটিক্স, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৮৩), পৃ ১৮।

১০৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, সপ্তম সংস্করণ, (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮১), পৃ ২১১।

১০৭ ট্রেভর লিং, "বুড্ডিস্ট বেঙ্গল, অ্যাণ্ড আফটার", প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৩।

১০৮ গুপ্ত লিপিমালাসমূহ ; দ্রষ্টব্য : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ৩৯৫।

১০৯. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড–১৩, পৃ. ১৫২, ১৫৫।

১১০ কামরূপ শাসনাবলী ; উদ্ধৃত : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ৩৯৮।

১১১ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড-১৫, পৃ ৩০৭, ৩১১।

১১২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড় লেখমালা (প্রথম স্তবক), শ্লোক নং ১৩, পৃ ২২–২৮।

১১৩ আর মুখার্জী অ্যাণ্ড এস কে. মাইতি, করপাস অফ বেঙ্গল ইনসক্রিপশন্স বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, পৃ ১৫০–১৬৩ ; বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ৫০৯।

১১৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৩–১৬৪।

১১৫ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, শ্লোক নং ২, ভুবনেশ্বর লিপি, পৃ ৩৩, ৩৬।

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ১৬।

১১৭ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৯, দেওপাড়া লিপি, পৃ ৫১।

১১৮ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, ৪র্থ সং, (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, ১৩৭২), ভূমিকা পৃ. ২৯–৩০।

১১৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ৪১৬।

১২০. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১–৫, বেলাব লিপি, পৃ. ২১–২২, আরও দেখুন : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.) সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ৩৮১–৩৯৯।

১২১. প্রাগুক্ত, লাইন নং ৪১–৪৫, বেলাব লিপি পৃ. ২৪।

১২২ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, ভল্যুম ৩, শ্লোক নং ৪, বেলাব লিপি, পৃ. ২২।

১২৩ ভবদেব ভট্ট, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পা.), (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭), ভূমিকা, পৃ. ১।

১২৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২৩, ভুবনেশ্বর লিপি, পৃ. ৩৯।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

১২৬ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১, ভুবনেশ্বর লিপি, পৃ ৩৬, উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ ২৯।

১২৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩, ভুবনেশ্বর লিপি, পৃ ৩৬।

১২৮ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৫, বেলাব লিপি, পৃ ২২।

১২৯ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৯, দেওপাড়া লিপি, পৃ ৫১।

১৩০ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২, দেওপাড়া লিপি, পৃ ৫০।

১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫, ৯৪, ১০১, উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, পৃ ২৮।

১৩২ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৪-৪৬, আনুলিয়া লিপি, প ৯০।

১৩৩ প্রাগুক্ত, লাইন নং ৩৩-৩৭, গোবিন্দপুর লিপি, পৃ. ৯৭ ৯৮।

১৩৪. প্রাগুক্ত. লাইন নং ৩৯-৫১, মাধাইনগর লিপি, পৃ ১১৫।

১৩৫ প্রাগুক্ত, চিটাগং কপার প্লেট অফ দামোদর, পৃ ১৫৯।

১৩৬ শ্রীধর দাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলিকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), ১/৫৪/৫, ১/৫৫/২, ১/৬৫/২।

১৩৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, ভূমিকা, পৃ ৩৩।

১৩৮ প্রাগুক্ত পৃ ৯৮-৯৯।

১৩৯. প্রাগুক্ত, প্রথম সর্গঃ প্রথম শ্লোক, পৃ ১৩।

১৪০. প্রাগুক্ত দ্বাদশ সর্গঃ শ্লোক নং ২৬, পৃ ১৫৭।

১৪১ বিদ্যাকর, সুভাষিতরত্নকোষ, ড্যানিয়েল এইচ এইচ ইঙ্গেলস, (অনূদিত), হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, নং ৪৪, ১৯৬৫, শ্লোক নং ১১২, পৃ ১৭২, উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৬।

১৪২ ঐ, শ্লোক নং ১৩১, পৃ ১০৪।

১৪৩ সদুক্তিকর্ণামৃত, ১/৫২/৪ ; উদ্ধৃত . সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান পৃ ৪৮৫।

১৪৪. ঐ, ১/৬১/১ : উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩।

১৪৫. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, (কলিকাতা : সান্যাল এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৩৭৮), শ্লোক নং ৪৩১, পৃ ১৪৩।

১৪৬ ঐ, শ্লোক নং ৫০৯, পৃ. ২৬০।

১৪৭ ঐ, শ্লোক নং ৫৩০, পৃ ১৬৪।

১৪৮ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৫০৮, পৃ ২৬০।

১৪৯ ঐ, শ্লোক নং ১০, পৃ. ১৩৭।

১৫০ পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, প্রথম নবভারত সংস্করণ, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬), উত্তরখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩১১-৩২৩।

১৫১. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, প্রথম নবভারত সংস্করণ, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১), শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৬৮।

১৫২. ঐ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ৩১৭।

১৫৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ ১৯৩-১৯৪।

১৫৪. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম, প্রথম খণ্ড, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ (অনূদিত), (কলিকাতা : মহামিলন মঠ, ১৩৯৪), পৃ. ২০১।

১৫৫. জয়দেব, গীতগোবিন্দম, পূজারি গোস্বামী বিরচিত টীকা, রসময় দাস-কৃত পদ্যানুবাদ এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত গদ্যানুবাদ, পুনর্মুদ্রিত, (কলিকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯), প্রথম সর্গঃ শ্লোক নং ১৬, পৃ. ২২-২৩।

১৫৬. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৪৮।
১৫৭. কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ, ভূমিকা, পৃ. ১০৭–১১২।
১৫৮ সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ১/৩৭–৫০, ১/৬১–৬৩।
১৫৯. গীতগোবিন্দম, ১ম সর্গঃ শ্লোক নং ১৬, পৃ. ২২–২৩।
১৬০. এস. হোসেন, এভরিডে লাইফ ইন দি পাল এমপায়ার, পৃ. ১৫৩–১৫৮।
১৬১. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ১/৫৩/৫ ; ১/৫৪/২ ; ১/৫৫/৪ ; ১/৫৭/৩ ; ১/৬০/১, ৩ ; ১/৬১/৪, ৫।
১৬২. এফ. ডবলু. টমাস (সম্পাদিত), কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯১২), শ্লোক নং ১১১, ৩৪, ৪১, ৪২, ৪৯।
১৬৩. এস. হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯–৫৩, ১৫৭–১৫৮।
১৬৪. কে. এন. দীক্ষিত, "এক্সক্যাভেশন্স এ্যাট পাহাড়পুর", দিল্লী, ১৯৩৮, (মেমোরিজ অফ দি আর্কিয়লজিক্যাল সারভে অফ ইণ্ডিয়া : ৫৫), পৃ. ৪৪।
১৬৫. এস. কে. সরস্বতী, "আরলি স্কাল্পচারস অফ বেঙ্গল", জার্নাল অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ লেটারস, খণ্ড–৩০, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, ১৯৩৮, পৃ. ৪২–৪৫।
১৬৬. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ৩০৮, ৪০৫।
১৬৭ সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ১/৬০/৩, পৃ. ৪৪।
১৬৮. প্রাগুক্ত, ১/৫৪/২, পৃ ৪০।
১৬৯. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৯৮০, পৃ. ১১৭।
১৭০. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ. দর্শন ও সাহিত্যে, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৪), পৃ. ১১৪–১১৫।
১৭১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ৫৪৭।
১৭২. ধোয়ী, পবনদূত, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (অনূদিত), নতুন সংস্করণ, (কলিকাতা : এইচ. চ্যাটার্জী এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৫৭). শ্লোক নং ২৭, পৃ. ৮।
১৭৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃ. ২২২–২২৪।
১৭৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৪৭।
১৭৫. ডব্লিউ. জে. উইলকিন্স, হিন্দু মাইথলজি, (কলিকাতা : থ্যাকার স্পিংক অ্যাণ্ড কোং, ১৮৮২), পৃ. ৯২।
১৭৬. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ৮৩।
১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।
১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
১৭৯. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ১/৩৪/১–৫।
১৮০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১৩–৫১৪।
১৮১. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ৪০৪–৪০৫।
১৮২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১৪।
১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯।
১৮৪. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১, দেওপাড়া লিপি, পৃ. ৫০।
১৮৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১, ব্যারাকপুর লিপি, পৃ. ৬৪ ; উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ২৭।
১৮৬. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২১, নৈহাটি লিপি, পৃ. ৭৫ ; উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭–২৮।

১৮৭. সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত, আর. সি. মজুমদার ও অন্যান্য, (সম্পাদিত ও অনূদিত), রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ান, ১৯৩৯), শ্লোক নং ১, পরিচ্ছদ নং ১, পৃ. ৭৬ , উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

১৮৮. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩৮, পৃ. ৭৬।

১৮৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪২, পৃ. ৭৭।

১৯০. সদুক্তিকর্ণামৃত, ১/৫/৫, উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ৫০০।

১৯১ প্রাগুক্ত, ১/৪/৪ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫।

১৯২. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, গ্রন্থারম্ভ ব্রজ্যা, শ্লোক নং ৬, পৃ. ১৩৬।

১৯৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৮, পৃ. ১৩৬।

১৯৪. ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম, পৃ. ২৬২।

১৯৫. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্ব খণ্ডম, দশম অধ্যায়, পৃ. ৪২।

১৯৬. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৩।

১৯৭. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, পৃ. ৪৪৪।

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬–৪০৭।

১৯৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৪০–৫৫০।

২০০. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪৭–৪৪৯।

২০১. কলহন, রাজতরঙ্গিনী, খণ্ড–১, এম. এ. স্টেন (অনূদিত), (ওয়েষ্টমিনিষ্টার : অরচিবল্ড কনস্টবল অ্যাণ্ড কোং, ১৯০০), ৪:৪২০, পৃ. ১৬০।

২০২. এস. হোসেন, এভরিডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৮), পৃ. ১৩৮।

২০৩ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, পৃ. ৪০৭।

২০৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১৬।

২০৫. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, চতুর্থ মুদ্রণ, (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৯২), পৃ. ৭।

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২০৮. এস, হোসেন, দি সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন দি আরলি মিডীএভ্ল্ বেঙ্গল, পৃ. ৮২।

২০৯. ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১২।

২১০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১৬–৫১৭।

২১১. ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১২।

২১২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২১–২৩, ভুবনেশ্বর লিপি, পৃ. ৩৯।

২১৩. এস. হোসেন, দি সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডীএভ্ল্ বেঙ্গল, পৃ. ৮২।

২১৪. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৩৪, পৃ. ৭৫।

২১৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৫৯, পৃ. ৮০।

২১৬. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, গ্রন্থারম্ভ ব্রজ্যা, শ্লোক নং ৭, পৃ. ১৩৬।

২১৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১, পৃ. ১৩৫।

২১৮. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১০২, পৃ. ৯২।

২১৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬৯, পৃ. ৮২।
২২০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬২, পৃ. ৮১।
২২১. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, গ্রন্থারম্ভ ব্রজ্যা, শ্লোক নং ২, পৃ. ১৩৫
২২২. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৮০, পৃ. ৮৮।
২২৩. সদুক্তিকর্ণামৃত, গৌরী, ৩ ; উদ্ধৃত : শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১১০।
২২৪. প্রাগুক্ত, হরশৃঙ্গার, ৩ ; উদ্ধৃত : শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য পৃ. ১১১।
২২৫. প্রাগুক্ত, হরশৃঙ্গার, ৪ ; উদ্ধৃত : শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য পৃ. ১১১।
২২৬. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত : শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য পৃ ১১৪।
২২৭. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৪৩, পৃ. ৭৭।
২২৮. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৪২, পৃ. ১৭৮।
২২৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪১৯, পৃ. ২৪০।
২৩০ সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/৩/৪ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৯৬।
২৩১ সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৬০, পৃ. ৮১.
২৩২. ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম, পৃ. ২৬২-২৬৩।
২৩৩. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৩১৩।
২৩৪. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃ. ৭০।
২৩৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৫০।
২৩৬. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩ ঢাকা মূর্তি লিপি, পৃ. ১১৬–১১৭ ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, চিত্র নং ১৭।
২৩৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৫০।
২৩৮. প্রাগুক্ত,
২৩৯. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, ইদিলপুর, মদনপাডা, কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ লিপি, পৃ. ১২৬, ১৩৩–১৩৪, ১৪৩।
২৪০. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৪৮, পৃ. ১০৮।
২৪১. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৫০, পৃ. ১০৮।
২৪২. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/১৬/১ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ৪৮৩।
২৪৩. প্রাগুক্ত, ৪/৬/৫, উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪।
২৪৪. ধোয়ী, পবনদূত, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (অনূদিত), নতুন সংস্করণ, (কলিকাতা : এইচ. চ্যাটার্জী এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৭), শ্লোক নং ২৯, পৃ. ৯–১০।
২৪৫. ব্রাহ্মণ সর্বস্বম, মঙ্গলাচরণম, পৃ. ১।
২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০–২২১।
২৪৭. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ৯ম অধ্যায়, পৃ. ৩১৮–৩১৯।
২৪৮. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশ খণ্ডম, উনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৫০-২৫১।
২৪৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, প্লেট নং ১৬, ফিগার নং ৪০।
২৫০. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, পৃ. ৪৫৮।
২৫১. প্রাগুক্ত, প্লেট নং ১৬, ফিগার নং ৪২।
২৫২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫১৯–৫২০।

চতুর্থ অধ্যায়

সেনযুগে বাংলার দৈনন্দিন জীবন

এই অধ্যায়ে প্রাচীনকালের বিশেষত সেনযুগীয় বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিলাস উপকরণ, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা তথা সেন আমলের বাঙালি জীবনের অন্যান্য দিকের মতো এই বিষয় সম্পর্কে বিদ্যমান তথ্য অত্যন্ত অপ্রতুল। দৈনন্দিন জীবনাচার, আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা, সৌন্দর্যচর্চা প্রভৃতি সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ এবং ইহা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবন আলোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন :

> দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, বিলাস-ব্যসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধুলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এ-গুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নয়। কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই ; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনে এমন কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মনন-কল্পনা বা ধ্যান-ধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিরই পরিচয়, এবং বোধ হয় তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।[১]

বিশেষত সেন আমলের যে লোকায়ত জীবনধারা প্রবাহিত উহার প্রাত্যহিক জীবনাচারের রূপ, সেই রূপের প্রকৃতি ও ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস আজও অনির্ণীত। বিভিন্ন উৎসে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই স্বল্প। এই সমস্ত স্বল্প ও বিক্ষিপ্ত বাঙালির জীবন চিত্রিত তথ্যসমূহকে সন্নিবেশিত করিয়া প্রাচীন সেনযুগীয় বাংলার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে একটি বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করার প্রচেষ্টাই এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

ক. খাদ্যদ্রব্য

সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায়ের শুরু হইতে ধান্য এই দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন ফসল। তাই আবহমানকাল হইতে এদেশের প্রধান খাদ্য ভাত। বাঙালির এই ভাত ভক্ষণের কথা বলিতে গিয়া নীহাররঞ্জন রায় বলিতেছেন : "ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান্য যে দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে-দেশে ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত,... ।"[২] ভাত ভক্ষণ বাঙালি জীবনে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক উৎস বিশ্লেষণ করিলে অনুধাবন সম্ভব। এই সম্পর্কে লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণদীঘি প্রভৃতি তাম্রশাসনের আরম্ভ শ্লোকে বলা হইয়াছে :

> ফনিপতি মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎ স্বরূপ,
> বালেন্দু ইন্দ্র ধনুস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিনী বরিস্বরূপ,
> শ্বেত কপালমালা বলাকাস্বরূপ, যাহা ধ্যানাভ্যাসরূপ
> সমীরণের দ্বারা প্রেরিত এবং যাহা ভবার্তিতা
> ধ্বংসকারী—সম্ভুর জটারূপ সেই মেঘ তোমাদের
> শ্রেয়ঃ শস্যের অঙ্কুরোদ্‌গমের হেতু হোক।[৩]

ভাত ভক্ষণ বাঙালি জীবনে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আরও ঐতিহাসিক উৎস বিশ্লেষণ করিলে অনুধাবন সম্ভব। আমরা ইহার বিক্ষিপ্ত তথ্য অন্যত্রও পাইয়া থাকি। আনুলিয়া তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক ব্রাহ্মণদের বহু গ্রাম দানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। বিভিন্ন শস্যে এই সমস্ত গ্রাম সমৃদ্ধ ছিল এবং উপবনসমূহ অপরূপ শোভায় অলংকৃত ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইত।[৪] কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনেও অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখিত হইয়াছে : অনেক গ্রাম রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণগণ পাইয়াছিলেন ; এই সমস্ত গ্রাম সুন্দর সুন্দর শস্যক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ছিল এবং তাহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত।[৫] বিদ্যাকর সংকলিত সুভাষিতরত্নকোষ কাব্যে বিবৃত বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন স্থানে আবহমান বাংলার চিরায়ত শস্য ধান্য ফসল সম্পর্কে বলা হইয়াছে : নতুন পানিতে প্লাবিত ধান্যক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঙ কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। কর্দমাক্ত শিশুরা লাঠি হস্তে লইয়া ধান্যক্ষেত্রের মৎস্য ধরিতে ছুটিতেছে।[৬] একদল ক্ষুদ্র মৎস্য খাতের পার্শ্ব দিয়া ধান্যক্ষেত্র হইতে সরোবরে সাঁতরাইতেছে।[৭] গ্রামের শস্যক্ষেত্রে মাচা বাঁধিয়া কৃষকগণ বন্য বরাহের অত্যাচার হইতে শস্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।[৮] শরৎকালীন ধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে।[৯] হেমন্তে শত পথিক খড় পাইবার আশায় কৃষকদের স্তুতি করিতেছে—তাই কৃষকরা গর্বিত।[১০] মাঠের প্রান্ত হইতে শশক যুগল বাহির হইতে দেখিয়া কৃষকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাদের সঙ্গীদের ডাকিতেছে, এবং সকল বৃদ্ধ ও তরুণ কৃষক তাহাদের ধান্য কর্তন ফেলিয়া ইহাদের পশ্চাতে কাস্তে প্রস্তরখণ্ড ও লাঠি লইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে।[১১] শীত মৌসুমে প্রথম ধান্য ফসলে পরিপূর্ণ কৃষকের বাড়িতে সুখের হাওয়া লাগিয়াছে এবং নতুন

সঞ্চিত ফসলের পাত্র হইতে সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইতেছে। যে স্থানে কৃষককন্যাগণ মুসলপাতের ও তাহাদের বাহুলতায় বলয়ের ঝন্ ঝন্ শব্দে এখন মুখরিত।[১২] অপরদিকে শ্রীধরদাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত কোষকাব্যের বিভিন্ন শ্লোকেও অনুরূপভাবে আবহমান বাংলার খাদ্যশস্য হিসাবে ধান্য ফসলের বর্ণনা রহিয়াছে : পর্যাপ্ত জল পাইয়া ধান্য ফসলের চেহারায় সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। ধেনুগুলিও ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে।[১৩] কৃষকের গৃহ এখন কর্তিত শালি ধান্যে সমৃদ্ধ।[১৪] গরু, বলদ, ছাগলগুলি গৃহে ফিরিয়া নতুন খড় পাইয়া আনন্দিত। দিনান্তে গ্রামের গোষ্ঠগুলিতে ছড়াইয়া আছে শালিধান্য, গোময়ের আগুনে সৃষ্ট হইয়াছে ধূম্রবলয়।[১৫] এক মুঠি শুষ্ক তৃণের আশায় পথিক কৃষকের সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতেছে—তাহার দানশীলতার তুলনা করিতেছে কর্ণের সহিত।[১৬]

আর্যাসপ্তশতীতে শালি ধান্য ক্ষেত্রে হরিণের উপদ্রব্যের কথা জানা যায় :

> কোমল শালিশস্যের লোভে চঞ্চল হরিণ, নিজেকে ধরা দিবার ছলনায়, তরুণ পথিককে এখানে কমলগোপীর নিকট আনয়ন করে। [হরিণের এই প্রকার দৌত্যের উদ্দেশ্য, পথিক ও গোপী যখন প্রেম চর্চায় রত থাকিবে, তখন সে নির্ভয়ে ইচ্ছামত শালিধান্য ভক্ষণ করিতে পারিবে]।[১৭]

এইরূপ উপদ্রব হইতে ক্ষেত্র রক্ষার জন্য খড়ের নির্মিত ধনুর্বাণধারী কৃত্রিম মূর্তি দাঁড় করাইয়া চাষী তাহার ফসল রক্ষা করেন। এই সম্পর্কে আর্যাসপ্তশতীর অপর শ্লোকে বলা হইয়াছে : "ওহে কুরঙ্গ শিশু, তুমি এই শস্যক্ষেত্রের কমল--মঞ্জরীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? (সম্মুখে স্থাপিত ধনুকবাণ হস্তে যে পুরুষকে দেখিতেছ) ইহা কপট পুরুষ, ইহা খড় দিয়া তৈয়ারি, ইহার বাণ, ইহার ধনুও খড় নির্মিত।"[১৮] ধান্য মাড়াইবার বর্ণনাও আর্যাসপ্তশতীর অন্য একটি শ্লোকে পাওয়া যায় : "পরস্পর বন্ধন রজ্জু যোগে মধ্যস্থ খুটিতে অবলম্বন করিয়া গাভীরা বহুবার পদচালনা দ্বারা ধান্য মর্দন স্থানকে (খলকে) দলিত করে।"[১৯]

এই সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপন্ন হইত। বল্লালসেন রচিত দানসাগর গ্রন্থে অষ্টাদশ প্রকার ধান্যের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত ধান্যের মধ্যে ব্রীহি (আশুধান্য), গোধুম, অণু (দাদখানি), পিয়ঙ্গু (কঘাটী), উদার (দে-ধান), স-চীনক (অর্থাৎ চিনাধান ও তৎসহজাত কলাই) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শালিধান্য ছিল সকল ধান্যের শ্রেষ্ঠ।[২০]

এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে, ধান্য এদেশের প্রধান উৎপন্ন ফসল এবং সমাজের উচ্চস্তর হইতে একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ছিল ভাত। কিন্তু ভাতের অভাব যেন দরিদ্র বাঙালির প্রাত্যহিক ঘটনা। ভাত বিনা বাঙালির অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িত। তাই হয়ত বা "হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার কথা" কিংবদন্তীতে ধরা পড়িয়াছে। ইহার চাইতে বড় দুঃখ বাঙালির জীবনে আর ছিল না। চর্যাগীতিতে ভাতের জন্য হাহাকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

> "হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।"[২১]

এইরূপ ইঙ্গিত আমাদেরকে তৎকালীন বাঙালি জীবনের দৈন্যতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ধরনের দৈন্যতার অভিব্যক্তি সুভাষিতরত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত কাব্যেও লক্ষ্য

করা যায়। দরিদ্র শিশু প্রায়শ অন্যের বাড়ির দ্বারে দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরে যাহারা খাইতেছে তাহাদের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া থাকে।[২২] দরিদ্র লোকের স্ত্রী আগামীকল্য তাহার শিশুদের খাদ্য কিভাবে জোটাইবে এই চিন্তায় রাত্রে ক্লিষ্ট মনে অশ্রু বর্ষণ করে।[২৩] তাহার দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র, ক্ষুধায় তাহার শিশুদের চক্ষু কোটরাগত এবং উদর বসিয়া গিয়াছে।[২৪] এইরূপ দৈন্যতার চিত্র আজও দরিদ্র বাঙালি জীবনের নিত্যকার পীড়ার কারণ।

অন্যান্য শস্যের মধ্যে যব ও গম প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং ইহাও বাঙালির প্রিয় ছিল।[২৫] সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ধান্য শস্যের সহিত ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।[২৬] অন্যত্র আবার বলা হইতেছে : কৃষকের গৃহ এখন কাটা শালিধান্যে সমৃদ্ধ। গ্রাম সীমান্তের ক্ষেত্রে যে প্রচুর যব তাহার শীষ নীলোৎপলের মত স্নিগ্ধ, শ্যাম। গরু, বলদ ও ছাগলগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নতুন খড় পাইয়া আনন্দিত।[২৭] সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ধান্যই ছিল বাংলার প্রধান খাদ্যশস্য এবং ভাত ছিল বাঙালির প্রধান ভক্ষ্য। সাধারণত শাক–সবজী মাছ--মাংস সহযোগে ভাত খাওয়া হইত। প্রাচীন বাংলায় সম্ভবত ডাল খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি ছিল না। নীহাররঞ্জন লিখিয়াছেন, "ডাল খাওয়ার কোনও উল্লেখ কিন্তু দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ তালিকায় ডালের বা কোন কলাইর উল্লেখ কোথাও যেন নাই।"[২৮] কিন্তু বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থে উল্লেখিত অষ্টাদশ প্রকার ধান্যের মধ্যে তিল, মাষ, মুগ, মসুর, নিষ্পাব (সাদা শিম), কুলথ (কুলটি কলাই), আঢ়কী (আড়র), চণক (ছোলা)[২৯] এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ[৩০] ও সুভাষিতরত্নকোষে[৩১] মসুর, মুগ, তিল, মটর, কলাই প্রভৃতি ডালের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত উৎসে উল্লেখিত তথ্য হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সেকালে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল এবং ইহার প্রমাণ তৎকালীন সাহিত্যে রহিয়াছে। শাকান্ন ভোজন বাঙালি জীবনে চিরায়ত। বিভিন্ন উৎসে শাক–পাতার উল্লেখ আছে। সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে সরিষা শাক,[৩২] প্রাকৃত পৈঙ্গলে নালিতাশাক[৩৩] এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে হিঞ্চা শাক ও কালশাক[৩৪] প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।

তরিতরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, সীম, কাকরোল, কচু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে তরকারি হিসাবে আলুর ব্যবহার পর্তুগিজরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছিল।[৩৫] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালেও শহরের চাইতে গ্রামের জীবনযাত্রার উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অমরকোষের সর্বপ্রাচীন ও বিখ্যাত টীকাকার সর্বানন্দ ছিলেন বাঙালি। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি টীকাসর্বস্ব রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বাঙালি জীবনের উল্লেখযোগ্য খাদ্য উপকরণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার একটি শ্লোকে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কান্তাকে গ্রামে বাস করাইবার অভিপ্রায়ে গ্রামীণ জীবনের সুবিধার কথা সুকৌশলে বুঝাইতেছেন : "কচি সরিষার শাক, নতুন চাউলের ভাত, পাতলা দই—সুন্দরী গ্রামের লোক সামান্য খরচাতেই এইরূপ ভাল খাদ্য পায়।"[৩৬] প্রাকৃত পৈঙ্গলে তৎকালীন বাঙালির একটি খাদ্য তালিকার উল্লেখ বেশ গুরুত্বপূর্ণ :

ওগ্ গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।

গাইক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজত্তা।
মোইণি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।

'ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘি, জুতসই দুধ, মৌরলা মাছ, নালিতা গাছ (অর্থাৎ পাটশাক) কান্তা রাঁধিয়া দেয়, পুণ্যবান্ খাইতে পায়।'[৩৭]

শাক তরিতরকারির পরেই আসে মাছের কথা। নদনদী বিধৌত বাংলাদেশে মাছের প্রাচুর্যের বিষয় বর্ণনা একান্তই প্রাসঙ্গিক। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মাঝনদীতে মাছ ধরিবার দৃশ্যরূপক চর্যাগীতের একটি গীতে কাহ্নপাদ বলিতেছেন :

তীর্ণ হলো ভবজলধি মায়া স্বপ্ন করে
দুই এর মাঝে তরঙ্গ আমি ভোগ করি।
পঞ্চ তথাগতকে কেড়ু আল করা হলো।
দেহ (নৌকা) বাও কাহ্নিল মায়াজাল এড়িয়ে॥ [৩৮]

মৎস্যের মধ্যে সম্ভবত রুই, শোল, পুঁটি, ইলিশ, শুঁটকী প্রভৃতি মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য ছিল। কারণ এই সকল মাছের উল্লেখ বিভিন্ন লিপিতে বারবার বলা হইয়াছে। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের আরম্ভ শ্লোকে "শৈবাল জালে বদ্ধ শফরী (অর্থাৎ পুঁটি)" মাছের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৩৯] সদুক্তিকর্ণামৃত কোষ কাব্যে শফরী লম্ফের সৌন্দর্যের বর্ণনা[৪০] এবং শোভমান রোহিত মৎস্যের[৪১] উল্লেখ আছে। সম্ভবত ইলিশ মাছ তৎকালীন সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কারণ জীমূতবাহন নানা প্রকার প্রয়োজনে ইলিশের তৈল বহুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৪২] জনসাধারণ পচা মাছ খাইতেন না,[৪৩] তবে পূর্ব-বাংলায় শুঁটকী খাওয়ার প্রচলন ছিল। সদানন্দের টীকাসর্বস্বে শুঁটকী মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।[৪৪] যাহাই হউক, মৎস্যপ্রিয় বাঙালির মৎস্য আহারেও বিধিনিষেধ ছিল। এই বিধিনিষেধ শাস্ত্রাকারগণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। স্মৃতিকার ভট্টভবদেব বিভিন্ন শাস্ত্রকারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া ইহার বিবরণ দিয়াছেন। অবশ্য তিনি বাংলাদেশে মৎস্য প্রীতির কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।[৪৫] অপরদিকে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, রোহিত, শকুল (শোল), শফর ও অন্যান্য আঁশযুক্ত শুক্লবর্ণ মৎস্য ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল।[৪৬] সম্ভবত উচ্চবর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণগণ অন্যকোন মৎস্য আহার করিতেন না। অন্যদিকে উচ্চবর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নবর্ণের লোকেরা আজকালকার মতই সকল প্রকার মাছই খাইত।[৪৭] অবশ্য শাস্ত্র নিষিদ্ধকালে ব্রাহ্মণের নিরামিষ ভোজন ছিল ধর্মীয় অনুশাসন।[৪৮]

মাছের মত না হইলেও বাঙালি মাংসের প্রতি ছিল অনুরক্ত। হরিণের মাংস তৎকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। আর এই হরিণ শিকার শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদেরই প্রধান বৃত্তি ছিল। একটি চর্যায় চারিপার্শ্ব হইতে আক্রান্ত ভীতসন্ত্রস্ত হরিণের একটি সুন্দর বর্ণনা সত্যই আকর্ষণীয় :

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল খায় না, হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ–বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তীর গতিতে ধাবমান হরিণের খুর পর্যন্ত দেখা যায় না ; ভসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।[৪৯]

জালের সাহায্যেও হরিণ শিকারের কথা ভসুকু অন্য একটি চর্যায় উল্লেখ করিয়াছেন।[৫০] মাংস আহারেও বিধিনিষেধ ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নিষিদ্ধ মাংসের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে এইরূপে : "ব্রজেশ্বর ! নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, সর্প, শূকর, গর্দভ, মাজ্জার, শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র ও সিংহের মাংস মানবগণের সর্বদাই পরিত্যাজ্য। জলৌকা, নক্র, গোধিকা, মণ্ডুক, কর্কটী, ক্রঞ্চক, এবং গো ও চমরীর মাংস কলিকালে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রজেশ্বর ! হস্তী, ঘোটক, মনুষ্য ও রাক্ষসের মাংস এবং দংশ—মশক, মক্ষিকা ও পিপীলিকা আর এইরূপ অন্যান্য অভক্ষ্য প্রাণী ভোজন করা বেদে ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ। বানর, ভল্লুক, শরভ, কস্তুরীমৃগ এবং গর্দভ মাংসও ভোজন করিতে নিষেধ আছে।"[৫১] আবার বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বিশেষ বিশেষ দিনে মৎস্য ও মাংসের আহার একেবারেই নিষেধ রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে : "অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, রবিবার, বরিসংক্রান্তি, দ্বাদশী এবং অন্যান্য পুণ্য দিবসে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে না।"[৫২] সুতরাং মাছের মতো মাংস আহারেও তৎকালে বিধিনিষেধ ছিল। তবে এই বিধিনিষেধ কতটুকু মান্য করা হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এই সমস্ত শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধের বার বার উল্লেখ হওয়ায় এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে শাস্ত্রকারগণ এই বিধিনিষেধ সমাজে প্রচলিত করিবার জন্য অতি সচেষ্ট ছিলেন।

অপরদিকে ভট্টভবদেবের মতো শাস্ত্রকার বলিতেছেন : ব্রাহ্মণ্য সমাজে বিশেষত কাঁকড়া, শামুক, মোরগ, সারস, বক, হাঁস, দাত্যূহ পক্ষী, উট, গরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য গাধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপের মতো পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণীর মাংস ভক্ষণে খুব বেশি বাধানিষেধ নাই[৫৩] এবং কাঁচা ও শুকনা মাংস ভক্ষণ বিধিসম্মত।[৫৪] ছাগলের মাংস ছিল খুবই জনপ্রিয়।[৫৫] সুতরাং এই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে. উপরোক্ত যে বিবরণ মাংস আহারের বিধিনিষেধ সম্পর্কে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সম্ভবত উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্যই, অন্য সম্প্রদায় সকল জন্তুর মাংস আহার করিতেন, তাহাদের উপর খুব বেশি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আরোপিত হয় নাই বা শাস্ত্র তাহাদের মাংস আহার সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিতর্কের সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করে নাই। শাস্ত্রকারগণ উচ্চবর্ণ কর্তৃক ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলিলে সমাজে ধর্ম রক্ষা হইবে এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণ কাঠামোর রক্ষক ছিলেন উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণ।

ফলফলাদি হিসাবে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, তাল, ইক্ষুর নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন লিপিতে আম, কাঁঠাল, সুপারী, নারিকেল প্রভৃতির উল্লেখ আছে।[৫৬] প্রাচীন সাহিত্যেও ফলফলাদির বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে আম্র ফলের সুতীব্র সুগন্ধ নির্গত হওয়ার সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে : কোন বৃক্ষ

পুষ্প-প্রস্ফুটনকালে সুগন্ধিযুক্ত হয়, কোন পাদপ ফলোদ্গমে আমোদিত হয়, কোন তরু ফল পক্ক হইলে সুরভিত হয়। কিন্তু এইমাত্র আম্রবৃক্ষ হইতেই ফল পাকা পর্যন্ত সুগন্ধ নির্গত হয়।[৫৭] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আম্র, নাগরঙ্গ, পনস, তাল, নারিকেল, জম্বু, বদরী যর্জ্জুর, গুবাক, আম্রাতক, জম্বীর, কদলী, শ্রীফল, দাড়িম্ব প্রভৃতি উল্লেখিত হইয়াছে।[৫৮] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পানস, আম্র, হরীতকী-পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, লবলী ও ধাত্রীফল, ইক্ষু প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে।[৫৯] সুতরাং বলা যাইতে পারে উপরোক্ত প্রতিটি উৎসে আম্রফল সম্পর্কে বলা হইয়াছে। সম্ভবত তৎকালীন সময়েও আম্রফল অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং উৎপাদনও বেশি হইত। আর ইহার কারণেই জনজীবনে ইহার কদর ছিল অত্যন্ত বেশি। পবনদূত কাব্যের একাধিক স্থানে গুবাকের (সুপারী) কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[৬০] তৎকালীন লিপিমালা হইতেও ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৬১] সম্ভবত পান সহযোগে সুপারী গ্রহণ বাংলার প্রাচীন মানুষের নিকট জনপ্রিয় ছিল। এই কারণেই সম্ভবত গুবাক বন বা তরুর কথা বারবার আসিয়াছে। উপরোক্ত অন্যান্য ফলফলাদিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হইত এবং জনপ্রিয় ছিল।

ইক্ষু বর্তমানের মতোই তখনও বিশিষ্ট অর্থকরী ফসল। ইক্ষুর রস হইতে তৈয়ারি পানীয় এবং ইক্ষু গুড় হিসাবে সমাদৃত ছিল। সুভাষিতরত্নকোষ গ্রন্থের একাধিক শ্লোকে ইক্ষুরস ও গুড় সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে : শরৎকালে শকটের পথ পেষিত ইক্ষুর রস দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে এবং পথে জাফরান রঙের ধূলি উড়িতেছে।[৬২] পরিপক্ক ইক্ষুর সুঘ্রাণে দিবসগুলি আমোদিত।[৬৩] সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও একাধিক শ্লোকে ইক্ষু সম্পর্কে বলা হইয়াছে : বর্ষার জল পাইয়া ইক্ষুর সমৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সুতরাং আর কোনো চিন্তা নাই।[৬৪] হস্তচালিত ইক্ষুযন্ত্রের পেষণে ইক্ষুর রস বাহির হইতেছে।[৬৫] অবিরত ইক্ষুযন্ত্র-ধ্বনিমুখর গ্রামগুলি (নতুন ইক্ষু) গুড়ের সুবাসে আমোদিত।[৬৬] গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে ইক্ষুরসের সহিত নায়িকার মানভঙ্গের সুন্দর দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে :

> হে সুন্দরী, তোমার মানের গ্রন্থিও আমার কাছে উপাদেয় ; কারণ কিছুটা কার্কশ্য প্রকাশের পর ; তাহা ইক্ষু গাঁটের মতো স্বভাব মধুর রস পরিবেশন করে। (ইক্ষু গ্রন্থি ককশ, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিতে পারিলে অধিক রস পাওয়া যায়, তেমনই মানভঙ্গে মিলনরস মধুর হয়)।[৬৭]

এই ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হইত। সুতরাং ইক্ষু যে তৎকালীন মানুষের নিকট অর্থকরী ফসল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ও তাহা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী আদরণীয় ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

আবার ভাত, গম, গুড়, মধু, দুধ, ইক্ষু ও তালরস, নারিকেলের পানি প্রভৃতির সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের মদ প্রস্তুত হইত। ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার মদের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার মতে সকলের পক্ষে এই মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল।[৬৮] ভট্টভবদেবের এই স্মৃতি নির্দেশ তৎকালীন সমাজের মানুষেরা কতটুকু মান্য করিত সে সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।[৬৯] বিদ্যমান তথ্যাবলী তাঁহার এই

সংশয়ের যথার্থতাই যেন প্রমাণিত করে। সুভাষিতরত্নকোষ গ্রন্থে কৃষক কর্তৃক মদ্যপানের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৭০] সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে মদ্যপানের একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মদ সাধারণত নিম্নশ্রেণী বা স্তরের লোকেরাই পান করিত।[৭১] তাহা ছাড়া চর্যাগীতের একাধিক গীতে শুঁড়িখানার বারবার উল্লেখ হইয়াছে। মদ্য ব্যবসায়ী শুঁড়িদের একটি চমৎকার বর্ণনা বিরূআপাদ রচিত একটি চর্যায় এইভাবে পাওয়া যায় :

> সে এক শুন্ডিণী দু'ঘরে ঢোকে।
> চিকণ বাকলে বারুণী বাঁধে॥
>
> সহজকে স্থির ক'রে বারুণী বাঁধে।
> যেন অজরামর দৃঢ় স্কন্ধ হ'তে পারে॥
>
> দশমী দুয়ারেতে চিহ্ন দেখে।
> নিজে যেচে গ্রাহক এলো॥
>
> চৌষট্টি শোধন ঘড়ায় পসার দেওয়া আছে।
> গ্রাহক প্রবেশ করলো কিন্তু বেরোয় না॥
>
> একটি সে ঘটি সরু তার নাল।
> বিরূআ বলেন স্থির ক'রে চালাও॥[৭২]

চর্যাপদের এই গীত হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে শুঁড়িরাই মদের ব্যবসা করিত। তাহাদের আস্তানা শুঁড়িখানায় অবাধে মদ ক্রয়-বিক্রয় চলিত। মদ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের স্থান ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং শুড়িনীরা এই কাজ করিত। মদের দোকানের সম্মুখে ছিল বিশেষ সংকেতসূচক চিহ্ন। ইহার ফলে মদের খরিদ্দার তাহার গন্তব্যটি অতি সহজেই চিনিয়া লইত। শুঁড়িখানার মধ্যে মদ্যপায়ীদের মদ খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এই মদ এক প্রকার সরু বাকল বা শিকড় শুকাইয়া বা গুড়া করিয়া প্রস্তুত করা হইত। চৌষট্টিবার শোধন করিয়া উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হইত। এই শোধনকার্যে সরু নল ব্যবহার করা হইত। এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইত। কারণ একটু অমনোযোগিতায় ইহা খারাপ হইয়া যাইত। শুঁড়িখানার এমন চমৎকার বর্ণনা দৃষ্টে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সেকালে মদ্যপান সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল।[৭৩] আর্যাসপ্তশতীতেও মদ্যপানের উল্লেখ আছে।[৭৪] তবে শাস্ত্রকারদের মদ্যপান সম্পর্কে বিধিনিষেধ হইতে এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে মদ্যপান সমাজে নিন্দনীয় ছিল।

নানা ধরনের মিষ্টি ও পিঠা বাঙালির আহার্য তালিকাতে পাওয়া যায়। ঘি, দুগ্ধ, চিনি, ছানা প্রভৃতি বাঙালির প্রিয় ছিল।[৭৫] এইসব খাদ্য উপকরণ দিয়া বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণমে আছে, দুধ দিয়া নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইত। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে বিভিন্ন ধরনের দুধ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।[৭৬] অন্যান্য মিষ্টির মধ্যে খাদ্য (খাজা), মোদক (মোয়া, নরম মিষ্টান্ন), লড্ডুক (নাড়ু, শক্ত মিষ্টান্ন), খণ্ড (পাটালী, নবাত জাতীয় গুড় বা চিনির শক্ত মিষ্টান্ন), পিষ্টক (পিঠা), ফণিত (বাতাসা), কদম্ব (কদমা), দুগ্ধ শর্করা (চিনির পায়েস), খিরিস (ক্ষীরের মিষ্টান্ন), খণ্ড শালুক (তিলুয়া) প্রভৃতি ছিল

প্রধান।[৭৭] কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে কবি গোবর্ধনাচার্য ক্ষীর শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন :

> "ক্ষীর সাগরের তীরবাসিনী যে সকল সুনয়না, লক্ষ্মীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের জ্বালে প্রস্তুত ক্ষীর (পিণ্ডীকৃত দুগ্ধ) ভোজন করেন, তাহারাও রাধার যশোগান করিয়া থাকেন।"[৭৮]

খ. পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধন

তৎকালীন সময়ে পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সাধারণত পুরুষের ধুতি এবং মেয়েদের শাড়ি। তৎকালীন সময়ের মূর্তিগুলিই ইহার প্রমাণ। পুরুষের ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট।[৭৯] বর্তমানের মতো লম্বা-চওড়ায় ইহা বড় সাইজের ছিল না। তবে ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কখনও কখনও তাহা হাঁটুর নিম্ন পর্যন্তও প্রসারিত হইত। আবার ধুতির দুই প্রান্ত পিছনে টানিয়া কাছা দেওয়া হইত। কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম ছিল। অনেকে ধুতির একটি প্রান্ত পশ্চাতে, অপর প্রান্তটি সম্মুখে ঝুলাইয়া দিতেন। আর কোমরে কটিবন্ধ দিয়া কাপড়টি আটকাইয়া রাখিতেন। সাধারণত কটিবন্ধটি দুই-তিন প্যাচের হইত এবং ইহার গাঁটটি প্রায় নাভিমুণ্ডের নিম্নেই দুলিত। এই ছিল তৎকালীন বাঙালির (পুরুষ) প্রধান পরিধেয়। তাহা ছাড়া পুরুষেরা দেহের ঊর্ধাংশে উত্তরীয় পরিধান করিত।[৮০]

আবার পুরুষের মত প্রায় একই পদ্ধতিতে মহিলারা শাড়ি পরিধান করিত।[৮১] তবে এই শাড়ি ধুতির মত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট ছিল না এবং ইহা পায়ের নিচে পর্যন্ত পৌঁছাইত। শাড়ির প্রান্তভাগ পিছনে টানিয়া কাছা দেওয়া হইত না।[৮২] বর্তমানের মত শাড়ির একপ্রান্ত কোমর হইতে বাম স্কন্ধের উপর দিয়া পশ্চাতে ঝুলিত।[৮৩] কিন্তু প্রায়ই তাহারা দেহের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখিতেন।[৮৪] কেহ কেহ উত্তরীয় বা উড়না এবং চোলি বা স্তনপট্ট ব্যবহার করিতেন।[৮৫] সমসাময়িক সাহিত্যে দেহের ঊর্ধাংশে উত্তরীয়,[৮৬] চোল,[৭৮] দুকূল[৮৮] এবং স্তনভূষণ[৮৯] এবং নিম্ন অংশে জঘনাংশুক বা নেংটি[৯০] পরিধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ময়ূর পাখার সাহায্যেও শবরীগণ সজ্জিত হইতেন।[৯১] সাহিত্যিক[৯২] ও প্রত্নতাত্ত্বিক[৯৩] নিদর্শন হইতে দেখা যায় যে, পুরুষের মতো মেয়েদের কোমরে কটিবন্ধ থাকিত। অনেক সময় পত্রাচ্ছাদিত কটিবন্ধ তাহারা ব্যবহার করিত এবং দেহের উপরের অংশে বৃক্ষপাতা পত্রমালা হিসাবে পরিধান করিত। অবশ্য শবর, নিষাদ ও পুলিন্দ রমণীরাই এই বেশ পরিধান করিত। এইগুলি তাহাদের স্তনপট্ট এবং ওড়না বা উত্তরীয়র কাজ করিত।[৯৪]

বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ ও মহিলা উভয়েই উত্তরীয় পরিধান করিত। কিন্তু ইহার ব্যবহারে ধনী ও দরিদ্র মানুষের ব্যাপক ব্যবধান ছিল। ধনী লোকের উত্তরবাস নিশ্চয় উন্নত ছিল। অনুরূপ ইঙ্গিত জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাওয়া যায় কৃষ্ণের উত্তরবাস পরিধান সম্পর্কে:

> কোন কামিনী কেলিকলা কৌতুকে
> যমুনার তীরবর্তী মনোহর বেতসকুঞ্জে
> শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত আকর্ষণ করিতেছেন।[৯৫]

উত্তরীয় পুরুষেরা পরিধান করিতেন ইহার উল্লেখ গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতীতে মিলিয়াছে। ইহাতে নায়কের প্রতি নায়িকার বক্তব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে :

> পরাঙ্গনা-শোষিত সুন্দর নায়কের প্রতি অপর নায়িকার সাকুতোক্তি ঃ অনুরক্তা সুন্দরী পুনঃপ্রত্যাগমনের জন্য তোমার উত্তরীয়খানি মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছে ; যদিও একখানি বস্ত্রই তোমার সম্বল, তবু সকল যুবক অপেক্ষা তোমার অধিক শোভা।[৯৬]

কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোনো কোনো সম্প্রদায় বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। দায়ভাগ গ্রন্থে জীমূতবাহন সভাসমিতি উপলক্ষে বিশেষ ধরনের পোশাকের কথা বলিয়াছেন।[৯৭] পায়ের কব্জি পর্যন্ত লম্বা আঁটসাঁট পা'জামা নর্তকী-মহিলারা পরিধান করিতেন।[৯৮] তাহাদের দেহের উর্ধ্বাংশে স্কন্ধের উপর ঝুলিত সুদীর্ঘ ওড়না এবং নৃত্যের সময় এই ওড়না লীলায়িত ভঙ্গিতে উড়িত।[৯৯] বিবাহের সময় চেলী ছিল নারীদের পরিধেয়।[১০০] অভিসারিকা নীল নিচোল পরিধান করিয়া তিমিরাভিসারে যাত্রা করিত।[১০১] তপসী-সন্ন্যাসী এবং দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা ন্যাঙোটি পরিতেন।[১০২] সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিধান করিতেন উরু পর্যন্ত লম্বিত আঁটসাঁট পা'জামা এবং শিশুদের পরিধেয় ছিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধুতি অথবা পা'জামা।[১০৩]

মহিলারা অনেক সময় রঙিন ও নকশি শাড়ি পরিধান করিত। দেওপাড়া রাজশাহীতে প্রাপ্ত গঙ্গামূর্তির পরিধানে স্বচ্ছ এবং কারুকার্যময় শাড়ি পরিধেয় দেখা যায়।[১০৪] আবার শাড়ির ধার বা পাড়ে লতার নকশা।[১০৫] গ্রামের মেয়েরা অনেক সময় পীতবসন বা পীতাংশুকে সজ্জিত থাকিত।[১০৬] তাহারা পট্টাংশুকেও সজ্জিত হইত।[১০৭] চিনামশুক, কৌশ, পট্ট এবং দুকুল প্রভৃতি নামীয় বিবিধ সূক্ষ্ম বসনেরও নাম পাওয়া যায়।[১০৮] উল্লেখ্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতে এদেশে কার্পাসের চাষ হইত এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই জন্য বাঙালি তাঁতীদের খ্যাতি বহির্বিশ্বেও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অবশ্য শিল্পনৈপুণ্য এবং দক্ষতার জন্যই তাহাদের এই খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে চর্যাকার তান্ত্রিপদ বলিতেছেন :

> তাঁতী আমি, সুতা আমার নিজের সাড়ে তিন হাত বয়নদণ্ড, তিনভাগে প্রসারিত সুতায় কাপড় বুনে বুনে গগণ ভরে ফেলা হয়।[১০৯]

বিভিন্ন রঙের রেশমের কাপড়ও ছিল বিখ্যাত।[১১০] চিনামশুকের মতো সূক্ষ্ম সুন্দর শাড়ি নিঃসন্দেহে রাজপরিবার ও ধনী পরিবারের নারীদের বসন ছিল। কিন্তু মোটা কাপড়েই সাধারণ পরিবারের মহিলাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত এবং আর্থিক দৈন্যতা হেতু ইহাও পরিধান অনেক সময় তাহাদের নিকট অসাধ্য ছিল।[১১১] সুভাষিতরত্নকোষে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে আছে : প্রতিবেশিনীর নিকট দরিদ্র গৃহিণীর প্রতিদিনই তাহার ছিন্ন কাপড় সেলাইয়ের জন্য সূচ ধার করিতে হয়।[১১২] আবার শীতের সময় ধনী ব্যক্তিরা তাহাদের চাহিদা মতোই বস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু রোদ পোহান এবং অগ্নিই ছিল শীতবস্ত্রহীন দরিদ্র মানুষের শীত নিবারণের একমাত্র অবলম্বন। এই ধরনের ইঙ্গিত সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকের বর্ণনায় পাওয়া

যায় : পুরানো ময়লা জীর্ণ কাপড় কাঁধে দিয়া শীতকালে উষ্ণতা লাভের আশায় সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত প্রাচীরের একটু স্থানের জন্য দরিদ্র শিশুরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।[১১৩] অপরদিকে আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে শীতের রাত্রিতে দরিদ্র ব্যক্তির একমাত্র অবলম্বন ছিল অগ্নি। এই অগ্নির ধোয়ায় তাহার চোখের জল ঝরিত এবং দহনে শরীর মলিন হইত। তবুও তাহাকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হয়। শ্লোকটির বর্ণনা বেশ লক্ষণীয় :

> হে অগ্নি 'দহন', ধোঁয়ায় অশ্রুপাত, শিখায় দগ্ধ অঙ্গারে মলিন করিলেও, দরিদ্র গৃহিণী শীতের সারারাত্রি তোমাকে জ্বালাইয়া রাখিবে।[১১৪]

সুতরাং বর্তমানের মতোই তৎকালেও ধনী ও দরিদ্রের পোশাক–পরিচ্ছদে প্রভেদ ছিল। ধনী ব্যক্তিরা নিজ সাধ ও পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরিধান করিলেও দরিদ্রের নিকট তাহা ছিল নাগালের বাহিরে। তাই তাহাদের ইচ্ছা বা শখ পুরনের সাধ ও সাধ্য কোনটাই ছিল না।

তৎকালেও চুলের সৌন্দর্য্যবর্ধনে নারী ও পুরুষ উভয়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহা তাহাদের শিরোভূষণ হিসাবে কাজ করিত। অনেক সময় চন্দ্রক বিরাজিত মনোহর শিখিপুচ্ছ দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত কেশপাশ দর্শনে মনোহর ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুশোভিত মনে হইত।[১১৫] অনেক সময় কেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলদ্বারা সজ্জিত করা হইত। কৃষ্ণের কেশের সৌন্দর্য্য বর্ণনা হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।[১১৬] পুরোহিতদের চুল সাধারণত জটাধারী হইত এবং অনেক সময় তাহাদের মাথায় জটামুকুট দেখা যাইত।[১১৭] মহিলারা লম্বা চুল রাখিত এবং চুল বাঁধিয়া পশ্চাতে এলাইয়া দিত।[১১৮] অবশ্য অনেক সময় চুল না বাঁধিবার ইঙ্গিত ও পাওয়া যায়। পবনদূতের একটি শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের বিরহে কুবলয়বতী যক্ষরাজ দুহিতার অবস্থা বর্ণনার দৃশ্যে বিরহিণীর এলোকেশের কথা উল্লেখিত হইয়াছে :

> তোমারি ভাবেতে বিভোরা সে বালা
> তোমার তরে বিয়াকুল,
> রোষে শশধরে, বীতরাগ বশে
> বাঁধে নাক তারি চুল॥[১১৯]

রমণীরা আবার চুলে বিভিন্ন অলংকার[১২০] পরিত ও ফুলদ্বারা সজ্জিত করিত।[১২১] চুলে তৈল ব্যবহার করা হইত।[১২২] কেশ গন্ধতৈলেও সুরভিত করিয়া অনেক সময় বেণী বন্ধন করা হইত।[১২৩] কেশ বিন্যাসের সময় আঙ্গুল দিয়া কেশ বিনানো হইত।[১২৪]

তখন পাদুকার মধ্যে কাঠের খড়ম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। সাধারণত কাঠের খড়ম, চর্মপাদুকা; বাঁশের লাঠি এবং ছাতা বাঙালির ব্যবহার্য দ্রব্যের অন্যতম ছিল। তবে পুরুষেরা কাঠের খড়ম এবং চর্মপাদুকা উভয়ই ব্যবহার করিতেন।[১২৫] পবনদূত কাব্যের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় কবি ধোয়ী রাজা লক্ষ্মণসেনের নিকট বিবিধ উপহারে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হইয়াছে : "কবিরাজদের শ্রেষ্ঠ যিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে হাতির ব্যূহ, সোনাজড়ানো (ছাতা), সোনার বাটওয়ালা দুইটি চামর লাভ করিয়াছিলেন।"[১২৬] যাহা হউক, চর্মপাদুকা ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জিনিস।

অবশ্য যোদ্ধা ও প্রহরী দ্বারবানেরাও চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন এবং তাহা সাধারণত পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত লম্বিত হইত এবং ইহা ফিতাবিহীন ছিল।[১২৭] বরেন্দ্র যাদুঘরে রক্ষিত সূর্যমূর্তিগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মূর্তিগুলি চর্মপাদুকা ও মোজা পরিহিত এবং ইহাদের জুতায় ও মোজায় বিভিন্ন ধরনের ফুলের নকশা অঙ্কিত হইয়াছে।[১২৮] সম্ভবত তৎকালীন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় এই ধরনের সৌখিনতা অবলম্বন করিতেন এবং এই প্রকারের পরিপাট্য তাহাদেরকে সামাজিক জীবনে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী করিত। অবশ্য সাধারণ লোক চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, ব্যবহার করিবার সাধ্য তাহাদের ছিল না। মূর্তি হইতে আমরা ছাতার ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হইতে পারি।[১২৯] দিনাজপুরে প্রাপ্ত সূর্যের পুত্র রেবন্ত মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, তাহার একজন অনুচর তাহার মস্তকের উপর ছত্র ধরিয়া আছে।[১৩০]

প্রসাধন ব্যবহারে সেকালের নারীরা পিছাইয়া ছিলেন না। তাহারা নানা ধরনের প্রসাধন ব্যবহার করিতেন। সধবা নারীরা কপালে কাজলের টিপ, নয়নে কাজল, পায়ে লাক্ষারস অলক্তক, ললাটে সিঁদূর ; দেহ ও মুখমণ্ডলে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপঙ্ক, কুঙ্কুম, মৃগনাভি প্রভৃতি।[১৩১] তৎকালীন মেয়েরা অঙ্গে প্রসাধন ব্যবহার করিত—এই সম্পর্কে অজস্র বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তখন সমাজের উচ্চস্তরের এবং নগরের নারীরা সাধারণত রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিলেন এবং দেহের রূপচর্চায় তাহারা বিবিধ প্রসাধন ব্যবহার করিতেন। কবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যের একটি শ্লোকে ইহার বর্ণনা বেশ চমৎকার :

> সেথায় পৌ ললনা—
> লীলায়িত তনু প্রকৃতি মধুরা–তারা যে অমিয়বচনা ;
> কোমলা মুগ্ধ কামিনী
> শিল্পীর হাতে তুলিকায় আঁকা অপরূপ রূপধারিণী।
> প্রসাধনে কিবা করে ?
> শ্রবণ–চুমিয়া–নয়নে তাদের ভ্রূ বিলাস মন হরে !
> হয় নাক' প্রয়োজন—
> দেহের লাবণী বাড়াতে তাদের অঙ্গভূষণ।[১৩২]

তৎকালীন সাহিত্য ও লিপিতে মেয়েদের অঙ্গ প্রসাধনের আরও প্রমাণ পাই। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে আছে মহিলারা চোখে কাজল দিতেন।[১৩৩] আর্যাসপ্তশতী গ্রন্থের একটি শ্লোকে আছে চোখে অঙ্কিত সূক্ষ্ম কাজলরেখা দর্শনে অনেক সময় প্রেমিক বিমোহিত হইত :

> ওগো মুগ্ধ সখি, নয়নবাণ নিক্ষেপকারী
> ধনুর ঘর্ষণ–চিহ্নের মত, শলাকা দ্বারা
> অঙ্কিত কাজলের এই সূক্ষ্ম রেখা হৃদয় হরণ করে।[১৩৪]

বিবাহিত মহিলারা সীমন্তে দিতেন সিঁদূর।[১৩৫] আর্যাসপ্তশতীতে নায়িকার সিন্দুরিত মুক্ত কেশকলাপ দর্শনে নায়কের মনে হইতেছিল নায়িকার সীমন্ত যেন বিদীর্ণ রক্তাক্ত হৃদয় :

"তাহার বেণীবদ্ধ কেশকলাপ মুক্ত হওয়ায়, তাহা সীমন্ত সিঁদূরের ছলে বিদীর্ণ হৃদয়ের মতো দেখাইতেছিল।"[১৩৬] কিন্তু বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সীমন্তের সিঁদূর মুছিয়া যাইত।[১৩৭]

তখন মেয়েরা পায়ে আলতা দিতেন।[১৩৮] তাহাতে নিঃসন্দেহে তাহাদের পায়ের সৌন্দর্য্য বর্ধিত হইত। এই সম্পর্কে গোবর্ধন আচার্য তাহার কাব্যের ২৯২ নং শ্লোকে বলিয়াছেন। নায়িকার প্রতি সখি কটাক্ষ করিয়া চরণের অলক্তরাগ মুছিয়া ফেলিবার জন্য দোযারোপচ্ছলে মন্তব্য করিয়াছেন : "প্রেমিকের স্পর্শে তোমার অঙ্গে যে স্বেদজল উদ্‌গত হইয়াছিল, তাহাতেই তোমার চরণ নখের লাক্ষারাগ মুছিয়া গিয়াছে। তুমি গর্বভরে নায়কের চিকুরকে এজন্য অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিতেছ কেন?"[১৩৯]

মেয়েরা দেহ প্রসাধনে ব্যবহার করিত চন্দনের গুঁড়া, চন্দনপঙ্ক[১৪০] কর্পূর[১৪১] কস্তুরী,[১৪২] অগুরু, কুঙ্কুম[১৪৩] প্রভৃতি। চন্দনটিপ ও কর্পূরের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

> নায়িকার প্রতি সখীঃ মদন সন্তপ্ত
> মিথুন (স্ত্রী-পুরুষ যুগল), ঘনচন্দন
> লেপ মুছিয়া ফেলিয়া, পাখা সরাইয়া
> দিয়া, গ্রীষ্ম সন্তাপ অগ্রাহ্যপূর্বক
> বাহুদ্বারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।[১৪৪]

রাধিকার স্তনে কুঙ্কুম ব্যবহারে শ্রীহরির বক্ষ আঙ্কিত হওয়ার দৃশ্য এবং সেই বক্ষ-স্থলের বর্ণনায় গীতগোবিন্দে বলা হইয়াছে :

> গাঢ় আলিঙ্গনে শ্রীমতী রাধিকার স্তনপ্রান্তের কুঙ্কুমরসে শ্রীহরির যে বিশাল বক্ষ সমঙ্কিত হইয়া মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে হৃৎ-প্রদেশ হইতে মদনখেতজনিত স্বেদজল সমদ্ভুত হইয়া অণুরাগরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, হরির রতিকালীন সেই বক্ষঃস্থল তোমাদের অভীষ্ঠ সাধন করুক।[১৪৫]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত সমাজচিত্রে অঙ্গের প্রসাধন ও রত্নরাজি বিরাজিত শ্রীরাধার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে : "রত্নরাজি বিরাজিত কর্ণযুগলধারিণী শ্রীরাধা,—কপোল তলে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও সিঁদূর বিন্দু সংযুক্ত হওয়ায় অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছেন। সতী শ্রীরাধা, মালতী-মালা বিভূষিত, সুসংস্কৃত কেশপাশযুক্ত, সুন্দর কবরীভার এবং স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্যপহারী পদযুগল ধারণ করিতেছেন।"[১৪৬] সদ্যুক্তিকর্ণামৃত কাব্যের একটি শ্লোকে মধুকরীগণের অঙ্গ প্রসাধনের একটি সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে : "বসন্ত-লক্ষ্মীর মনোরম তমালকান্তি মধুকরীগণ মদনের ঈষৎ রক্তবর্ণ ও বিস্তৃত নয়নযুগলে স্নিগ্ধ কাজলের কালিমা, কুঙ্কুম সদৃশ্য অরুণবর্ণ কর্ণিকার পুষ্পের শিরোভূষণে সাতিশয় নীলিমা এবং প্রস্ফুটায়মান তিলকাভ্যন্তরে কস্তুরী চূর্ণ মিশ্রিত আর্দ্র বিন্দুর সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে।"[১৪৭]

তৎকালীন মেয়েরা নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করিত। ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক,[১৪৮] চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে[১৪৯] আমরা তৎকালীন মেয়েদের কুণ্ডল, হার, বলয়, মেখলা, নূপুর প্রভৃতি অলংকার ভূষিত দেখিতে পাই। সমসাময়িক সাহিত্যে মুক্তাহার,[১৫০] মরকতময়ী

হার,[১৫১] মণিহার,[১৫২] চন্দ্রহার,[১৫৩] কুণ্ডল,[১৫৪] নাকবালা,[১৫৫] কঙ্কণ,[১৫৬] বলয়,[১৫৭] শঙ্খবলয়,[১৫৮] নূপুর,[১৫৯] মেখলা,[১৬০] মণিমেখলা[১৬১] প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। লিপিমালাতেও অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজপরিবারভুক্ত ভৃত্যের স্ত্রীরাও হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল, সুবর্ণবলয় এবং মূল্যবান পাথরের তৈয়ারি ফুল ব্যবহার করিতেন।[১৬২] তবে নারীপুরুষ নির্বিশেষে কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ুর, মেখলা প্রভৃতি পরিধান করিতেন। বিবাহিতা নারীরাই শুধু শঙ্খবলয় পরিতেন। এই সমস্ত অলংকার সোনারূপা উভয় ধাতু দিয়াই তৈয়ারি হইত।[১৬৩] গীতগোবিন্দে হার পরিহিতা রাধিকার বর্ণনা একটি শ্লোকে আছে : "মণিহার কুচকলসোপরি দোদুল্যমান হওয়া তোমার বক্ষপ্রদেশ শোভিত করুক এবং চন্দ্রহার তদীয় বিশাল নিতম্বদেশে শব্দায়মান হইয়া কামের আদেশ ঘোষণা করুক।"[১৬৪] আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে কানবালা পরিহিত নায়িকার প্রতি নায়কের কটাক্ষ দৃষ্টি উল্লেখ করিবার মত :

> হে সুন্দরী, যখন কর্ণ রথচক্র উত্তোলন করিতেছিলেন, তখন অর্জুন প্রেরিত স্বভাবতীক্ষ্ণ বাণ কর্ণের উপর পতিত হইয়াছিল, তুমি চক্রের মতো কানবালা (তাটঙ্ক) কর্ণে ধারণ করিয়াছ ; সেই কর্ণে পতিত হইতেছে স্বভাবতীক্ষ্ণ, কৃষ্ণ (অর্জুন প্রণয়ী) কটাক্ষবাণ।[১৬৫]

ইহাছাড়াও রত্ননির্মিত পাশক (পাশা) ব্যবহারের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রহিয়াছে।[১৬৬] পবনদূত কাব্যে কর্ণে তালীপত্রের অলংকার কর্ণভূষণ হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে।[১৬৭]

তখন মেয়েরা নানা ধরনের বালা পরিত, যথা কঙ্কনবালা, শঙ্খবালা প্রভৃতি। কঙ্কনবালা পরিহিতা নায়িকার প্রতি নায়কের সুন্দর উক্তি বেশ লক্ষণীয় :

> হে সুন্দরী, কঙ্কণ ঝঙ্কৃত হাত নাড়িয়া, গৃহস্তম্ভ ধরিয়া নীরব কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি গৃহদ্বারের শোভা সম্পাদন করিতেছ।[১৬৮]

অপর একটি শ্লোকে শঙ্খবলয় পরিহিতা বিবাহিতা রমণীর সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে ; পরকীয়ার প্রতি নায়কের উক্তিচ্ছলে :

> হে সুন্দরী, যে শঙ্খ করপত্রাঘাত (করাতে ঘা) স্বীকার করিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছে, সেই শঙ্খকে যে সকল লোক শূন্যহৃদয় বলে, তাহারা নিজেরাই শূন্যহৃদয় (মূর্খ)।[১৬৯]

আবার

> কূপ হইতে রজ্জু দিয়া পানী (পানি) তুলিয়া বারংবার পানী (পানি) সিঞ্চন করিতেছে পামরী—সুত্রুচ্ছেদহেতু তাহার শঙ্খবলয় ঝনঝন্ করিতেছে।[১৭০]

তৎকালে মেয়েরা পায়ে নূপুর পরিত। আর এই নূপুরের মধুর ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত হইত। এই ধরনের একটি শ্লোকের সহিত গোবর্ধন আচার্য তাহার আর্যাসপ্তশতী গ্রন্থকে তুলনা করিয়াছেন :

> কেলিকালে নায়িকার চরণের নূপুর শিঞ্জিত না হইলে তাহা রসিক নাগরের হৃদয় বা কর্ণ তৃপ্ত করিতে পারে না ; (তেমনই) ললিত পদবিন্যাস সত্ত্বেও কাব্যধ্বনিহীন

> (ব্যঘ্রার্থশূন্য) হইলে, তাহা রসজ্ঞ সমাজের চিত্ত ও শ্রুতি কোনটিই নন্দিত করিতে পারে না।[১৭১]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও অনুরূপ একটি শ্লোকে পাওয়া যায় : "হে রাজহংস, যে ছায়া পদ্মের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর, সরোবরের জলবিন্দুর মধ্যে আনন্দে থাক, তোমার পক্ষোন্নতি হউক। তথাপি আমাদের পরিচারিকার পদদ্বয়ে যে নূপুর ক্রীড়াচ্ছলে ধ্বনিত হয়, তাহা কর্তৃক এই ধ্বনি অবলীলাক্রমে নির্ণীত হয়।"[১৭২] কুবলয়ে গড়া মাথার মুকুটের কথা পবনদূত কাব্যে পাওয়া যায় এবং নর-নারী উভয়েই ইহা ব্যবহার করিত।[১৭৩]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত নারায়ণের বর্ণনায়ও আমরা তৎকালীন যুবতী নারীদের বেশ-ভূষার আকর্ষণীয় বিবরণ পাই। এখানে নারায়ণ বলিতেছেন :

> ...কৃষ্ণের পুত্র মহাবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ বিধাতার অংশ। নবযৌবনসম্পন্ন সেই অনিরুদ্ধ একদা নির্জনে পুষ্প এবং চন্দনচর্চিত পর্যাঙ্কে সুপ্ত হইয়া, স্বপ্নাবস্থায় বিকশিত কুসুমপূর্ণ উদ্যানে স্নিগ্ধ চন্দনলিপ্ত সুগন্ধি কুসুমশয্যায় শয়ানা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা নবযৌবনসম্পন্ন রমণীয়া এক যুবতীকে দর্শন করিলেন। তাহার সকল অঙ্গ অমূল্য রত্নময় ভূষণে অলংকৃত। হস্তে মনোহর কেয়ুর, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কন, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল যুগল, গণ্ডস্থল পর্যন্ত বিরাজিত ; পরিধান অতি সূক্ষ্মবস্ত্র, চরণে শব্দায়মান নূপুর, ওষ্ঠদ্বয় পরিপক্ক বিম্বফল সদৃশ, রক্তবর্ণ লোচনযুগল শরৎকালীন কমল সদৃশ, ভালে সিন্দুর বিন্দু, দাড়িম্ব কুসুমাকার ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছে। উরুদ্বয় যেন রামরম্ভাকে নিন্দা করিতেছে। স্তনদ্বয় অতিশয় উচ্চ ও অতি কঠিন, কামবাণে তাহার শরীর পীড়িত। গুরু নিতম্বভাবে মধ্যভাগ বিনম্র, তাঁহার শরীর অতি কোমল বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করত নিজের সকামতার পরিচয় দিতেছে। পাদপদ্ম কুঙ্কুম ও অলক্তক রক্তদ্বারা শোভিত। পরিধেয় বসন বায়ুসঞ্চারে চঞ্চল হওয়াতে গুপ্তস্থান ব্যক্ত হইতেছে।[১৭৪]

সাধারণভাবে দামী ও মূল্যবান অলংকার ধনীরাই ব্যবহার করিতেন এবং তাহা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসমাজের নিকট ছিল স্বপ্নবিলাস। ইহার সাক্ষ্য নিম্নোদ্ধৃত দেওপাড়া প্রশস্তির ২৩ নং শ্লোক : রাজার কৃপায় নগরে আসিয়া পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীরা ঐশ্বর্যশালিনী হইলেও তাহারা মুক্তা ও কার্পাসবীজে মরকত ও শাকপ[illegible], রূপা ও লাউফুলের রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজ, সোনা ও কুমড়া ফুলের পার্থক্যে হিসাব করিতে পারিতেন না।[১৭৫] অনুরূপ সদ্যুক্তিকর্ণামৃতে বর্ণিত অপর একটি চিত্রে পল্লীরমণীদের বেশভূষার বিবরণ পাওয়া যায় : "কপালে কাজলের টিপ, হস্তে ইন্দু-কিরণ-স্পর্ধী সাদা পদ্ম মৃণালের বালা, কর্ণে কচি রীঠা ফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধ কেশ কবরীতে তিলপল্লব অনাগর রমণীদের এই ভূষণ পান্থর গতি হ্রাস করিতেছে।"[১৭৬]

সুতরাং বলা যাইতে পারে, অঙ্গ বিভূষণে বহুবিধ অলংকারই ব্যবহৃত হইত। অঙ্গ ভূষণে নিশ্চয় পুরুষের চাইতে নারীরাঃ অধিক অলংকার পরিধান করিত। তবে এই অলংকার ধনী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণে সহায়ক হইত। কারণ ধনীরা ধন

ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং অঙ্গ ভূষণে মূল্যবান অলংকারাদি পরিধান করিত। কিন্তু দরিদ্রের সেই মূল্যবান অলংকার পরিধানের সামর্থ্য কোথায়। তাই তাহাদের নিকট বৃক্ষলতা, ফলফুলই ছিল সৌন্দর্য চর্চার ও অঙ্গ ভূষণের উপকরণ।

গ. ক্রীড়া-কৌশল ও নৃত্যগীত

শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি বনচারী জনগোষ্ঠীর মানুষের শিকার ছিল প্রধান জীবিকা ও বিহার দুইই এবং শরধনু ছিল তাহাদের শিকারের সরঞ্জাম। তাহাদের শিকারের একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে চর্যাগীতিতে, ভুসুকু রচিত ষষ্ঠ চর্যায় :

কাহেরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল ডাক পড়অ চৌদীস।। ধ্রু।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসু অহেরি।।

(হরিণীর উক্তি।) 'কাহার তরে ওলামেলা করিয়াছ—আছ কিসের জন্য। বেড়া ডাক পড়িতেছে চারিদিকে'।

... ...

'আপনার মাংসে হরিণ (আপনার) বৈরী। ক্ষণকালের তরে ভুসুঁকু শিকার ছাড়ে না।'[১৭৭]

কবি উমাপতিধরের বর্ণনায় ব্যাধের শরসংযোজনের ইতিবৃত্তের কথা পাওয়া যায়।[১৭৮] অন্যত্র গদাধর বৈদ্য ব্যাধের নিষ্ঠুর কর্মের প্রতি ধিক্কার দিচ্ছেন তাহা উল্লেখ করিবার মত :

হে ব্যাধ, (আমি) কৃতাঞ্জলি হইয়াছি, পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবিকা নাই কি? তুমি পশুপক্ষিগণকে নিহত করিয়া অরণ্যকে কেন বাকশূন্য করিতেছ।[১৭৯]

পবনদূত কাব্য হইতে বিহার রসিকা শবর রমণীদের কথা জানা যায়।[১৮০]

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর ন্যায় বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজন্যবর্গ অভিজাত শ্রেণী সাধারণত ছিলেন যোদ্ধা। শিকার তাহাদের প্রধান বিহার হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কারণ শিকারের মধ্যে ছিল যোদ্ধার রণোন্মাদনার ও বীরত্বের প্রতিফলন। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান বিহার ছিল শিকার। এই সম্পর্কে চর্যাগীতিতে উল্লেখিত ২৩ নং চর্যার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। ভুসুকু বলিতেছেন :

জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহ সি পঞ্চজণা।
নলণীবন পইসন্তে হোসিসি একুমনা।। ধ্রু।।
জীবন্তে ভেলা বিহনি মএল ণ অণি।
হণ বিণু মাংসে ভুসুকু পদ্ম বণ পইস হিণি।। ধ্রু।।
মাআজাল পসবিউ রে বাধেলি মা আহরিণী।
সদগুরুবোহেঁ ঝুকি রে কাসু কহিনি।। ধ্রু।।

যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাবে, মেরো সেই পাঁচ জনকে। নলিনী বনে প্রবেশ করতে থেয়ো একমনা।। জীবন্ত হল প্রভাব, মরল রজণী হনন বিনা মাংসের জন্য ভুসুকু পদ্ম

বনে প্রবেশ করল।। মায়াজাল প্রসারিত করে সে বাঁধল মায়া হরিণী। সদগুরুর বোধে বুঝিরে, কার কাহিনী।।[১৮১]

পবনদূত কাব্যে ধোয়ী নারীদের শরীর ক্রীড়ার অংশ হিসাবে জলক্রীড়া এবং উদ্যান রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১৮২] জলক্রীড়া কি ধরনের ছিল এবং ইহাতে পুরুষ অংশগ্রহণ করিত কিনা বা কিভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইত তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার জলক্রীড়ার বিবরণ হইতে জানা যায় এইভাবে :

শ্রীকৃষ্ণের মায়া পরিগৃহীত মূর্তি সকল,
গোপীগণসহ যমুনা জলে গমন করিলেন।
তাঁহারা সকলেই কামবাণে পীড়িতা হইয়া
জলকেলিতে রত হইলেন। কামপরবশ কৃষ্ণ,
প্রথমত রাধিকার অঙ্গে জল প্রদান করিলেন।
হরি রাধিকার বস্ত্র বলপূর্বক গ্রহণ করিলে, তিনি
নগ্না হইলেন ; তখন কৃষ্ণ তাহার মালা ছিন্ন করিলেন ;
ও তাহার কবরী শিথিল করিয়া ফেলিলেন ; জলক্রীড়ায়—
রত হইয়া জল বিলোড়নে দেবীর সিন্দুর পত্রাবলী
মনোহরবেশ সুবিচিত্র ওষ্ঠরাগ ও নয়নের কজ্জল সমস্তই
বিলুপ্ত হইল। হরি বিবস্ত্র রাধিকাকে আলিঙ্গন কবত
জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং জলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করত
তৎপরে রাধিকাসহ উত্থিত হইলেন।[১৮৩]

তবে এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে—পুরাণে রাধা-কৃষ্ণের জলকেলির চিত্র দেব-দেবীর প্রেমলীলার বর্ণনা। প্রাচীন বাঙালি রমণীগণের জলক্রীড়ায় পুরুষের অংশগ্রহণ তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসম্ভব ছিল।

তৎকালে নিম্নশ্রেণীর মহিলারা কড়ির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা করিত। যেমন, ঘুন্টি খেলা, বাঘবন্দি-ষোলঘর, দশ-পঁচিশ, আড়াইঘর।[১৮৪] তৎকালীন সময়ে পাশা ও দাবা খেলাও বেশ জনপ্রিয় ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন পুরুষের সঙ্গে মেয়েরাও পাশা খেলিত। রতিপণ রাখিয়া পাশা খেলার উল্লেখ আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে মিলিতেছে :

সখার নিকট নায়িকার বৈদগ্ধ্যের প্রশংসা : যদৃচ্ছা রতিপণ রাখিয়া নায়িকা পাশা খেলা শুরু করিয়াছিল। খেলায় নিজের পরাজয় অনুমান করিয়া “পাশা সরাও” এই বলিয়া কপট রোষ প্রকাশপূর্বক সে সখীদিগকে দূরে সরাইয়া দিল।[১৮৫]

এই পাশা খেলায় দক্ষ চালকের প্রাধান্য সব সময়ই থাকিত এবং পাশার গুটি ক্রীড়কের দান অনুসারে তাহার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইত।[১৮৬] দাবা খেলায় কৃতিত্ব অর্জনও গুটির নয়, চালকের ছিল। এই খেলায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বিজ্ঞ লোকের চালনায় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতেন।[১৮৭] তবে বাংলাদেশে দাবা খেলার প্রচলন কখন হইয়াছিল তাহা লইয়া সংশয় রহিয়াছে। ইহা চর্যাগীতিতে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে,

চর্যাগীতির রচনাকালে এই খেলা বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই খেলায় "রাজা" হইয়াছে "ঠাকুর"। আবার ঠাকুর একটি বিদেশী শব্দ। ইহা হইতে এই খেলা বিদেশাগত ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নয়।[১৮৮] চর্যাগীতির দ্বাদশ চর্যায় কাহ্নপাদ এই খেলার একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন :

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদগুরু—বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উ এসেঁ কাহ্নু নিঅড় জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িয়া মারিউ।
গতন বরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।
মতি এঁ ঠাকরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু আমৃহে ভালদান দেহুঁ।
চউষটঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ॥

করুণার পিড়িতে নয়বল (দাবা) খেলি, সদগুরুবোধে ভববল জিতিলাম দুই নষ্ট হইল, ঠাকুর দিও না, উপকারি-উপদেশে কাহ্নুর নিকটে জিনপুর। প্রথমে ব'ড়ে তুড়িয়া মারিলাম, তারপরে গজবর তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিলাম। অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্নু বলে, আমি ভাল দান দেই, চৌষট্টি কোঠা গুণিয়া লই।[১৮৯]

তখনকার দিনে জুয়া খেলারও বেশ প্রচলন ছিল। তাহাছাড়া সাপুড়ের সাপখেলা দেখা বেশ উপভোগ্যই ছিল।[১৯০]

তৎকালীন সমাজে নাচ, গান, নাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের প্রচলন ও সমাদর ছিল যথেষ্ট। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে নৃত্যরত নারী-পুরুষের অসংখ্য প্রতিকৃতি দেখা যায়।[১৯১] ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ইহা তৎকালীন সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরে সমভাবে জনপ্রিয় ছিল। এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেবের নাম উল্লেখ করাই সঙ্গত। ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ জয়দেবের নাম খুবই শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ করিয়া থাকেন। এতদসঙ্গে নৃত্যগীতপটীয়সী কবিপত্নী পদ্মাবতীর নাম সগৌরবে উল্লেখিত হইয়াছে। জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়া বিভিন্ন ধরনের গল্পও প্রচলিত আছে। সেকশুভোদয়ার গল্পটি নিম্নরূপ :

সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভায় একদিন একজন গুণী আসিয়া বলিলেন—আমার নাম বুড়ণ মিশ্র। সঙ্গীত এবং বিবিধ শাস্ত্রে আমার সমান পাণ্ডিত্য। আমি উড়িষ্যা জয় করিয়া রাজা কপিলেন্দ্র দেবের নিকট হইতে জয়পত্র লইয়া আসিয়াছি। সেক জালালউদ্দীন সম্রাট সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বুড়ণ মিশ্রের কথায় বলিলেন, একটা রাগ আলাপ করুন তো শুনি। মিশ্র পঠমঞ্জরী রাগ আলাপ করিলেন ; অমনি নিকটবর্তী অশ্বত্থবৃক্ষের পাতাগুলি সব ঝরিয়া পড়িল। লোকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। বাজনা বাজিতে লাগিল, সম্রাট জয়পত্র দিতে উদ্যত হইলেন। পদ্মাবতী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, বাজনা শুনিয়া

সভায় আসিয়া বলিলেন, আমি এবং আমার স্বামী বর্তমান থাকিতে সঙ্গীতে জয়পত্র লইবে কে? আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ দিউন। সেক বলিলেন, তাঁহার কথা পরে হইবে, এখন আপনিই একটা রাগ আলাপ করুন। সেকের অনুরোধে পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করিলেন, গঙ্গায় যত নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, সব উজানে বহিল। সকলেই বলিল, কি আশ্চর্য, গাছ তো তবু সজীব, মিশ্রের গানে তাহার পাতা ঝরিয়াছে। আর এ যে নির্জীব নৌকা উজান বহিয়া চলিয়া গেল। সেক বলিলেন—আপনাদের দুইজনের মধ্যে কে জিতিয়াছেন, শাস্ত্র বিচারে তাহা নির্ধারিত হউক। মিশ্র বলিলেন—আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিচার করিতে চাহি না। এ রাজ্যে দেখিতেছি পুরুষেরা মূর্খ। এই কথা শুনিয়া পদ্মাবতী দাসী পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া কবি জয়দেব আসিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। আদ্যোপান্ত শুনিয়া জয়দেব বলিলেন, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল এ আর আশ্চর্য কি? বসন্তকালে গাছের পাতা তো আপনি ঝরিয়া পড়ে। উত্তরে জয়দেব বলিলেন, আচ্ছা, এই গাছটায় নতুন পাতা যাহাতে গজায়, মিশ্র তাহার ব্যবস্থা করুন। মিশ্র বলিলেন, আমি পারিব না। সেক কবিকে বলিলেন, আপনি পারেন? জয়দেব বলিলেন, পারি। এই বলিয়া তিনি বসন্ত রাগ আলাপ করিলেন, অমনি গাছটি নতুন কচি পাতায় ভরিয়া উঠিল। মিশ্র পরাজয় স্বীকার করিলেন, সভায় জয়দেবের খুব প্রশংসা হইল।[১৯২]

সেকশুভোদয়ার এই গল্পটির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিতে পারে এবং ইহাতে কল্পনাই বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। তবুও এই গ্রন্থে প্রদত্ত অতিরঞ্জিত তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, কবি জয়দেব ও তদীয় পত্নী পদ্মাবতী নিঃসন্দেহে নৃত্যগীতে অত্যন্ত পারদর্শী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সমাজে তাহাদের শিল্পীরূপে বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত ছিল।

সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে নৃত্যরত রাজকুমারের বর্ণনায় ভৈরবরূপে তাহার পৃথিবীকে রক্ষার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে :

শেষ বিচারের দিনের উত্থিত ধূম্রপুঞ্জের সহিত তাহার দেহ হইতে ঝলকিত অগ্নি যাহার বাহু অসি উত্তোলন করিয়া আছে। যেন মহিষের মাথা হইতে তাহার শিং দ্বারা চতুর্দিকে ছড়ানো মাছির ঝাঁক, তাহার বাহু পদ যেন...আলোক দ্বারা ঝলকিত, যাহা দেবগণ ভীত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, (একটি সূর্য যাহা অনেক তারার মধ্যে প্রজ্বলিত হইতেছে) এই নৃত্যরত রাজকুমার তাহার ভৈরবরূপে যেন পৃথিবীকে রক্ষা করেন।[১৯৩]

অপরদিকে সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে গ্রাম্য সাধারণ মেয়েরা যে স্বরচিত গান গাহিয়া এবং অভিনয় করিয়া বেড়াইত—ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৯৪] আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকের অনুরূপ বর্ণনার দক্ষ অভিনেত্রীর ভূমিকায় নটী অঙ্গাদি অভিনয় দ্বারা রসাভিনয়কে মূর্ত করিবার ইঙ্গিত রহিয়াছে :

যবনিকা অপসারিত হইলে নর্তকী যেমন প্রথমে সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া তাহার পর রসভাস্পুষ্ট অভিনয়ে সামাজিকের মনোরঞ্জন করে। দয়িতাও তেমনই ঘোমটা অপসারণে প্রথমে লজ্জা, তৎপরে পূর্ণ শৃঙ্গার ভাবচেষ্টায় আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে।[১৯৫]

সদ্যুক্তিকর্ণামৃত এর অপর একটি শ্লোকে আছে : গান গাহিয়া গ্রাম্য রমণীরা শীতের চাউল কাড়িতেছে—তাহাদের গানের সুরের সহিত হস্তে আন্দোলিত চুড়ির ধ্বনি মিলিত হইতেছে।[১৯৬]

উল্লেখ্য যে, বাররামা ও দেবদাসীদের কথা এই প্রসঙ্গে না বলিলে সেন যুগে বাংলার নৃত্য ও গীত চর্চার আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাহারা নৃত্যগীত ও বাদ্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাহারা বিভিন্ন কলায়ও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন—ইহার ইঙ্গিত লিপি[১৯৭] ও সাহিত্যিক উৎসে পাওয়া যায়। পবনদূত কাব্যের একটি শ্লোকে ইহাদের লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং তৎকালীন বাংলার শাসক লক্ষ্মণসেনকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে :

সে দেশে যাইলে বীর।
সেন-ভূপতির কীর্তি দেখিবে বিষ্ণুর মন্দির।
সেথা বিরাজেন কমলাকান্ত
মুরারি-মুরতী অতি প্রশান্ত ;
প্রকৃতি-সুতগা দেবদাসীগণ লীলা কমলিনী হাতে
নিয়ত ঘুরিয়া লক্ষ্মীর মত সেবে যেন প্রাণনাথে।[১৯৮]

তৎকালীন যুগে দেববধূরাও সঙ্গীতে সুপটু ছিলেন। তাহাদের সুমধুর গীত শুনিবার জন্য মৃগবালারাও উদগ্রীব থাকিত। কারণ সেই গীতমালা দিকে দিকে অভিনবভাবে ঝঙ্কৃত হইত এবং সকলকে আকৃষ্ট করিত।[১৯৯]

তৎকালীন সময়ে নৃত্যগীতে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। যেমন, করতাল, মৃদঙ্গ, স্বরযন্ত্র, বীণা, বেণু, শৃঙ্গ, ঢক্কা, পটহ, মুরজ, আনক, বংশী, সন্নহনী, কাংস্য ইত্যাদি। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ফলক ও প্রস্তর চিত্রে বিভিন্ন ধরনেব বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি লক্ষণীয়।[২০০] এই সম্পর্কে চর্যাগীতির বিভিন্ন চর্যাতে আরও নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। যেমন, করণ্ড কশালা, লাউ এর একতারা, মাদল, দুন্দভি প্রভৃতি। কৃষ্ণপাদানামের রচিত চর্যায় বিবাহযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে :

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণী করণ্ড কশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্নু ডোম্বী বিবাহে চলিলা॥

ভব ও নির্বাণ হইল পটহ-মাদল, মন পবন দুই করণ্ডকশালা ; জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্নু ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিল।[২০১]

তখন লাউ এর খোলা ও বাঁশের দণ্ডে তন্ত্রী লাগাইয়া একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হইত এবং বাদ্যের সহিত নৃত্য সংযোজিত হইত। এই ধরনের একটি চর্যায় বীণাপাদ বলিতেছেন :

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্ত্রী।
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী॥ ধ্রু॥

বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুণ তান্তী ধনি বিলসইরুণা॥ ধ্রু॥
আলিকালি বেণি সারি সুণে অ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণি আ॥ ধ্রু॥
জবে করহা করহকলে চিপিউ।
বতিস তান্ত্রী ধনি সএল ব্যাপিউ॥ ধ্রু॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥ ধ্রু॥

সূর্য লাউ, শশি লাগল তন্ত্রী রূপে অনাহত দণ্ড, চক্রকরা হল অবধূতীকে। বাজে ওলো সখী, হেরুক বীণা। শূণ্যতন্ত্রী ধ্বনি করুণ (সুরে) বিলাসিত হয়॥ আলি-কালি দুই সা (এবং) রে (ধ্বনি) শুনে। গজবরের সমরসসন্ধি গণনা করে॥ যখন করহ করহ কলে চাপা হল। বত্রিশ তন্ত্রী ধ্বনি সর্বদিক ব্যাপ্ত হল॥ নাচছেন বাজিল, গাইছেন দেবী বুদ্ধ নাটক বিসন হয়।[২০২]

এখানে উল্লেখিত বুদ্ধ নাটক কথাটি আমাদেরকে সেই যুগের নাট্যাভিনয় এবং কোন বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কারণ এখানে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীর কথা বলা হইয়াছে। আরও উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীতপটীয়সী ডোম্বী বা নীচ জাতীয় মহিলাদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা শিথিল ছিল, সেই কারণে তাহারা উচ্চশ্রেণীর পুরুষদেরকেও মনোরঞ্জনে সক্ষম হইত। তাই কাপালিকদের সঙ্গে যোগের সঙ্গিনী হইতেও তাহাদের বাধিত না। অথবা কাপালিকদের পক্ষেও নীচ জাতীয় মহিলাদের নিকট সঙ্গ সম্ভব ছিল। এই সত্যের আভাস পাওয়া যায়, কাহ্নুপাদের একটি চর্যায় :

কিরূপ হ্যাঁলো ডোম্বী, তোর চাতুরী? তোর অন্তে কুলীন জন, মাঝে কাপালি। কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্নু গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর অধিক ছিনালী নাই।[২০৩]

এই ডোম্বীরা নৃত্যগীতে দারুণ পটু ছিলেন। দশম চর্যায় ডোম্বীর নানা গুণের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া কাহ্নুপাদ আবার বলিতেছেন :

এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

একটি সেই পদ্ম চৌষট্টি (তাহার) পাপড়ি তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী বাপুড়ী।[২০৪]

এখানে একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ির উপরে নৃত্যের বর্ণনার ভিতর দিয়া ডোম্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘ. যানবাহন

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। যানবাহনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নদ-নদী খাল-বিলের কথা আসিয়া যায়। বাংলার সামাজিক জীবনে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই যাতায়াত ব্যবস্থায় নৌকার ব্যবহার বাঙালির চিরায়ত। নাব, নাবী, নাবড়ি, ভেলা, বেণী প্রভৃতি এবং

ইহার আনুষঙ্গিক কেড়ু আল, খুন্টি, কাচ্ছি, মাঙ্গ, পিট, দুখোল, চকা পতবাল, নাহী, গুণ ইত্যাদির উল্লেখ ছাড়াও নৌবন্দর, নৌযাত্রা, নৌবাহিক প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৫] সম্ভবত এই নদীমাতৃকার প্রভাব চর্যাপদে অত্যন্ত গভীরভাবে ছাপ পড়িয়াছে। ইহার গীতগুলি সাগর-নদী-খাল-বিলের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাই বোধহয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চর্যাকারদের বর্ণনায় প্রধান প্রধান দার্শনিক তত্ত্বগুলি এবং গুহ্য সাধন তত্ত্বগুলি এই সাগর-নদী-খাল-বিলের রূপকেই বর্ণিত হইয়াছে, তদরূপ চাটিল্লপাদের চর্যাতে :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুয়ান্তে চিখিল মাঝেঁন থাহী॥

ভবনদী গভীর, গম্ভীর তাহার বেগ ; দুই তীরে কাদা মাঝে ঠাই নাই॥[২০৬]

নদীর দুই কূলের অতিরিক্ত কর্দমাক্ততা বাংলাদেশের নদনদীসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাহা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের খাল-বিলের উল্লেখ প্রসঙ্গে সরহপাদের চর্যাতে বলা হইয়াছে :

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা॥

পথে যাইতে বাঁকে বাঁকে ডাইনে-বায়ে অনেক খাল বিখাল রহিয়াছে, সরহ বলিতেছেন, এই সব বাঁকা খাল-বিখালে প্রবেশ করিও না, একেবারে সোজা পথে অগ্রসর হও।[২০৭]

অপরদিকে চর্যাকারগণ যোগতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করিতে গিয়া নানাভাবে নৌকার প্রসঙ্গ রূপক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে নৌকা বাহিবার বিস্তারিত বর্ণনাও রহিয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের মাঝিমাল্লাদের কর্মের একটি চমৎকার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে নিঃসন্দেহে। এই সম্পর্কে সরহপাদ বলিতেছেন :

কাঅ ণাবড়হি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধরাহু বে নাহী।
অন উপায়েঁ পার ণ জাই॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুনে।
মেলি মেলি সহজেঁ জাউণ আণেঁ॥
বাট অ ভঅ খান্ট বি বল অ।
ভব উলোলেঁ ষঅতি বোলিঅ।
কূল লই ধরে মোণ্ডে উদ্ধাঅ !
সবহ ভণই গঅণে পমাএঁ॥

কার নৌকা, মন খাঁটি হইল—তাহার দাঁড়-সদগুরু বচনে হালধর। চিত্ত স্থির করিয়া ধর নাও, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে ; ঠিক সহজেই গিয়া মিলিত হও, অন্যদিকে যাইও না। পথে আছে ভয়, বলবান দস্যু ভবতরঙ্গে সই টলমল, কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়—সরহ বলে, গগনে প্রবেশ করে (অর্থাৎ গুণের

নৌকা খরস্রোত উজাইয়া বহুদূরে দিকচক্রবালে যেখানে আকাশ ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে সেইখানে অদৃশ্য হইয়া যায়।[২০৮]

অপর একটি নৌকাযাত্রার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। কম্বলাম্বরপাদের বর্ণনা রহিয়াছে, মাঝিরা একটি ছুঁচলো খুঁটি নদী বা খালের কূলে কাদামাটিতে পুতিয়া ইহার সহিত কাছি দিয়া নৌকা বাঁধিয়া রাখে এবং নৌকায় করিয়া কোথাও রওনা হইবার সময় প্রথমে খুটি তুলিয়া কাছি গুটাইতে হয়। তারপর মাঝনদীতে আসিয়া চারিদিক দৃষ্টি মেলিয়া নৌকার দাঁড় টানা শুরু হয়। এখানে উক্ত হইয়াছে, কম্বলাম্বরপাদের চর্যাতে :

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছী॥
মাঙ্গত চড়িলে চউদিসে চাহঅ।
চেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পবঅ॥

খুঁটি তুলিয়া কাছি মেলিল : হে কামলি, —সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিয়া চল। পথে চড়িয়া চারিদিকে চায় : দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে?[২০৯]

অপর একটি চর্যায় নৌকায় খেয়া পারাপারের চিত্রও পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর নারীরাও খেয়া পারাপারের কাজ করিত। চর্যাপদে বর্ণিত হইয়াছে জনৈক ডোম্বী কর্তৃক তাহার ভাঙ্গা নৌকায় নদী পারাপারের অপূর্ব দৃশ্য :

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ চুড়িলী মাতঙ্গি-পোই অলীলে পার করেই॥
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সৎগুরু পা অপ এঁ জাইব পুনু জিণউরা॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ-দুখোলেঁ সিংচহুঁ পানি ন পইসই সান্ধী॥
চন্দ-সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা।
বাম-দাহিণ দুই মাগন চেবই বাহতু ছন্দা॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কূলেঁ কূল বুড়ই॥

গঙ্গা যমুনায় নৌকা বাহিয়া তাহাতে মতঙ্গকন্যা ডোম্বী জলে ডুবিয়া ডুবিয়া যোগীকে লীলায় পার করে। অদ্ভুত তুই ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথই দেরী সদগুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধা ; গগনরূপ সেউতিতে জল সেঁচ, জল যেন নৌকার ভিতরে না ঢোকে। কড়ি লয় না, বুড়িও লয় না, স্বেচ্ছায় পার করে, যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানে না, তাহারা কূলে কূলেই ঘুরিয়া বেড়ায়।[২১০]

এখানে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়াছে যে, পারাপারের মাশুল হিসাবে এই নিম্নশ্রেণীর ডোম্বীরা পাটনীর কাজ করিয়া বেশ টাকা-পয়সা রোজগার করিত। অবশ্য এই ধরনের পেশা নিম্নশ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করিত।

মাঝনদীতে নৌকা লইয়া মায়াজাল বাহিবার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর একটি চর্যায় শান্তিপাদ বলিতেছেন :

সঅসম্বেঅণ সরুঅ বিআবেতেঁ অলক্‌খ লকখন জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই॥
কুলেঁ কুল মা হোই রে মুঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল তিল একু বাঙ্কন ভুলহ রাজপথ কন্‌ঢাবা॥
মা আ-মোহা সমুদা রে অন্তন বুঝাসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ম পুছমিনাহা॥
সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জাংতে।
এষা অট মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জা অন্তে॥
বাম দাহিণ দো বাট্টা ছাড়ী সান্তি বুল থেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খডতড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাহউ॥

হে মুঢ়, কুলে কুলে ঘুরিয়া ফিরিওনা ; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজ পথ। সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোন নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিক যাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তিব পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝ পথে) চলিতে হইবে। এই পথে ঘাট-ঝোপ কিছু নাই, বাধা বিঘ্ন কিছু নাই ; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায়।[২১১]

এই নৌকা বাহিবার প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটি ক্ষীণ আভাস পাইতেছি। তখন নৌকাতেই বেশি ব্যবসা-বাণিজ্য হইত। সোনারূপার বাণিজ্যও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। এইরূপ একটি চর্যায় কম্বলাম্বর-পাদ বলিতেছেন :

সোনে ভরিলী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

সোনায় ভরতি আমার করুণা নৌকা, রূপা থুইবার আর ঠাঁই নাই।[২১২]

এই নৌকার ব্যবহার সম্পর্কে বৌদ্ধ চর্যাগীতিকারগণ মহাসুখলাভরূপ পরম নির্বাণের পথ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনাকে রূপক হিসাবে মনে করিয়াছেন। তথাপি বলা যায় যে, তাহাদের এই বর্ণনার ভিতরে বাংলার নদীমাতৃকার প্রভাব অত্যন্ত বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

আমরা অন্য উৎস হইতেও নৌকার উল্লেখ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতেছি, আর্যাসপ্তশতীতে উল্লেখিত গুণে টানা নৌকার সহিত নায়কের চরিত্র নায়িকার দৃষ্টিতে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

বিমুখ নায়ককে নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দূতীবাক্য : হে সুন্দর, বহু গুণ চাতুর্যে আপনি তাহার চরিত্রগুণ নষ্ট করিয়াছেন। আবর্তে পতিত নৌকার মত সেই

নায়িকা এখন অনন্যগতি। অর্থাৎ আবর্তে পতিত গুণে টানা নৌকা, হাল নিষ্ক্রিয় থাকিবার ফলে যেমন গুণাকর্ষকের প্রতি আকৃষ্ট হয় নায়িকাও তেমনই আপনার প্রতি আকৃষ্ট।[২১৩]

অন্যত্র আবার নায়িকাকে দেখিয়া নৌপালের রূপণায় নায়কের উক্তি বেশ চমৎকার :

নৌকার পাল যেমন উপরে থাকিয়া রৌদ্র ক্লেশাদি উপেক্ষা করিয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক বহিত্রকে আকর্ষণ করে, হে সুতনু, তুমিও তেমনই আমাকে আকর্ষণ করিতেছ।[২১৪]

জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ মীনরূপে নৌকার ন্যায় বেদ উদ্ধারে সফল হইয়াছিলেন :

হে কেশব ! হে মীনদেহ ধারিণ ! হে জগদীশ ! হে হরে ! প্রলয় সমরে বেদত্রয় সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইলে তুমিই মীনরূপে নৌকার ন্যায় সম্যকরূপে সেই বেদের রক্ষা বিধান করিয়াছিলে ; তুমি জয়যুক্ত হও।[২১৫]

বল্লালচরিতে একস্থানে নৌকা চালকগণ কর্তৃক বায়াত্তর দাড়ের নৌকা চালাইয়া রাজা লক্ষ্মণসেনকে অনুসন্ধান করিবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[২১৬]

সুতরাং নদনদীবহুল বাংলায় যাতায়াতের বাহন হিসাবে নৌকাই ছিল অন্যতম বাহন এবং সহজে যাতায়াত করিবার সুবিধার্থেই তৎকালীন জনসাধারণ নৌকাকেই বেশি প্রাধান্য দিত। সেই কারণে নৌকার ব্যবহার তৎকালীন সাহিত্যে বহুবার উল্লেখিত হইয়াছে। তাই ধর্মীয় বিষয়ের রূপ হিসাবে যাতায়াতের মাধ্যমে নৌকার বর্ণনা সত্যিই চমৎকার এবং ইহাই তৎকালীন মানুষের দৈনন্দিন জীবনচিত্রের বিশেষ অঙ্গরূপে সার্থক ছবি।

স্থলপথে যাতায়াতের বাহন হিসাবে গরুর গাড়ি বা গো-যানের ব্যবহার ছিল অন্যতম। বরযাত্রায়ও গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হইত। নৈষদচরিতের উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক নীহাররঞ্জন বলিতেছেন যে, "মহিষের দধির ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ছিল। তবে মহিষের গাড়ি প্রচলনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[২১৭] অপরদিকে কিন্তু শাহানারা হোসেন মাল পরিবহণ কার্যে মহিষ ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন।[২১৮] আবার রামচরিত হইতেও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মহিষারোহণের বিষয় জানা যায়।[২১৯] তাই নীহাররঞ্জনের উপরোক্ত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে, লোকায়ত যান গরু বা গরুর গাড়ি অপেক্ষা মহিষের যান ছিল অপেক্ষাকৃত কম। যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে অশ্বযানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মদন রথের ঘোড়ার উল্লেখ আর্যাসপ্তশতীতে আছে।[২২০] অবশ্য অশ্বারোহিত যান সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। জীমূতবাহন দায়ভাগে অশ্বযানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২২১] পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির ফলকে সুসজ্জিত অশ্বের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।[২২২] যুদ্ধবিগ্রহে অশ্বারোহী সৈন্য ব্যবহার করা হইত।[২২৩] অবস্থাশালী মানুষ সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া চলাফেরা করিতেন। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[২২৪] অপরদিকে এই অশ্বারোহণ ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ অনেক সময় দুষ্ট অশ্ব তাহার আরোহীকে নাজেহাল করিত। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে রহিয়াছে : "লোকটি অত্যন্ত ক্রোধী দুষ্ট অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—উহা পশ্চাতের খুরদ্বয়ের দ্বারা

ভূমি খণ্ডিত করিয়াছিল, সম্মুখের পদদ্বয়ে উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিল এবং মস্তক অবনমিত করিয়া নিজের রক্ষককে পতিত করিয়াছিল।"[২২৫] সুতরাং অশ্বযান যেমন ছিল বিত্তবান সমাজের চলাফেরার বাহন তেমনই এই অশ্বের আচরণও অনেক সময় হইত দুর্বিসহ। তাই ইহা ধনীর বাহন হইলেও এই বাহনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না।

অপরদিকে হস্তীও ছিল যাতায়াতের অন্যতম বাহন। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা হাতিতে চড়িয়া চলাচল করিতেন।[২২৬] আর্যাসপ্তশতীর একাধিক শ্লোকে রূপকছলে হাতির উল্লেখ রহিয়াছে।[২২৭] অনুরূপভাবে চর্যাগীতির বিভিন্ন গীতে ইহার উল্লেখ আমাদেরকে বাঙালি জনের সহিত ইহার আত্মিক যোগাযোগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তখন বর্তমানের মতই হাতি খেদা-পাতিয়া ধরা হইত, এইরূপ একটি চর্যায় কাহ্নুপাদ বলিতেছেন :

এ বংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।
বিবিহ বি আপক বন্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা॥

একার বাংকার দৃঢ় দুই খোঁটা মর্দিত করে। বিবিধ-ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করে॥ কাহ্নু-বিলাস করে, আসব মত্ত। সহজ-নলিনী বনে প্রবেশ করে (সে) নিবৃত্ত।[২২৮]

বন্য হাতি ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির, ইহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া পদ্মবনে প্রবেশ করিত। চর্যাগীতির অন্য একটি গীতে পাগলা হাতির বর্ণনা আছে, এখানে মহীধর পাদ বলিতেছেন :

মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই
নিরন্তর গঅণন্ত ঘোলাই॥
পাপ-পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ্র-খম্ভা-ঠাণা।
গঅণ-টাকলী লাগিরে চিত্তা পইঠ নিবানা॥
মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ সএল উএখী।

মত্ত হয়ে চিত্ত-গজেন্দ্র ধাবিত হয়। নিরন্তর গগন প্রান্তে তৃষ্ণায় ঘূর্ণিত হয়। পাপ-পূর্ণ দুই শিকল ছিঁড়ে, মদিত করে সম্ভ স্থান। গগন-চূড়া স্পর্শ করে চিত্ত প্রবেশ করে নির্বাণে॥ মহারস পানে মত্ত হল রে, ত্রিভূবন সকল উপেক্ষা করে।[২২৯]

এই উন্মত্ত বন্য হস্তী ধরিবার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করা হইত। একটি চর্যায় সারিগান গাহিয়া হাতির মন বশ করিবার ইঙ্গিত বেশ চমৎকার, এখানে বীণাপাদ বলিতেছেন :

আলি কালি বেণি সারি সুণে আ।
গঅবর সমরস সন্ধি গুণি আ॥

আলি কালি দুই সা এবং রে (ধ্বনি) শুনে। গজবরের সমরসন্ধি গণা করে।[২৩০]

সুতরাং যাতায়াতের বাহন হিসাবে হস্তী ছিল অন্যতম এবং অভিজাত শ্রেণী এই হস্তী যাতায়াতের বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতেন।

স্থলপথে আর একটি মাধ্যম হিসাবে পাল্কির ব্যবহার এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে পাল্কির উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে,

বল্লালসেন তাহার শত্রু রাজলক্ষ্মীদের হস্তীদন্ত নির্মিত বাহুদণ্ডযুক্ত পাল্কিতে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।[২৩১] তাহা ছাড়া আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে বস্ত্রাচ্ছাদিত দোলায় বিহার করিবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[২৩২] অবশ্য এই ধরনের বিহার ধনিক শ্রেণীর মহিলারাই উপভোগ করিত।

সুতরাং যাতায়াতের বাহন হিসাবে নৌপথে নৌকা এবং স্থলপথে গরু ও মহিষের গাড়ি, অশ্বযান, হস্তী আরোহণ এবং পাল্কিই ছিল অন্যতম। তবে অভিজাত বা উচ্চস্তরের মানুষ অশ্বযান, হস্তী আরোহণ, পাল্কি ভ্রমণ করিতেন। তাহাদের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হিসাবেও এইগুলি গণ্য হইত। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ নৌকা, গরু ও মহিষের গাড়ি ব্যবহার করিতেন। এইগুলি ছিল তাহাদের চলার পথের সঙ্গী। অবশ্য সম্ভবত অশ্বযান, হস্তীআরোহণ এবং পাল্কির মতো ব্যয়বহুল যাতায়াত মাধ্যম ব্যবহার তাহাদের সাধ ও সাধ্যের বাহিরে ছিল। পদযুগলই ছিল তাহাদের সাধারণ বাহন।

ঙ. ঘর-গৃহস্থালী

বিত্তবান নাগরিকগণ ইট-কাঠ নির্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকায় বসবাস করিতেন, রাজপ্রাসাদও ইট-কাঠ নির্মিত ছিল। সাধারণত রাজার বাড়ি হইত বৃহৎ অট্টালিকা। পবনদূতে অভিব্যক্তিপূর্ণ বর্ণনা রহিয়াছে :

হে মলয়, তুমি এইরূপে দেখি 'রাজধানীকে
প্রবেশিও শেষে সেন ভূপতির সুন্দরতম পুরে ঘুরে।
বিশাল ভবন হেরি' সমীরণ শুধু মনে হবে তব
—সাতটি স্বরগ সমেত জগৎ একীভূত অভিনব।
অবনীতে দেব-ইন্দের সম-গৌড়ীপতির পুরী,
দেখিবে তাহার প্রাসাদ উঠেছে আকাশের বুক ফুড়ি।
হর্ম্ম-শিখরে-ঠেকি' মেঘদল বিজলীর লীলাছলে,
পতাকার সমরাজাধিরাজের বিজয় ঘেষিয়া চলে।[২৩৩]

আবার এইসব গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনে গৃহতলে মদন আঁকা হইত।[২৩৪] অনেক সময় বাড়ির চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত হইত[২৩৫] এবং ইহার প্রাসাদ দরজা সিংহমুখ বিশিষ্ট হইত।[২৩৬] অনেক সময় প্রাসাদ শীর্ষে পতাকা পতপত করিয়া উড়িত।[২৩৭] আর্যাসপ্তশতীর এই ধরনের একটি শ্লোকে গোবর্ধনাচার্য সৌধপতাকার সহিত গুপ্ত প্রেমের বহিঃপ্রকাশ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা সত্যিই আকর্ষণীয় :

"গুপ্তপ্রেম কিরূপে ব্যক্ত হইল তৎসম্পর্কে সখীর উক্তি : নিভৃতে যে প্রেম করিয়াছে, অতি লজ্জা নাটন তুমি নিজেই তাহাকে প্রাসাদ শীর্ষে উড্ডীয়মানা পতাকার মত (সকলের নিকট) প্রকাশ করিয়াছ।"[২৩৮]

অপরদিকে সম্ভবত গ্রামে ইট-কাঠ নির্মিত বাড়িঘর ছিল না, কারণ কোনো গ্রামের বর্ণনায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানে দরিদ্রস্তর হইতে অবস্থাপন্ন গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত বাড়িতে বসবাস করিতেন। চর্যাগীতিতে ত্রিতল বাড়ি এবং কুঁড়েঘরের দুয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৩৯] ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সম্ভবত বড় অট্টালিকায় বাস করিতেন। অপরদিকে দরিদ্র লোকেরা কুটিরে বাস করিত। সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেরও একটি শ্লোকে দারিদ্র্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি দরিদ্র গৃহের ছবি : গৃহের কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে। আমার জীর্ণ ঘরে কেঁচোর শিকারী ব্যাঙে আকীর্ণ।[২৪০] আবার ত্রিতল অট্টালিকা দরিদ্রের নিকট স্বপ্নবৎ ছিল বলিয়াই কি একটি পদে চর্যাকারগণ ত্রিতল বাড়িকে জ্যোৎস্নাকাশে আকাশকুসুম রূপে শবর-শবরীর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এই সম্পর্কে ভুসুকুপাদ বলিতেছেন :

গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কুবাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামনি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাডু ছাডু মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুখে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী॥
হেরি যে মেরি তইলা বাড়ি খসমে সমতুলা।
ষুকড় এ সে রে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ির পাসের জোহ্না বাড় উ এলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে আকাশ ফুলিঅ॥
কঙ্গুবিনা পাকেলা রে শবর-শবরি মাতেলা।
অণুদিন সবরো কিংপিন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা॥
চারিবা সে তা ভলা রে দি আঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কত্রলা কান্দশা সগুণ শিআলী॥
মারিল ভবভত্তা রে দেহদিহে দিধলী বলী।
হের সে শবরো ণিরেবণ ভইলা ফিটিলি সলী॥

গগনে গগনে তিত্রল বাড়ি, হৃদয় ঠাকুর কণ্ঠে নৈরাত্মা বালিকা, জেগে উৎপাটিত করে। ছাড়, ছাড়, মায়া-মোহ বিষম দ্বন্দ্বকারী। মহাসুখে বিলাস করে শবর নিয়ে শূন্য নারীকে। দেখি সে আমার তৃতীয় বাড়ি শূন্যের ন্যায় সমতুল্য। সুন্দর এই সেই রে, কাপাস ফুটেছে॥ তৃতীয় বাড়ির পাশের জ্যোৎস্না বাড়ি উদিত হল। অন্ধকার দূর হল যে, আকাশ ফুল্ল হল। কঙ্গুরিণা পাকল রে, শবর-শবরী মত্ত হল। প্রতিদিন শবরের কিছুই চেতনা হয় না, মহা সুখে (সে) রইল। চতুর্থ সেই বাস তৈরি হল রে চঞ্চালী দিয়ে। তাতে তুলে শবরকে দাহ করল, কাঁদল শকুন-শৃগালী॥ মারল ভবমত্তাকে রে, দশদিকে দিল বলী। দেহ, সে শবরের নির্বাণ হল, ঘুচে গেল সব দুঃখ॥[২৪১]

উল্লেখ্য যে, বারিবহুল গ্রাম বাংলার দুঃসহ অসহায় মানুষের দুর্দশা চিরায়ত। এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা অবর্ণনীয়। সেন যুগে তথা বাংলার সমগ্র প্রাচীন কালে এই ভূ-খণ্ডের সাধারণ মানুষ ছিল দরিদ্র। তাহাদের বাঁশ, খড় ও মাটির গৃহের করুণ অবস্থা সমসাময়িক সাহিত্যে অতি বাস্তবভাবেই প্রতিফলিত।[২৪২]

তাহা ছাড়া পত্র নির্মিত তপস্বীর কুটীরও ছিল। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে গৃহস্বামার সহিত কান্তার প্রেমজনিত কলহ প্রসঙ্গে পর্ণশালার উল্লেখ পাওয়া যায় :

প্রেমজনিত কলহ ও আনন্দে মুখর গৃহের প্রশংসা : যে গৃহে রতিকলহে কুপিতা কান্তার হস্তদ্বারা কেশ গৃহীত হওয়ায় গৃহস্বামী আনন্দিত–তাহাই সত্যকারের গৃহ, তদ্ব্যতীত গৃহ গতানুগতিক পত্নীশালা বা পর্ণশালা।[২৪৩]

নদ–নদী, খাল–নালার আধিক্যের জন্য তখনও সাঁকোর প্রয়োজন হইত। আর এই জন্যই প্রাচীনকাল হইতে এদেশবাসী বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সহিত পরিচিত। এই সম্পর্কে চর্যাগীতির পঞ্চম চর্যায় চাটিলাপাদ লিখিয়াছেন, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির কারণে নয়, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, ধর্মের জন্য চাটিল সাঁকো তৈয়ারি করেন, এই জন্য তাহাতে কোনো ফাঁকি ছিল না ; পারাপারগামী মানুষ নিশ্চিন্তে তাহা পার হইতে পারিতেন :

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কল গঢ়ই।
পারগামি লো অ নির্ভর তরই॥
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ়ি টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥
সাঙ্কমত–চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নি–অড্ডী বোহি দূর মা জাহী॥
জই তম্‌হে লো অ–হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥

চাটিল ধর্মের জন্য সাঁকো গড়েন। পারগামী লোক নির্ভয়ে তরে॥ ফাড়িয়া মোহ তরু, পাট জুড়িয়া। অদ্বয় দৃঢ় টাঙ্গী (সাহায্য) নির্বাণকে (তৈয়ারি) করা হইল। সাঁকোতে ঠিকমত চড়িলে, ডাইনে বামে হইও না। নিকটে বোধি ; দূরে যাইও না। যদি তোমার লোকের পারগামী হইবে। জিজ্ঞাসা কর অনুত্তর স্বামী চাটিলকে॥[২৪৪]

আর্যাসপ্তশতীতে কাঠের সাঁকোর বিষয়েরও উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা নদীবিধৌত বাংলাদেশের একান্ত প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রসঙ্গে, দুষ্ট প্রভুর সহিত তুলনা করিয়া :

সাঁকোর কাঠে সাবধানে পদবিন্যাস করিতে হয়, পদস্খলিত পতন ঘটে, দুষ্ট প্রভুর সঙ্গেও সতর্কতার সহিত ব্যবহার নির্বাহ করিতে হয়, সামান্য ত্রুটি হইলে অনর্থ ঘটে। অন্য উপায় থাকিলে, কে সাঁকোর কাঠ ও দুষ্ট প্রভুকে আশ্রয় করে?[২৪৫]

বিভিন্ন উৎস হইতে গৃহের আসবাবপত্র ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। হলায়ুধ তাহার ব্রাহ্মণ সর্বস্বম গ্রন্থে আত্মপ্রশস্তিমূলক একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন :

(হলায়ুধ স্বীয় গৃহে) কোথাও কাঠের (যজ্ঞ) পাত্র ছড়াইয়া আছে ; কোথাও বা স্বর্ণময় পাত্র (ইত্যাদি)। কোথাও ইন্দু ধবল দুকুল বস্ত্র, কোথাও বা কৃষ্ণ মৃগ চর্ম। কোথাও ধূপের (গন্ধময় ধুম) ; কোথাও বষট্‌কার ধ্বনিয়া আহুতির ধুম। (এইভাবে তাহার গৃহে) অগ্নির এবং (তাহার নিজের) কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।[২৪৬]

রাজা-রাজন্যদের বিলাসিতা ছিল আকাশচুম্বী। সৌখিনতার চরম বহিঃপ্রকাশ তাহাদের আচরণে প্রকাশ পাইত। রাজা লক্ষ্মণসেনের ভোজনের বিবরণ হইতে তাহা উপলব্ধি সম্ভব। রাজা সাধারণত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে আহার করিতেন। মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের বিবরণে উল্লেখ আছে যে, বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের মুহূর্তে রাজা লক্ষ্মণসেন স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে আহার্য দ্রব্য আহার করিতেছিলেন।[২৪৭]

বস্তুত বিত্তবান মানুষ সোনা-রূপার থালা-বাসন প্রভৃতি বিলাস উপকরণ ব্যবহার করিতেন। অপরদিকের চিত্র ছিল ভিন্ন। গ্রামের সচ্ছল মানুষ কাঁসার তৈজসপত্র এবং দরিদ্র জনসাধারণ মাটির তৈয়ারি ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহার করিতেন।[২৪৮] কারণ সোনা-রূপার তৈজসপত্র ব্যবহারে তাঁহারা কোনো স্বপ্নও দেখিতেন না বা দেখিবার কোনো অবকাশই ছিল না। যেখানে জীবনধারণ কষ্টসাধ্য, সেখানে সৌখিনতার প্রশ্নই আসে না।

আর্যাসপ্তশতীর একাধিক শ্লোকে মৃৎকলস, কাঁচ নির্মিত রত্নপ্রদীপ, মঙ্গলঘট, ছিদ্র-বহুল চালনীর ব্যবহার উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার একটি শ্লোকে অসতী নারীর সহিত কাঁচ কলসের সুন্দর বর্ণনা সত্যিই আকর্ষণীয় :

> অসতী, সৎকবির সুক্তি এবং কাচ কলস—এই তিনটিই অন্তনিলনবসকে সর্বদা সম্পূর্ণরূপে বাহিরে ব্যক্ত করিতে জানে। (অসতী নারী লজ্জাহীনা কাজেই অন্তরের ভাবকে সে নিঃসঙ্কোচে বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে ; সুকবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি গূঢ়ভাব প্রকটনে সমর্থ ; আর কাঁচ পাত্র, স্বচ্ছ বলিয়া বাহির হইতে উহার ভিতরে সবটুকুই দেখা সম্ভব)।[২৪৯]

অন্যত্র একটি শ্লোকে মঙ্গলঘটকে সুন্দর ও মাঙ্গল্যের প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[২৫০] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লৌহপাত্রের উল্লেখ আছে।[২৫১]

চ. জীবনচিত্র

খ্রিষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় নাগরাদর্শের প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করে। ইহার ফলে স্বল্পাংশে হইলেও নাগর জীবনে নৈতিক শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তখন অবাধ কামনা-বাসনা ও বিলাস-লীলার স্রোতে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। সেনামলে ইহা চরম পরিণতি পাইয়াছিল। তখন সমাজ নানা প্রকার ব্যভিচারে পূর্ণ হইয়া যায়। অবশ্য সমাজের নীতি নির্ধারক ব্রাহ্মণগণ সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কণ্ঠ ও লেখনী প্রয়োগ শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম গ্রন্থের বর্ণনা বেশ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে সমাজের সকল প্রকার দুর্নীতিকামাতুরতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্য এবং পরনারী ও পরপুরুষে গমন প্রভৃতির বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা উক্তি করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকল অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সত্য-দান, শুচিতা, দয়া এবং সংযম প্রভৃতি সদগুণের অভ্যাস অনুশীলনের কথাও এখানে বলা হইয়াছে।[২৫২] সমাজের নীতি-নিয়ামক এই ধরনের স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশও নিশ্চয় একই সঙ্গে সামাজিক অনৈতিকতার সংকেত বলিয়া মনে হয়। তখনও অনাচারের আধিক্য ছিল।

প্রতারক লোকের অভাব ছিল না। নির্বোধ মানুষ তাহাদের খপ্পরে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইত। অবশ্য প্রতারকের চিহ্ন কপট ভদ্রতা এবং সুমিষ্ট ব্যবহার নির্বোধের পক্ষে কি অনুধাবন করা সম্ভব?[১৫৩] উপরন্ত এই সময় ভোগ-ঐশ্বর্যময় নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি যৌন-বিলাসে সম্ভবত উপযুক্ত পোষকতাও সৃষ্টি করিয়াছিল। সমসাময়িক সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কবি ধোয়ীর "পবনদূত" কাব্যে কামচরিতার্থতার বিলাসলীলা অত্যন্ত সাড়ম্বরে বিবৃত হইয়াছে।[১৫৪] ইহার অন্তর্গত সভানন্দিনীদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান ও তাহাদের বিলাসলীলা আমাদেরকে তৎকালীন নাগরিক জীবনের তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে। পবনদূতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি এখানে প্রদত্ত হইল :

স্তব্ধ মৌন রাতে সেথা নিশব্দচরণ
মিলিতে বল্লভ সাথে পুরবালাগণ
চলে যায় অভিসারে ; —লাক্ষারাগরেখা
পদযুগ হ'তে খসি' হয়ে যায় লেখা
রাজপথে পরে পরে। – তরুণ তপন
প্রভাতে সে-চিহ্ন' পরে করিলে চুম্বন
রক্তাশোক পথ-তরু হইতে বার বার
স্তবকে করিয়া পড়ি' অভিসারিকার
ঢেকে দেয় শঙ্কালাজ ভয় ; তাই সবে
নিঃশঙ্ক ভেটিতে পায় আপন বল্লভ।[১৫৫]

কেশবসেনের ইদিলপুর[১৫৬] এবং বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষদ[১৫৭] লিপিতে উল্লেখিত হইয়াছে, সভানন্দিনীরা নূপুর ঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলি প্রতি সন্ধ্যায় পরিপূরিত করিয়া তুলিতেন। অবশ্য তাঁহারা অভিজাত সমাজের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইতেন।[১৫৮]

তাহা ছাড়া বিত্তশালী ব্যক্তিগণ বাড়িতে দাসী রাখিতেন। জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, নগরে ও গ্রামে উভয় ক্ষেত্রে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখিবার প্রথা ছিল সর্বজনীন। সাধারণত এই ধরনের দাসী কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে পোষণ করা হইত। দায়ভাগে আরও বলা হইয়াছে যে, একাধিক ব্যক্তির অধিকারে এক দাসী থাকিলে তাঁহারা পর্যায়ক্রমে সেই দাসী উপভোগ করিত।[১৫৯]

অপরদিকে দেবদাসী প্রথার প্রাধান্যও অত্যধিক ছিল। এই দেবদাসীরা সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী হইতেন। ফলে ইহারা অভিজাত সমাজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ সাধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। পাল আমলে এই প্রথা সমাজকে খুব বেশি প্রভাবিত করিতে সক্ষম না হইলেও সেন রাজাদের রাজত্বকালে তাহারা সমাজের উচ্চস্তরের সকল কামনা-বাসনাকে অধিকার করিয়া বসেন। উল্লেখ্য যে, ভট্টভবদেব[১৬০] এবং বিজয়সেন[১৬১] উভয়েই তাহাদের স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করিবার জন্য গর্ব প্রকাশ

করিয়াছেন। তাহাদের লিপিতে ইহাদের বিলাসলীলা ও সৌন্দর্য্যলীলাও স্বগৌরবে বর্ণিত হইয়াছে। দেবদাসী প্রথারও অপর প্রমাণ রহিয়াছে কবি ধোয়ীর "পবনদূত" কাব্য গ্রন্থে। কবি ইহাদেরকে বাররামা হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। পবনদূতে বাররামাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের বাররামাদের ও অন্যান্য সুন্দরী রমণীদের বর্ণনা দিয়া "পবনদূতকে" লোভ দেখাইয়া সুহ্মদেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :

> আস্মিন সেনান্বয় নৃপতি না দেবরাজ্যাভিষিক্তো
> দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলা কেলি কারো মুরাবিঃ।
> পর্ণৌ লীলাকমল মসৃকৎ যৎ সমীপে বহন্ত্যো
> লক্ষ্মী শঙ্কাং প্রকৃতি সুভাগাঃ কুবতে বাররামাঃ।

এই সুহ্মদেশে সেনান্বর নৃপতি (সেনবংশীয় রাজ্য) কর্তৃক দেবরাজ্য অভিষিক্ত কমলার কেলিসহচর মুরারি বাস করিতেছেন, যাহার নিকট লীলাকমল হাতে লইয়া প্রকৃতি-সুভগা (স্বভাবসুন্দর) বাররামাগণ অবস্থান করিয়া লোকের মনে লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করে।[২৬২]

তাঁহার অপর একটি শ্লোকে, সদ্যুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ হইতে :

> যত্র তত্র রতি সজ্জবন্বকী
> প্রীতয়ে মদন শাসনাদিব।
> নীলকান্ত পটতাম পাযযৌ
> সুচিভেদ্য নিবিড়ং নিশাতমঃ

কামক্রীড়ার্থে সজ্জিত বাররামাগণের সন্তোষের জন্য কামদেবের আদেশেই যেন সুচিভেদ্য গাঢ়, নৈশ অন্ধকার যেখানে সেখানে নীল তিরস্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে।[২৬৩]

তাহাছাড়া সদ্যুক্তিকর্ণামৃত সংকলন গ্রন্থের অন্যত্রও বঙ্গ বারাঙ্গনা বা বাররামাদের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাদের সাজসজ্জার বর্ণনাও চমৎকার :

সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেহটি আবৃত, হাত দুইটিতে সোনার অঙ্গদ গন্ধ তৈলে সুরভিত কেশপাশ শিখণ্ডাকারে—(চূড়ার মত করে) বাঁধা তাহা মাল্য হার্ত্ত (ফুলের মালাকেশ চূড়ায় বাঁধা) কর্ণলতিকায় নতুন চাঁদের কলার মতো নির্মল তালপত্র বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে।[২৬৪]

সুতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন বর্ণনা হইতে ইহা নিশ্চিত যে, তৎকালীন বাংলাদেশের নগরবাসী ধনবান রাজপাদোপজীবীশ্রেণী একটি বিলাসবহুল, অবসরপুষ্ট জীবনচর্যা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে এই নর্তকী বারনারী, দেবদাসী বা বঙ্গবারাঙ্গনারা সেই জীবনচর্যার অপরিহার্য অনিন্দিত অঙ্গস্বরূপ ছিল।

তৎকালীন নগরসমাজে এই ধরনের দুরাচারের ফলে হিন্দুসমাজে নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয় এবং দুর্নীতি ও অনাচার সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করে। হিন্দুদের বর্ণপ্রথা

উচ্চশ্রেণীর লোকদেরকে শূদ্র রমণী বিবাহে অনুমতি দিত না, কিন্তু এই প্রথা একজন ব্রাহ্মণকে শূদ্র রমণীর সহিত যৌনাচার করা হইতে নিবৃত্ত করে নাই। এমন কি এই ধরনের একটি নৈতিকতাবিরোধী ও অসামাজিক কার্য করিবার পরে সামান্য মাত্র জরিমানা দিয়া সে তাহার কৌলিণ্য বা আভিজাত্য বজায় রাখিতে পারিত—ইহার ইঙ্গিত ব্রাহ্মণ সর্বস্বম গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।[২৬৫]

অপরদিকে সেকালের কোনো কোনো মেয়েরা অতিরিক্ত পরিমাণে যৌনবিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। একটি শ্লোকে কবি ধোয়ী বলিতেছেন :

সৌধ-শিখরে কৌতুকবশে প্রকৃতি মধুরা তরুণীদল
গৃহচূড়া-শোভি পুত্তলি পাশে লুকাইয়া রহে করিয়া ছল
পুত্তলির দেহে রঙ-রেখা গুলি এত সুন্দর চমৎকার
সহসা দেখিলে নারী কি পাষাণী বলে ওঠা হবে ভার।
গোপনে আসিয়া প্রিয় বল্লভ লীলাপদ্মের পরশে হায়
প্রিয়ার তনুতে তুলি' রোমাঞ্চ কোনরূপে তা'রে চিনিয়া পায়।[২৬৬]

যুবক সমাজও তাহাদের তুলনায় কম রসিক ছিল না। পবনদূতের এই ধরনের একটি শ্লোকে রেবানদী তীরবর্তী স্থানের উল্লেখ প্রসঙ্গে পাওয়া যায় :

নবজাত শুক শির্শুটির মত শ্যামল বরণ বেণুর বন
রচিয়াছে যেথা রেবা-নদীতীরে কুঞ্জের ঘন আস্তরণ,
সেথা গিয়া দেখো—যতেক বিহার রসিকা শবর-রমণী দল
জলকেলি শেষে সিক্ত করিয়াছে নিয়ত সে-সব বিতন তল।
এতই কামুক সেথাকার যুবা—এত তারা সবে মত্তকায়,
রসিকরা মিছে মান করে যদি ভাবিছে রতির অন্তরায়।[২৬৭]

অনেক সময় তরুণীদের অত্যধিক সাজগোজ যুবকদের মনকে দোলায়িত করিত। সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে ইহার প্রতিধ্বনি আছে :

> তাহাদের নিতম্বে পারিজাত পুষ্পের উজ্জ্বল শৃংখল, কর্ণে নূতন আম্রমুকুল, বক্ষে রক্তিম অশোক ফুল এবং চুলের মধ্যে মাধবী বকুলের হলুদ পুষ্পরেণু, তাহাদের সমস্ত দেহ রক্তিম করিয়াছে। আমাদের এই তরুণীদের এই পরিচ্ছদ ; ইহার আগমন আমাদের বলিষ্ঠ তরুণদের জন্য যেন আনন্দ আনয়ন করে।[২৬৮]

সাধারণত উৎসব, দেবযাত্রা, পুণ্যস্নানকালে সমাজের উচ্চস্তরে এই সুযোগ আসিত। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকের বর্ণনায় এইরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায় : "যাহাদের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছে এবং হৃদয়েরও বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে—এমন তরুণ-তরুণী সুরভবনে উপস্থিত হইয়া, দেবার্চনায় গৃহীত পুষ্পাঞ্জলি পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করে।"[২৬৯] তবে তাহারা বেশি মূল্যবান হিসাবে তখনই পরিগণিত হইত, যখন তাহারা উলু উলু ধ্বনি দিয়া প্রেম আহ্বান করিত। ইহাতেই অনেক সময় তরুণ যুকদের মন আন্দোলিত হইত।[২৭০]

আবার কুলযুবতীদের অতি বৈদগ্ধ ও চাপল্যও চরিত্রহীনতার কারণ হইত।[২৭১] তৎকালে পরকীয়া প্রেমও সমাজদেহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সামাজিক জীবনে

পরকীয়া চর্চা চিরদিনই নিন্দিত। তাই পরকীয়া প্রেমের স্রোতধারা ভিন্নরূপে এবং চিরগোপনই হয়। সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে ইহার অভিব্যক্তি বেশ দৃষ্টিকটু :

রাত্রিতে একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী যাহারা প্রত্যেকে অন্য প্রেমিককে আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেছে মিলনকুঞ্জে, পৃথক হইয়াছে অন্ধকারে—অজ্ঞাতসারে মিলিত হইয়াছে এবং পরম সুখ লাভের উদ্দেশ্যে দ্রবীভূত হৃদয়ে তাহারা উভয়ে যৌনমিলনে রত আছে। আমরা কি অনুমান করিতে পারি—তাহারা একে অন্যকে চিনিতে পারিবে?[২৭২]

তবে কবির কল্পনায় রঞ্জিত কামলীলার চিত্রাবলী সমাজের সাধারণ মানুষের নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন, কবির কল্পনা ও বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ এক না হওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক সময় অতি দারিদ্র্য গৃহবধূর চরিত্র নষ্টের কারণ হইত।[২৭৩] স্বীয় পত্নী সম্পর্কে অতি গৌরব প্রকাশও স্ত্রীর চরিত্র কলঙ্কিত করিত। স্বামীর অত্যধিক প্রশ্রয়েও স্ত্রীচরিত্রে ত্রুটি দেখা দিত।[২৭৪] অবশ্য সুশীলা স্ত্রী ঘরে লক্ষ্মী হিসাবে গণ্য হইত, অন্যদিকে চঞ্চল প্রকৃতির রমণীদের হয়ত নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ ছিল যদিও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামী ছিল স্ত্রীর একমাত্র অভিভাবক ও দেবতুল্য ব্যক্তি।[২৭৫]

সুতরাং এই যুগের স্মৃতি ও ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, লিপিমালা এবং ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ সবই সম্ভবত এইভাবে এইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিল। আর এই ধরনের ধর্মীয় সমর্থন নাগরিক জীবনের কামচর্যার কারণ হয়, তাই নাগরিক জীবনের এই কামচর্যা ধর্মীয় সমর্থনের প্রশ্রয় নিশ্চয় খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

সম্ভবত সমাজের বৃহত্তর অংশ গ্রামীণ জীবনে এই ধরনের দুরাচারের ততটা প্রসার হয় নাই। উহা সাধারণত নগর সমাজের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এইসব নগরাচার গ্রামের লোকেরা অপছন্দ করিতেন ; উপরন্তু এইদিকে পল্লী-পতিদের কড়া নজর থাকিত। তিনিই পল্লীর রক্ষক, তিনিই ছিলেন সকল দুরাচারের দণ্ডবিধানের অধিকারী। তাই উচ্ছৃঙ্খল পল্লীবালার তিনি দণ্ড দিতেন। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে সখি নায়িকাকে বলিতেছে :

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিল নাগরাচারম।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষে হপি দণ্ডয়তি।

হে সখি, সৎভাবে পা ফেলিয়া চল, যাবতীয় নাগরাচার (কটাক্ষ বিক্ষেপাদি চতুর্থ) পরিহার কর। কটাক্ষপাত করিলেই ডাকিনী ভাবিয়া পল্লীপতি এখানে দণ্ড বিধান করেন।[২৭৬]

অবশ্য গ্রামে যে নাগরাচার একেবারেই ছিল না তাহা নয়, কারণ এই ধরনের অপর একটি শ্লোকে মোড়লকন্যার চরিত্র সম্পর্কে গোবর্ধনাচার্য আবার বলিতেছেন, এখানে পল্লীপতির গৃহেই দুরাচার লক্ষণীয় :

যেদিন হইতে শন শ্রেণী (শন ক্ষেত) প্রস্ফুটিত কুসুমে বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইদিন হইতে পল্লীপতির পুত্রীরও পীতবসনের প্রতি প্রীতি দেখা দিয়াছে। (সঙ্কেতটি মোড়ল

কন্যার চরিত্রের প্রতি। শনফুলের বর্ণ পীত, অতএব পীতবসনে শনক্ষেত্রে অলক্ষে বিহার করা সম্ভব।)[২৭৭]

অবশ্য প্রাচীন বাংলার পল্লীজীবনের সরল স্বাভাবিক ও শান্ত জীবনাচার সমকালীন নগরজীবনের বিলাসিতা ও অসংযত আচরণের দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত হয় নাই। কবি শুভাঙ্কের একটি কবিতায় গ্রামীণ সমাজের সরল ও শান্ত জীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে :

বিষয়পতির লুব্ধ ধেনুভির্ধাম পুতং
কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরাবাহন্তি
শিথিলয়তি চ ভাযা নাতিথেয়ী সপর্য্যাস
ইতি সুকৃতিমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন।

বিষয়পতি (অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহপবিত্র ; নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হয় না, এইসব ফল দ্বারা ইহার পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হইয়াছে।[২৭৮]

তৎকালে এই পল্লীসমাজের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের ইঙ্গিত প্রাকৃত পৈঙ্গলেও পাওয়া যায় :

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিনি
সুদ্ধমণা হাকক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর
বরবর সগগগমণা।

পুত্র পবিত্র (অর্থাৎ সচ্চরিত্র), বহুত ধন, কুটুম্বিনী (অর্থাৎ গৃহিণী) ভক্তিমতী ও শুদ্ধাস্বভাব, হাঁকে ত্রস্ত ভৃত্যগণ- (এমন সংসারসুখ থাকিতে) কোন বর্বর স্বর্গে মন করে।[২৭৯]

কৌতুকরসে পূর্ণ অপর একটি কবিতাও বেশ উপভোগ্য :

সের একক জই পতনই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল নিত্তা
টঙ্ক একক জই সিন্ধুর পাআ
জো হউ রঙ্ক সে হউ রাআ।

এক সের ঘি যদি মিলিয়া যায়, তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকান হয় ; যদি এক টাকার সৈন্ধব (লবণ) পাওয়া যায় তবে হউক সে নিঃস্ব, তবুও সে রাজা।[২৮০]

অপরদিকে গ্রামীণ জীবনের একাংশে ছিল নিষ্করুণ দারিদ্র্য। তাহাদের দুঃখ-কষ্ট লাগিয়াই থাকিত। সমসাময়িক সাহিত্যের উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে, দরিদ্র ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিতেছেন যেভাবেই হউক তাহাদের গ্রীষ্মের মাসগুলি তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর বর্ষা আসিবে এবং তখন লাউ ও কদু উৎপাদন করিয়া রাজার মতো জীবন-যাপন করিবে।[২৮১] দরিদ্র শিশুরা প্রায়শ অন্যের বাড়ির দ্বারে দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরে যাহারা খাইতেছে তাহাদের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া থাকে।[২৮২] ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু কোটরাগত

এবং উদর বসিয়া গিয়াছে।[২৮৩] দরিদ্র লোকের স্ত্রী আগামীকাল তাহার সন্তানদের খাদ্য কিভাবে জোটাইবে এই চিন্তায় রাত্রে ক্লিষ্ট মনে অশ্রুপাত করিতেছে।[২৮৪] দরিদ্র ব্যক্তির গৃহের কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেওয়াল গলিতেছে, চালের খড় উড়িতেছে।[২৮৫] যখন জীর্ণ কুটিরে বৃষ্টি পড়ে, তখন দরিদ্র গৃহিণী ভাঙ্গা মাটির পাত্র দিয়া জল সিঞ্চন করেন এবং তৃণ শয্যা উপকরণ রক্ষা করেন। তাহার মস্তকের উপর একখানা ভাঙ্গা ঝুড়ি, দরিদ্র ব্যক্তির স্ত্রী সর্বত্র ব্যস্ত থাকেন।[২৮৬] সুভাষিতরত্নকোষের অপর একটি শ্লোকে আছে, পিতা ও পুত্র প্রত্যেকে একটি করিয়া শিং ধরিয়াছে, পিতামহ ও পিতামহী ধরিয়াছে পার্শ্বভাগ, মাতা লেজ এবং শিশুরা প্রত্যেকে পা ধরিয়াছে এবং পুত্রবধূ গলকম্বল ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিতেছেন। ভাগ্যাহত এই পরিবারের একমাত্র সম্বল এই ষাড় এবং এখন ইহা পতিত। তাই তাহারা সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইহাকে উত্থিত করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে।[২৮৭] অতি দরিদ্রতা হেতু সমাজজীবনে সম্ভবত গ্রামের অবস্থাপন্ন বাড়ির পালা-পার্বন, পূজা উৎসব এবং আদিম কোমগত নৃত্যগীত পূজাই দীন দরিদ্রদের আনন্দের একমাত্র স্থল ছিল।[২৮৮]

তৎকালীন সমাজে ভিক্ষাজীবী মানুষেরও আধিক্য ছিল। সম্ভবত ভিক্ষাজীবী ছিল দুই ধরনের—সন্ন্যাসী জাতীয় ভিক্ষুক ও অর্থপ্রার্থী ভিক্ষুক। সন্ন্যাসী ভিক্ষুকরা পরিত্যক্ত মন্দিরে বসবাস করিতেন এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন।[২৮৯] আর ভিক্ষুকেরা মানুষের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিত ; তাহাদের পরিধানে থাকিত জীর্ণ "জঘনাংশুক", তাহাদের দেহ এতই জরাকীর্ণ ছিল যে জঘনাংশুক বহনেও তাহারা সক্ষম ছিল না।[২৯০] পবনদূত কাব্যে ভিখারীর প্রাণ জরাগ্রস্ত হিসাবে উল্লেখিত আছে।[২৯১] এই শ্রেণীর ভিক্ষুক "নিকুঞ্জ পাত্র" হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করিত ; গৃহকর্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং তাহাদের ঐ পাত্রে বাসী অন্ন দিতেন। তৎকালীন গৃহিণীর ভিক্ষাদানের চিত্র হিসেবে এই শ্লোকটি বেশ লক্ষণীয় : "বধূ ভিক্ষুকের নিকুঞ্জ পাত্র নির্মিত ভিক্ষাপাত্রে অবজ্ঞাভরে অন্ন দিতেছেন। সেই অন্ন যদিও বাসী (পর্যূষিত) তথাপি বধুর তীব্রশ্বাসে তাহা ঈষদুষ্ণ।[২৯২] দরিদ্র গৃহিণীরা সুন্দরী হইয়াও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।[২৯৩]

অপরদিকে পল্লীপতির রক্ষণাবেক্ষণে পল্লীবাসীরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করিত। এমনকি ভিক্ষুকেরাও নিরুপদ্রবে পরিত্যক্ত মন্দিরে জীবন কাটাইত।[২৯৪] কিন্তু কোথাও কোথাও পল্লীপতির অত্যাচারে জনগণের জীবন পর্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। শোষণ, উৎপীড়ন, করাকর্ষণে ক্লিষ্ট গ্রামবাসী সেই কুগ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। ইহার ফলে গ্রামখানি জনবিরল হইয়া পড়িত। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকের পল্লীপতির নিষ্ঠুরতা, শোষণ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে : "প্রতিদিনের শোষণে ক্ষীণ অতিমাত্রায় করাকর্ষণে ক্লিষ্ট, জনবিরল কুগ্রামের মত করকৃষ্ট জীর্ণ বিরলতন্তু তোমার এই বসনাঞ্চল—এই সত্যই প্রচার করে যে, তোমার নিজ নায়ক বা পল্লীপতি অতি কৃপণ বা নিষ্ঠুর।"[২৯৫]

তাই দেখা যায় কোথাও কোথাও বিষয়পতি ছিলেন অতিশয় নিষ্ঠুর। তাহারা অন্যায়ভাবে গ্রামবাসীদের গ্রাম হইতে উচ্ছেদ করিতেন. কিন্তু কে চায় পূর্বপুরুষের ভিটা পরিত্যাগ করিতে? অনেক সময় তাহাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়াও কেহ কেহ গ্রামে থাকিয়া যাইত। সুভাষিতরত্নকোষের এই ধরনের একটি শ্লোকে বলা হইতেছে :

নিষ্ঠুর বিষয়াপতির অন্যায় উচ্ছেদে যখন গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছিল তখন কয়েকটি পরিবার পূর্বপুরুষের ভিটা আঁকড়াইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিল। তৃণবিহীন গ্রামগুলি যেখানে দেওয়ালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং নকুল গলিপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তথাপি তাহারা তাহাদের গভীরতম দুঃখ প্রদর্শন করিতেছে (সেই গ্রামের) একটি বাগানে যাহা ধুষর ঘুঘুর ডাকে পরিপূর্ণ।[২৯৬]

চর্যাগীতির বিভিন্ন গীতে তৎকালীন বাঙালি সমাজের অনেক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, কুক্কুরীপাদের একটি গীতে আছে :

অঙ্গণ ঘরপণ ঘুন ভো বি আতী।
কানেট চৌরি নিল অধবাতী।।
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅচ।।

অঙ্গন ঘরের নিকটেই, শোন হে অবধূতি, (কর্ণভূষণ) চোরে লইল অর্ধরাত্রে। শ্বশুর ঘুমাইয়া পড়িল, বহুড়ী আছে জাগিয়া, কানেট চোরে লইল কোথায় গিয়া তাহা মাগিব।[২৯৭]

এই পদগুলিতে সম্ভবত একটি বাস্তব প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘরের বউ রাত্রেও কর্ণভূষণ পরা অবস্থায় ঘুমাইয়া ছিল, কিন্তু মধ্যরাত্রে ঘুমের ভিতরে তাহা চুরি হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ শ্বশুর এখনও ঘুমাইয়া আছেন। বউয়ের কর্ণালংকার চুরি হওয়ায় বউ অত্যন্ত ভীত, কারণ তাহার অসাবধানতার জন্য ইহা হইয়াছে। এখন তাহার প্রধান ভাবনা কোথায় আবার পাওয়া যাইবে এই অলংকার? যেরূপ চোবের ভয় ও বিত্তনাশের মনস্তাপ, সেরূপ আবার শ্বশুব-শাশুড়ীর ভয়। তাই সারারাত্র বউ জাগিয়া আছে।

ইহার ঠিক পরের পংক্তিগুলি :

দিবসই বহুড়ী কাগভয়ে ভাঅ।
রাত্রি ভইলে কামরূ জাঅ।।[২৯৮]

দিবসে বহুড়ী কাকের ভয়ে চিৎকার করিয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিতে হয় নিরুদ্দেশ। এই সমস্তই বউয়ের চঞ্চল চারিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকে। তাহাছাড়া তৎকালীন সমাজে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল—ইহার আভাস পাওয়া যায়। তাই বোধ হয় বাসগৃহে দক্ষ প্রহরীর প্রয়োজন ছিল। পবনদূত কাব্যের একটি শ্লোকে রাত্রিতে ধনুহস্তে প্রহরীর দণ্ডায়মান থাকিবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[২৯৯] চর্যাগীতিতে এই ধরনের অপর একটি গীতে কৃষ্ণাচার্যপাদ বলিতেছেন :

সুণ বাহ তথাতা প্রহারী
মোহ ভাণ্ডার লইসঅলা অহারী।

শূন্য বাহুতে তথতা প্রহার করিয়া মোহ ভাণ্ডার সকলই ছিনাইয়া লইয়াছে।[৩০০]

তাই গৃহের দরজায় ভাল মজবুত তালা লাগাইবার ব্যবস্থাও ছিল। সরহপাদের চর্যায় "জই পবন-গমন দুআরে দিঢ় তালা বিদিজ্জই" প্রভৃতির ভিতরে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।[৩০১]

সেকালে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী একত্র বসিয়া খাওয়াও নিন্দনীয় এবং দেশাচারে অসিদ্ধ ছিল—একটি গীতে তাহা প্রমাণিত হয় :

"ঘর বই যজ্জই ঘরিণি ত্রহিজহি অবিচত"[৩০২]

বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষ ভাল যৌতুক পাইতেন। কৃষ্ণপদানাম বলিতেছেন :

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিঅ॥
ডোম্বি বিবাহি আ অহা রিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আনুতু ধাম॥

জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্নু ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিল। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে করিলাম অনুত্তর ধাম।[৩০৩]

এইসব তথ্য হইতে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সেই প্রাচীন কালেও বাংলাদেশে বিবাহে বরপক্ষ বেশ যৌতুক পাইত। ভাল যৌতুকের আশায় নীচকুল হইতে কন্যা গ্রহণেও আপত্তি থাকিত না। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জাত নষ্ট হইল, অর্থাৎ কুল গেল বটে, কিন্তু ভাল যৌতুক মিলিয়াছে তাহাতেই বর খুশি হইয়াছে।

শবরদের বিচিত্র জীবনযাত্রা এই চর্যাপদগুলিতে নানাভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। এই শবররা বাস করিত পাহাড়ের উচু চূড়ায়। এই সম্পর্কে কাহ্নপাদ বলিতেছেন :

"বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরে জহি কিঅ বাস"।

একটি গীতে শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনের একটি চমৎকার বর্ণনা শবরপাদ দিয়াছেন :

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মাকর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কন্নকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুণ নিরামণি কণ্ঠে লইঅ মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধণি অমণে বাণে।
একে সরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ॥

> উমত সবরো গরুআ রোসে।
> গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

উচা উচা পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা ; ময়ুরের পুচ্ছ পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত শবর, ওগো পাগল শবব, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল ; একেলা শবরী এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়--কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী। তিন ধাতুর খাট পড়িল শবর। মহাসুখে বিছাইল শয্যা ; শববভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী উভয়ে প্রেমের রাত্রি পোহায়। হৃদয় তামুল, মহাসুখে কর্পুর খায়, শূন্য নৈরামণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে লইল মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্য ধনু, নিজ মনরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণ বেঁধ। উন্মত্ত শবর গুরু রোষে, গিরিবরের শিখর সন্ধিতে করিতেছে প্রবেশ, শবর আবার ফিরিবে কি করিয়া?[৩০৪]

এখানে শবর-শববীদের বাস, তাহাদের প্রসাধন, অংলকাব, তাহাদেব নেশা, প্রেম, ইত্যাদিব অপূর্ব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শববপাদের অপর একটি গীতে শবর-শবরীর জীবনের ছবি অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট :

> গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁকুবাড়ী
> কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উওাড়ী॥
>
> .. . ..
>
> হেরি সেম্যের তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা
> সুকডএ সেবে কপাসু ফুটিলা॥
>
> .. ...
>
> কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা
> অনুদিন শবরো কিসিপ নচেবই মহাসুহে ভোলা॥
> চারিবাসে গড়িলাবে দিতনা চঞ্চালী
> তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ-শিআলী॥

গগনে গগনে লগ্নবাড়ি, হৃদয় ঠাকুর কুঠারে তাহাকে উপড়িয়া (ফেলিলে) কণ্ঠে নেরামণি শবরী বালিকা জাগে। ..আমার সে গগন সংলগ্ন বাড়ি আকাশের সমতুল দেখিতেছি, কি সুন্দর তাহাতে কাপাস ফুল ফুটিয়াছে।. . কাগনী পাকিয়া উঠিয়াছে- - তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে শবর-শবরী। অনুদিন শবর একটু জাগে না, মহাসুখে ভোর হইয়া আছে। চারিপাছে বাঁশের কঞ্চি দিয়া (বেড়া) গড়িল, তাহাতে তুলিয়া শবর সবদাহ করিল, শকুন শিয়াল সব কাঁদে।[৩০৫]

এই গীতে শবরীদের গৃহের চর্তুদিকে অপরূপ শোভাব এবং ফসল রক্ষা করিবার অপূর্ব কৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

চর্যাগীতেব মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশের বহু জাতির বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাদের ভিতব কৈবর্ত (মৎস্যজীবী), তাঁতী, ধুনুরী, ছুতার, প্রভৃতি উল্লেখ কবা যাইতে পারে। কৃষ্ণাপাদের একটি গীতে কৈবর্তদের উল্লেখ ও তাহাদের মাছ ধরিবার বাস্তব চিত্র রহিয়াছে :

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅসুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মণিআ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুয়াল।
বাহঅ কাঅ কহ্নিল মাআজাল।[৩০৬]

নৌকায় বসিয়া মাঝনদীতে একরকমের জাল ফেলিয়া ছোট বৈঠা বা দাঁড় বাহিয়া জেলেরা ভাসিয়া চলে, কখন কোথায় মাছ পড়িবে ঠিক নাই, ভাসিয়া চলিতে চলিতে জালে হঠাৎ মাছ পড়ে, জাল তুলিয়া মাছ ধরিতে হয় ; ইহাই মাছ ধরিবার "মায়াজাল"। তরঙ্গবহুল মাঝনদীতে তখনও এইরূপ মায়াজাল পাতিয়া মাছ ধরা হইত—তাহাই বোঝাইতেছে।

শান্তিপাদের একটি গীতে ধুনুরীর উল্লেখ আছে। চর্যাকার বলিতেছেন :

তুলা ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া
নিরায়ব শেষ করিলাম। ...তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া
শূন্যে গ্রহণ করিলাম, শূন্যকে লইয়া নিজেকেও
উৎপাটিত করিলাম।[৩০৭]

এই পদটিতে বস্ত্রবয়নের পদ্ধতিকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

দুই একটি গীতে ছুতারদের সম্পর্কে অস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে : "জো তরু ছেব ভবউন জানই"[৩০৮] অর্থাৎ যে গাছ ছেদন ও ভেদন কৌশল জানে না। উল্লেখ্য যে, এই গাছ কর্তনে দুই ধরনের কৌশল কৌশলীদেরই জানা ছিল। সাধারণের তাহা বুঝিবার কথা নয় ইহাই চর্যাগীতের এই পদে বুঝান হইয়াছে।

তৎকালীন সময়ে সাপের বেশ উপদ্রব ছিল। সাপের কামড়ে অনেকের প্রাণ যাইত। এইজন্য সমাজে ওঝাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। ইহারাই সাপুড়ে নামে পরিচিত। এই সাপুড়েরা সাধারণত খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। সাপ খেলাইবার একটি সুন্দর বর্ণনায় কবি উমাপতিধর বলিতেছেন :

ক্ষুদ্রাস্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায়
যেষামিদং ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদানন মিলন্মন্ত্রাণু-
বিদ্ধং রজঃ। জীর্ণ স্তেষ ফণী ন যস্য কিমপি
ত্বাদৃগ্ গুণীন্দ্রব্রজা কীর্ণক্ষ্মাতলধাবনাদপি ভজ্য-
ত্যানম্রভাবং শিরঃ॥

ভাই বিষবৈদ্য, তোমার মুখোচ্চারিত মন্ত্রপূত ধুলি যাহাদের মস্তক নত করে, সেই সাপগুলি ছোট। এই সাপটি বৃদ্ধ, যাহার মস্তক তোমার মত গুণিগণাধ্যুষিত পৃথিবীতে বিচরণ সত্ত্বেও এতটুকু নম্রভাব ধারণ করে না।[৩০৯]

সাপুড়ের সাপখেলা প্রসঙ্গে আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন :

নায়িকার বিস্ময় বিস্ফারিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সাপুড়েকে বিমুগ্ধ হইতে দেখিয়া সখীর উক্তি : সখি, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হওয়ায় তোমার নয়ন মধুর হইয়া উঠিয়াছে। তুমি অপরের

জীবন লইয়া বাজি খেলিতেছে কেন? দূরে সরিয়া যাও। সাপুড়ে নির্বিঘ্নে গৃহ চত্বরে সাপ খেলাক্।[৩১০]

উপর্যুক্ত তথ্যে বাংলাদেশের তৎকালীন নিম্নশ্রেণীর উল্লেখ বেশ চমকপ্রদ। বিভিন্ন উৎসে তাহাদের বাসস্থান, চরিত্র এবং জীবনযাত্রার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল লোক নিশ্চয় তৎকালীন বাঙালি জাতির একটি বৃহৎ অংশ ছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এই সকল আদিম জাতি সভ্য নাগরিক সমাজ হইতে অনেকটা পৃথক ছিল এবং ইহারাই যে সমাজের নিম্নতম স্তরভুক্ত ছিল ইহার যথেষ্ট প্রমাণও উপর্যুক্ত উৎসে মিলিয়াছে। অবশ্য সভ্য নাগরিক জীবন হইতে তাহারা একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল এই কথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ সভ্য সমাজের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় কর্ম অনেকটা তাহারাই সম্পন্ন করিত। তাহাদের সেবা দিয়াই সভ্য সমাজ আভিজাত্যসূচক ও পৃথক প্রকৃতির দৈনন্দিন জীবনধারা বজায় রাখিতে সক্ষম হইত। সুতরাং এই সমস্ত নিম্নস্তরভুক্ত মানুষ উচ্চস্তরের ভিত্তিভূমিকে মজবুত রাখিয়াছিল এবং উচ্চশ্রেণী আভিজাত্য অটুট ও দৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহাদেরকে কাজে লাগাইত।

ছ. নারী সমাজ

প্রাচীন বাংলার বিশেষত সেনযুগের বৃহত্তর নারী সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদের জীবনকালের তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ আবশ্যক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে। প্রথমত পিতৃগৃহে বাসের সময়কাল, দ্বিতীয়ত স্বামীগৃহে বাসের সময়কাল ও তৃতীয়ত সন্তানের গৃহে বাসের সময়কাল—এই তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়াই সাধারণত তাহাদের প্রায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইত। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, "পিতা প্রাণতুল্য দুহিতাকে সৎস্বামীর হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিত হন। স্বামী আপনার প্রিয়তমা ভার্যাকে পুত্রের হস্তে ন্যাস্ত করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। যে স্ত্রী যথাক্রমে পূর্বোক্ত বন্ধুত্রয় কর্তৃক প্রতিপালিত হয়—সেই সম্পূর্ণ ভাগ্যবতী।"[৩১১] শাস্ত্রে রহিয়াছে, "পিতাই যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্পাদন করিবেন, কন্যা বর প্রার্থনা করিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম"।[৩১২] কিন্তু অন্যত্র বলা হইয়াছে, বিবাহযোগ্যা হইবার তিন বৎসরের মধ্যে পিতা বা অভিভাবক কন্যা বিবাহের ব্যবস্থা না করিলে তাহারা স্বীয় বর্ণে নিজেদের পছন্দমাফিক স্বামী নির্বাচিত করিবে। ইহার জন্য কন্যা অথবা তাহার স্বামী পাপযুক্ত হইবেন না।[৩১৩] সম্ভবত বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে এই মত প্রদান করা হইয়াছে। তবে পিতৃগৃহে অধিক বয়স পর্যন্ত অবস্থান সম্পর্কে শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের উক্তি করা হইয়াছে। ভবদেব বলিতেছেন, সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরেও পিতৃগৃহে অবস্থান তাহাকে শূদ্রে পরিণত করিবে এবং পরবর্তীতে তাহাদের স্বামী ও পিতা হেয় প্রতিপন্ন হইবেন।[৩১৪] জীমূতবাহনের অভিমতেও ইহার প্রতিধ্বনি। প্রাপ্তবয়স্কা নারী অবিবাহিত থাকিলে তাহারা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হইত। ইহার কারণে অভিভাবকদেরকে পরবর্তী জীবনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[৩১৫] কন্যা বিবাহে পিতা জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিতেন; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পিতা কর্তৃক যৌতুক দানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[৩১৬] চর্যাগীতির একটি গীতেও বর কর্তৃক যৌতুক গ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩১৭]

সবর্ণে বিবাহই ছিল তৎকালীন সামাজিক আদর্শ। বিশেষত দশম–একাদশ–দ্বাদশ শতকের সাহিত্যে অসবর্ণ বিবাহের বিশেষ কোনো বিধান ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সবর্ণ বিবাহ উৎসাহিত করা হইয়াছে।[৩১৮] বল্লালচরিতে আট প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। যথা : ১. ব্রহ্ম ২. দৈব, ৩. আর্য, ৪. প্রাজাপাত্য, ৫. অসুর, ৬. গান্ধর্ব, ৭. রাক্ষস ও ৮. পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটি ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষত্রিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ করিতে পারে। অযাচিত কন্যাসহ যে বিবাহে কন্যার পিতা যথাশক্তি অলংকারাদিসহ কন্যাকে দান করেন, সেই বিবাহকে ব্রহ্ম বিবাহ বলে। যজ্ঞীয় পুরোহিতকে কন্যাদান করাকে দৈব বিবাহ এবং বরের নিকট হইতে গোমিথুন লইয়া তৎসহ কন্যা পাত্রস্থ করাকে আর্য বিবাহ বলে। যাচককে কন্যা দান করা প্রাজাপাত্য বিবাহ। যে বিবাহে কন্যার পিতা পণ গ্রহণ করে, তাহাকে অসুর বিবাহ বলে। স্ত্রী–পুরুষের সম্মতিমত বিবাহ গান্ধর্ব। যুদ্ধে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষস ও ছলে কন্যার পাণি গ্রহণ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। ক্ষত্রিয় এক স্ত্রী সত্ত্বেও আর দুই বিবাহ করিতে পাবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করিবেন না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্যা ও শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে সক্ষম। ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবেন না।[৩১৯] স্মৃতিশাস্ত্রকার জীমূতবাহনের রচনায় তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করাই আইনসম্মত, অবশ্য অপারগতায় ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে ; একজন ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যাকে অপারগতায় বৈশ্যকন্যা গ্রহণ করিবে, বৈশ্য শুধুমাত্র বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে।[৩২০] কিন্তু এই নিয়ম সমাজে কতটুকু প্রতিপালিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও তৎকালীন সাহিত্যে উল্লেখিত হইয়াছে। সম্প্রতি রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি চর্যাগানে ইহার উল্লেখ বেশ চমৎকার : বিনয়শ্রী বলিতেছেন :

মেহলি চণ্ডালী ঘরারি ব্রাহ্মণ
জগ বিটালন্তি তে দুই লাম্বন।
হল সহি কামথিঃ অচাভুঅ দিট্ঠা
ব্রাহ্মণ মনুস চণ্ডালি এঁ তুট্ঠা।
অইসি নিরাজ কমাল ণ দিশই
মাউগ চণ্ডালী ব্রাহ্মণে পইসই।
দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার।
পাঞ্চ বান্ন ভইল্ল একাকার।
তে দুই নাসন্তি সম-সাঁজ্যেএ
ভণই বিনয়শ্রী সদগুরু বোহেঁ।।

অর্ধাঙ্গিনী চণ্ডালী গৃহপতি ব্রাহ্মণ। তাহারা দুইজন পরস্পরের অবলম্বন করিয়া জগৎ অপবিত্র করিতেছে। বামুন মানুষ চণ্ডাল নারীতে প্রীত—কি অদ্ভুত ব্যাপার! এমন অনিয়ম চোখে পড়ে না, বামুনে চণ্ডালী মার্গ প্রবেশ করিতেছে। অন্যে দেখুক চণ্ডাল

নারীর ব্রাহ্মণ উপপতি। পঞ্চবর্ণে যে হইল একাকার। সমতাপ্রাপ্ত হইলে তাহাব নাশ পায়। সদগুরুর উপদেশ পাইয়া বিনয়শ্রী ইহা বলিতেছে।[৩২১]

তাহাছাড়া চর্যাগানের অন্যত্রও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।[৩২২] এই কারণে সম্ভবত বৃহস্পতি–মিশ্র তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নতর বর্ণে স্ত্রী গ্রহণের বিধান প্রদান করিয়াছেন।[৩২৩]

স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজে একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করাই ছিল সাধারণ নিয়ম। সাধারণ মানুষ তাহাই করিতেন। বহুপত্নী গ্রহণও সমাজে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত রাজরাজড়া, সামন্তবর্গ, অভিজাত ও বিত্তবানরাই বহুপত্নী গ্রহণ করিতেন। অবশ্য এক স্ত্রী যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। জীমূতবাহন বলিতেছেন, যদি কোনো স্বামী তাহার স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন তাহা হইলে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি লইয়াই তাহা করিতে হইবে, তজ্জন্য তাহাকে ভাল না বাসিলেও প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত স্ত্রীধন ও পিতৃধন (বিবাহ উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে) স্ত্রীকে স্বামী দিতে বাধ্য। সমাজ স্বামীকে স্ত্রীধন ও পিতৃধন দিতে বাধ্য করিবে। গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসগৃহ না থাকিলে স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবে এবং স্বামীব মৃত্যুর পর সাধারণ ধনাধিকারী দেবরাদির নিকট হইতেও স্বীয় পতির অংশের ভাগ পাইবে।[৩২৪] অন্যত্রও আবার বলিতেছেন, স্বামী স্ত্রীর ধন গ্রহণপূর্বক যদি তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রীর সহিত বসবাস করিতে থাকেন এবং তাহাকে (প্রথম স্ত্রী) অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রদত্ত ধন গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং স্বামী যদি গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান না করে তাহা হইলে স্ত্রী তাহাও বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিবে।[৩২৫] সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান অনুমোদিত ছিল না।[৩২৬] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, হিন্দু বিবাহ অগ্নি সাক্ষী করিয়াই হইয়া থাকে। তাই এই বিবাহ অটুট থাকাই স্বাভাবিক। তবে শাস্ত্রে আরও উল্লেখ আছে, "যিনি যথাবিধি বিবাহিতা যজ্ঞ পত্নী অর্থাৎ যাঁহাকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধি বিবাহ করা হয়, তিনিই সতী, পুণ্যবতী, নিরন্তর নিশ্চলা অনুরাগবতী সর্বদা সঙ্গিনী লোকের সাধ্যা হইয়া থাকেন। গুপ্তপত্নী অর্থাৎ গান্ধর্বাদি বিবাহ বিবাহিতা পত্নী নিশ্চলা হইয়া ভয় ও প্রীতি দানে সামর্থ্য হইয়া থাকেন ; কিন্তু নৈমিত্তিক পত্নী, অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে পত্নী সে কখনও নিত্য অর্থাৎ আজন্ম সঙ্গিনী হইতে পারে না।"[৩২৭] তবে যথাবিধি বিবাহিতা যজ্ঞ পত্নীর সহিত স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমোদিত বিধান ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনুর অভিমত কিরূপ ছিল তাহা দেখা যাইতে পারে। মনুর উক্তি উদ্ধৃতপূর্বক বাঙালি স্মৃতিকার কুল্লুক বলিতেছেন, বিবাহবিচ্ছেদ কোনক্রমে অনুমোদিত হইবে না, স্ত্রীকে স্বামী যাহাতে পরিত্যাগ না করেন ইহার জন্য স্ত্রী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাহাদের দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্য যত্নবান হইবেন।[৩২৮]

প্রাচীনকালে বাংলার মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাৎস্যায়ন তাহাদেরকে মৃদুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩২৯] আর্যাসপ্তশতীতে উল্লেখ আছে,

"তিনি আদর্শ বধূ, যিনি শয়নকালে প্রভু, প্রেমতন্ত্রে গুরু, শ্রমকালে দাসী, গৃহে লক্ষ্মী, গুরুজনের সম্মুখে মূর্তিরূপ লজ্জা"।[৩৩০] এই প্রসঙ্গে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করিবার মত : "...স্ত্রীলোক কখনই স্বাধীন হইবে না ; লজ্জাশীলা, স্মিতভাষিণী, আলস্যহীনা, শান্ত-প্রকৃতি, পরিমিতবাদিনী ও লোভশূন্য হইবে। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ, উপবাস বা ব্রত বিহিত নহে ; পতিসেবাই পরম ধর্ম ও স্বর্গফলদায়ক। ভর্ত্তা মৃত হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্যে থাকে ; পুত্র সন্তানের অসম্ভাবেও ব্রহ্মচারীর ন্যায়, তাঁহার স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। যে স্ত্রী সন্তান লোভের পতিকে অতিক্রম করে ; সে ইহলোকে নিন্দাস্পদ হইয়া দেহান্তে পতিলোকচ্যুত হয়। নারীগণের একমাত্র পতিই গতি ; অতএব পতি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না।"[৩৩১] সুতরাং স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী হওয়াই তাহাদের কামনা বাসনা হইবে। তাহা ছাড়া গুণী পুত্রের মাতা হিসাবেও সমাজ ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চরম বাসনা তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিত। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন ইহার ইঙ্গিত বহন করে। ইহাতে বিজয়সেনের স্ত্রী বিলাসদেবীকে লক্ষ্মী এবং গৌরীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে[৩৩২] এবং তিনি যে বীর ও গুণী পুত্র বল্লালসেনের জন্মদাত্রী একথাও উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩৩৩] ইহা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, গুণী পুত্রের জননী হিসাবে স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর সংসারে নিশ্চয় বৃদ্ধি করিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাতার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথার উপমা আছে। এখানে পিতা অপেক্ষা মাতার সম্মান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গর্ভে ধারণ ও পোষণ করার জন্য পিতা অপেক্ষা মাতাই পুত্রের অধিক গুরু। ইহাতে বলা হইয়াছে, "গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, শিবের ন্যায় আর গুরু নাই। ...পুত্র এককালে পিতাকে ও মাতাকে দেখিতে পাইলে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দোষা, সর্বাদুঃখহা, পরমারাধ্যা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া এবং দুঃখহন্ত্রী—মাতার এই বিংশতি নাম। এই একবিংশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে মানুষ সর্বদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে।"[৩৩৪] সম্ভবত এইসব কারণেই শাস্ত্রীয় উক্তিতে মাতার সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমাজ ও সংসারে তাহাদের অধিকার দৃঢ় হইয়াছে। অনেক সময় স্বামীর সংসারে স্ত্রীর প্রাধান্য এমনই হইত যে, তিনি বহুক্ষেত্রে স্বামীকে নিয়ন্ত্রণও করিতেন। এই ক্ষেত্রে বলা যায়, স্ত্রী স্বামীর পথচলার দিকনির্দেশক হইতেন এবং তাহার সঙ্কোচে স্বামী অনেক অসৎ কার্য হইতেও বিরত থাকিতেন।[৩৩৫]

সকল বর্ণের স্ত্রীদের প্রাত্যহিক দায়িত্বের ভিতর ছিল স্বামী সন্তানের পরিচর্যা, রান্না-বান্না, ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া ও অতিথিদের আপ্যায়ন করা। মাতা হিসাবে সন্তান প্রতিপালন প্রধান দায়িত্ব ছিল। সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোকে উমা ও তাহার শিশুপুত্র গণেশের মধ্যে কথোপকথন বেশ চমৎকার :

> "মাতা—" "প্রিয়—"
> পিতার হস্তে কি লুক্কায়িত আছে?
> "একটি সুমিষ্ট ফল, বৎস।" এবং তিনি

উহা আমাকে দিবেন না? "হ্যাঁ, তুমি
নিজে যাও এবং ইহা গ্রহণ কর... ।"[৩৩৬]

একটি মূর্তিতেও আমরা একজন মাতার সহিত শিশু ক্রীড়ারত দেখিতে পাই।[৩৩৭]

পারিবারিক জীবনে গৃহকর্ত্রী স্বামীর আত্মীয় পরিজনসহ বসবাস করিতেন। সেখানে শ্বশুর শাশুড়ীর মত গুরুজনও থাকিত। সাধারণত গৃহকর্ত্রী শাশুড়ীকে খুব বেশি পছন্দ করিতেন না।[৩৩৮] যৌথ পরিবারে দেবররাও বাস করিতেন। অনেক সময় দেবরদের সঙ্গে গৃহকর্ত্রী হাসি-তামাসায় রত হইতেন। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে ইহার বর্ণনা আছে : "শস্যপুঞ্জ বিদলিত দেখিয়া কুপিতে গৃহপতি বলদকে তাড়না করিতে থাকিলে হলিক বধূ ও দেবর নিভৃতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া হাসিতে লাগিল।"[৩৩৯] গৃহপার্শ্বে থাকিত প্রতিবেশীর গৃহ। অনেক সময় গৃহিণী প্রতিবেশীর নিকট নিজের দুঃখ প্রকাশ করিতেন।[৩৪০] সাধারণত শুদ্ধ দাম্পত্যলীলায় গৃহ পবিত্র হইয়া উঠিত। গৃহিণী সেবা, বিনয়, সহনশীলতার আধার হইতেন এবং গৃহপতি ছিলেন তাহার রক্ষক। আর্যাসপ্তশতীতে এই দাম্পত্য জীবনের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে : "যেখানে অকারণে অপরাধ, অকারণে কলহ-রোষ-পরিতোষ, যেখানে জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ সমসূত্রে গাথা-তাহাই দাম্পত্য, আর সেই দাম্পত্যেরই জয় হউক।"[৩৪১] আবার সম্পন্ন গৃহের মহিলারা দাসী রাখিতেন[৩৪২] এবং প্রেমের বিস্তারিকা হিসাবে সখী বা সহচরী থাকিত।[৩৪৩] তবে বিত্তবানরা দাস-দাসী রাখিতে সক্ষম হইলেও দরিদ্র পরিবারের স্ত্রীরা সংসারের যাবতীয় কার্যই করিতেন। এই সমস্ত দরিদ্র পরিবারের স্ত্রীরা স্বামীর জীবিকা অর্জনেও সাহায্য করিত।[৩৪৪] জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থে আছে : প্রয়োজনের তাগিদে নারীগণ সুতা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পকার্যে স্বামীদের অর্থ উপার্জনে সহায়তা করিত।[৩৪৫] আর্যাসপ্তশতীতে নারীদের রজকিনীর কাজ করিবার উল্লেখ রহিয়াছে।[৩৪৬] তাহা ছাড়া নিম্নশ্রেণীর ডোম্বীনিদের পাটনীর কাজ[৩৪৭] এবং মদ বিক্রয়[৩৪৮] করিয়া জীবিকা অর্জনের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। তবে বৃদ্ধ বয়স মহিলাদের জন্য খুবই দুর্ভোগের ছিল। এই বয়সে তাহারা সাধারণত ঘরের বাহির হইতেন না। দিবা বা রাত্রিতে ঘরের ভিতরেই তাহাদের অতিবাহিত হইত।[৩৪৯]

অনেক সময়ই গৃহিণীর রান্নাবান্না করিতে হইত। প্রাকৃতপৈঙ্গলে গৃহিণীর স্বামীর জন্য খাদ্য প্রস্তুতের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৩৫০] অতিথি আপ্যায়নেও তাহারা পারদর্শিতা দেখাইতেন[৩৫১] এবং ভিখারীদের ভিক্ষা দিতেন। আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে বধূ কর্তৃক ভিক্ষুককে নিকুঞ্জ পাত্র নির্মিত ভিক্ষাপাত্রে অন্নদানের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।[৩৫২]

অল্প বয়সে বিবাহিতা মেয়েরা খুব কমই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইত। অবশ্য এই দিক হইতে শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। পবনদূত কাব্যে বিজয়পুরের মেয়েদের তালপাতায় প্রেমপত্র রচনার উল্লেখ হইতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩৫৩] সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে গ্রামের সাধারণ মেয়েদের গান রচনার উল্লেখ আছে।[৩৫৪] তৎকালীন মেয়েরা নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করিত। ইহার মধ্যে নৃত্যগীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত সমাজের উচ্চস্তরের মহিলারাও নাচগানের চর্চা করিত।

এই সম্পর্কে জয়দেবপত্নী পদ্মাবতীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন উঁচুদরের গায়িকা ও নর্তকী ছিলেন। সেকশুভোদয়া গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনের সভায় পদ্মাবতী একজন বড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইহাতে আরও উল্লেখ আছে যে, জয়দেব তাহার গীতগোবিন্দের গান করিতেন এবং সেই গানের রাগ-তাল ধরিয়া পদ্মাবতী নাচিতেন।[৩৫৫]

তখনকার দিনেও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের ভিতর পর্দা ও ঘোমটার ব্যবহার ছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, বল্লালসেন পালকিতে বহন করিয়া তাহার শত্রু রাজলক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন।[৩৫৬] ইহা হইতে এই অনুমান সম্ভব যে, অভিজাত পরিবারের মেয়েরা বাহিরে চলাচল কালে নিজেদেরকে আড়াল করিয়া চলিতেন। কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদেরকে স্বামীর জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করিতে হইত। এইজন্য তাহারা পুরুষের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের কাজে অংশগ্রহণ করিত। ফলে তাহাদের অবগুণ্ঠিত জীবন যাপনের কোনো সুযোগ ছিল না। তাহারা সাধারণত হাটে-বাজারে যাইতেও ইতস্তত করিতেন না। ইহার একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা কবি শরণের কবিতায় ধরা পড়িয়াছে :

> এতাস্তা দিবসান্তভাস্কব দৃশ্যোধাবন্তি পৌরাঙ্গনা
> স্কন্ধ প্রস্থলদংশুকাঞ্চল ধৃতি ব্যাসঙ্গবদ্ধদরাঃ।
> প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
> হট্টক্রয্য পদার্থমূল্যকলন ব্যগ্রাঙ্গলিগ্রন্থয়ঃ॥

এই পুরনারীগণ অস্তায়মান তপন দর্শন করিয়া ধাবিত হইতেছেন ; তাঁহাদের স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল ধারণে তাঁহারা ব্যগ্র, প্রভাতে বহির্গত কৃষকগণের আগমনের ভয়ে তাহারা অবগাহন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, হাটে ক্রয়যোগ্য বস্তুর মূল্য হিসাব করিতে তাঁহাদের আঙ্গুলি গ্রন্থিগুলি ব্যস্ত।[৩৫৭]

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের ভিতর পর্দা বা ঘোমটার প্রচলন ছিল, সম্ভবত ইহাতে তাহাদের আভিজাত্যই প্রকাশিত হইত। আর সমাজের অন্য অংশের চিত্র ছিল ভিন্নরূপ--দরিদ্র অসহায় শ্রেণীর নারীদের স্বামী-সংসার ইত্যাদির সকল কাজে সহায়তা করিতে হইত। তাই তাহাদের ভিতর ঘোমটা বা পর্দার কোনো বালাই ছিল না বা ইহার কোনো প্রয়োজনও তাহারা অনুভব করিত না।

প্রাচীন বাংলাদেশে অবিবাহিতা কন্যা ও স্ত্রী ব্যতীত নারীদের সম্পত্তিগত কোনো সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রকার জীমূতবাহন[৩৫৮] ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর অবর্তমানে তাহার সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি এই বিধানও দিয়াছেন যে, যদি বিধবা যথার্থই বৈধব্য জীবন প্রতিপালন করেন তবেই তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারী থাকিবেন। কিন্তু সম্পত্তি দান, বন্ধক ও বিক্রয়ে তাহার কোনো অধিকার থাকিবে না। শুধু তাহার ভরণ-পোষণের জন্য ইহা সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহাকে প্রসাধন-অলংকার-বিলাসবিহীন অনাড়ম্বর জীবন অবলম্বন করিতে হইবে। স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সহিত বসবাস করিতে

হইবে এবং পরলোকগত স্বামীর আত্মার পারলৌকিক কল্যাণার্থে সকল প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠান প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু স্বামীগৃহে যদি কোনো পুরুষ অভিভাবক না থাকেন তবেই তিনি পিতৃগৃহে বসবাস করিতে পারিবেন।[৩৫৯] জীমূতবাহন আবার বলিতেছেন যে, মাতার সম্মত্তি ছাড়া পুত্ররা পৈতৃক সম্পত্তি ভাগবাটওয়ারা করিতে পারিবেন না।[৩৬০] এবং তিনি তাহাদের মতই সমান ভাগ পাইবেন।[৩৬১] তাহা ছাড়া সন্তানহীন বিমাতাও সম অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।[৩৬২] কিন্তু বিধবা কন্যা পিতার সম্প্ত্তির অধিকার হইতে বাহিরে থাকিবে। অবশ্য সবর্ণে বিবাহিত কন্যা পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করিতেও পারিবেন।[৩৬৩]

বৈধব্য জীবন নারী জীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া গণ্য হইত। ইহার ফলে তাহারা সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইত। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমন্তের সিঁদূর ঘুচিয়া যাইত।[৩৬৪] বৃহদ্ধম্মপুরাণে বিধবা রমণীদের সকল প্রকার উত্তেজক জিনিস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।[৩৬৫] এবং যৌবন, বিবিধ বেশভূষা, উত্তম কেশাদি রাখা এবং শরীর শোভাবর্ধন বিধবাদের পক্ষে উত্তম নয় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।[৩৬৬] অপরদিকে ভট্টভবদেবও বিধবাদের সংযম প্রদর্শন এবং সকল প্রকার পারিপাট্য পরিহার এবং মাছ ও মাংস ইত্যাদি পরিহার করিবার কথা বলিয়াছেন।[৩৬৭] তৎকালে সহমরণ ও অনুমরণ—উভয় প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে আত্মবলিদান করাকে সহমরণ এবং স্বামীর পরবর্তীতে আত্মবলি করিয়া নির্বাণ লাভ করাকে অনুমরণ বলা হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ স্ত্রীদের সহমরণ এবং অপরাপর বর্ণের স্ত্রীদের উভয় প্রথা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[৩৬৮] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও ইহাকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। ইহাতে আর বলা হইয়াছে যে, "যে স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবে তিনি স্বামীকে গুরুতর পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। এইজন্য নারীর পক্ষে ইহার চাইতে সম্মানের কাজ আর নাই। এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া স্বামীর সহিত স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিবে। স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তীতেও যে বিধবা আত্মাহুতি প্রদান করিবেন তিনিও পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন।[৩৬৯] ইহা হইতে আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে, স্মৃতিশাস্ত্রে তৎকালীন বাংলাদেশে সহমরণ ও অনুমরণ উভয় প্রথাকেই উৎসাহিত করা হইয়াছে। তবুও তৎকালীন বাংলাদেশে এইসব প্রথার প্রচলন ছিল না।[৩৭০]

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারদেরকে বৈধব্য জীবন অবলম্বনের বিষয় বর্ণনা হইতে তাহা অনুমান করা সম্ভব। এই সম্পর্কে শাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন, বিধবা স্ত্রী পরিপূর্ণ শাস্ত্রসম্মতভাবে বৈধব্য জীবন অবলম্বন করিবেন এবং সতীসাধ্বী স্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করিবেন।[৩৭১] অপরদিকে শাস্ত্রকার কুল্লকের অভিমতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[৩৭২] সুতরাং বলা সম্ভব যে, প্রাচীন বাংলাদেশে বিধবা রমণীদের সহমরণ ও অনুমরণ উভয় প্রথা অবলম্বনে উৎসাহিত করা হইলেও তাহাদের বৈধব্য জীবন প্রতিপালনে সামাজিক কোনো অসুবিধা ছিল না।

সেকালে নারীদের বিশেষ কোনো স্বাধীন সত্তা সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তাহাদেরকে পুরুষের করুণা, বিবেচনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতে হইত। শাস্ত্র তাহাদের

আচার-আচরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান করিয়া তাহাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করিয়াছিল। এই সম্পর্কে মনুর উক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে :

> স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে, পুত্র না থাকিলে স্বামীর স্বপিণ্ড, স্বামীর স্বপিণ্ড না থাকিলে পিতৃ স্বপিণ্ড, ও পিতৃ স্বপিণ্ড না থাকিলে রাজার বশে থাকিবেক, স্ত্রীলোক কখনো স্বাধীনতা লাভ করিবেক না।[৩৭৩]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সেকালে নারীসমাজের স্বাধীন সত্তা ছিল না। তাহাদের জীবনের তিন পর্যায় যথাক্রমে পিতা, স্বামী ও সন্তানগৃহে অতিবাহিত হইত। তাহাদের সম্পত্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইলেও কোনো প্রকার হস্তান্তরে পুরুষ অভিভাবকদের সম্মতির প্রয়োজন হইত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুরুষ অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করিত এবং তাহাদের পুরুষের করুণার উপর নির্ভর করিতে হইত। অবশ্য পুরুষ সন্তানের জননী হিসাবে সমাজ ও সংসারে তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

তথ্যনির্দেশ

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ৪৪১।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩ এন. জি. মজুমদার, ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৯), পৃ. ৮৫, ৮৮, ৯৪, ১০১ ; উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ২৮।

৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১০, পৃ. ৮৯-৯০।

৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৪, পৃ. ১২৯।

৬. বিদ্যাকর "সুভাষিতরত্নকোষ" ডানিয়েল এইচ. এইচ. এ্যাঙ্গেলাস (অনূদিত), হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, নং ৪৪, শ্লোক নং ২২৬, পৃ. ১২৯।

৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৮২, পৃ. ১৩৯।

৮. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৮৫, পৃ. ১৪০।

৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৯১, পৃ. ১৪১।

১০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৯৭, পৃ. ১৪৩।

১১. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩০০, পৃ. ১৪৩।

১২. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩১৪, পৃ. ১৪৭।

১৩. শ্রীধরদাস, "সদুক্তিকর্ণামৃত" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), ২/৮৪/৩, শ্লোক নং ৮৯৩, পৃ. ২৩৮।

১৪. প্রাগুক্ত, ২/১৭৬/৩, শ্লোক নং ১৩৫৩, পৃ. ৩৬৩।

১৫. প্রাগুক্ত, ২/১৭৬/১, শ্লোক নং ১৩৫১, পৃ. ৩৬৩।

১৬. প্রাগুক্ত, ২/১৭৩/৩, শ্লোক নং ১৩৩৮, পৃ. ৩৫৮।

১৭. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, (কলিকাতা : সান্যাল এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৩৭৮), শ্লোক নং ১০১, পৃ. ১৬৮।

১৮. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৯২, পৃ. ১৮৯।

১৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৫৮, পৃ. ১৫৯।

২০. বল্লালসেন, দানসাগর, শ্যামাচরণ কবিরত্ন (সম্পাদিত), (কলিকাতা : সাহিত্যসভা, ১৮৩৯), শ্লোক নং ৪৩৩, পৃ. ১১৭।

২১. নীলরতন সেন (সম্পাদিত), চর্যাগীতিকোষ (কলিকাতা : দীপালী সেন, ১৩.৪), গীত নং ৩৩, পৃ ১৪৪।

২২. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৩২০, পৃ. ৩১৬ ; সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৪৬/২, শ্লোক নং ২২২৭, পৃ ৬০৫।

২৩. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৪৯/১, শ্লোক নং ২২৪১, পৃ. ৬০৮–৬০৯।

২৪. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৩১১, পৃ. ৩৬০।

২৫. তপোনাথ চক্রবর্তী, ফুড অ্যাণ্ড ড্রিংক ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল, (কলিকাতা : দি অথর, ১৯৫৯), পৃ. ১২।

২৬. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৫৬/৫

২৭. প্রাগুক্ত, ২/১৭৬/৩, শ্লোক নং ১৩৫৩, পৃ. ৩৬৩।

২৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৪৪।

২৯. দানসাগর, শ্লোক নং ৪৩৩, পৃ ১১৭।

৩০. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, প্রথম নবভারত সং, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬), উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৪।

৩১. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১১৭৩, পৃ. ৩৩৩।

৩২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ৩৮।

৩৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৫৩৬।

৩৪. বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২৯২।

৩৫. অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, ১৩৭৬), পৃ. ১৩২।

৩৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

৩৭. পিঙ্গলাচার্য, প্রাকৃত পৈঙ্গল, চন্দ্রমোহন ঘোষ (সম্পাদিত), (কলিকাতা : বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ১৯০২), পৃ. ৪০৩ ; উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৩৮. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতি কোষ, গীত নং ১৩, পৃ. ১৩৫।

৩৯. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১, পৃ. ৬৪।

৪০. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ৯/১১/৪

৪১. প্রাগুক্ত, ১/৭৩/১

৪২. জীমূতবাহন, কালবিবেক, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সম্পাদিত), (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৫), পৃ. ৩৭৯।

৪৩. ভট্টভবদেব, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭), পৃ. ৬৭।

৪৪. আর. সি. মজুমদার (সম্পা.), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, (ঢাকা : ইউনিভারসিটি অফ ঢাকা, ১৯৪৩), পৃ. ৬১২।

৪৫. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৬৭–৬৮।
৪৬. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৬।
৪৭. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৬৬।
৪৮. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২৯২।
৪৯. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৬, পৃ. ১৩১।
৫০ সুকুমার সেন, চর্যাগীতি–পদাবলী (চর্যাচর্যটীকা সমেত), তৃতীয় সংস্করণ, (কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৩), গীত নং ২৩, পৃ. ১৭৬–৭৭।
৫১. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রথম নবভারত সং, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১), শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়, পৃ. ৫৪৫।
৫২. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৬।
৫৩. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৬৬–৬৭।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯–৬৬।
৫৫. আর. সি. মজুমদার (সম্পা.), হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ. ৬১২।
৫৬. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ৬৬, ১৩৮।
৫৭. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/৫৩/৫।
৫৮. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৬৬।
৫৯. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৪।
৬০. ধোয়ী, পবনদূত, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (অনূদিত), নতুন সংস্করণ (কলিকাতা : এইচ চ্যাটার্জি এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৭), শ্লোক নং ৮, ২৫, পৃ. ২, ৮।
৬১. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ৬৬, ৯৫, ১০৪, ১১৫, ১৩০।
৬২. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ২৮২, পৃ ১৩০।
৬৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৯২, পৃ. ১৪১।
৬৪. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৮৪/৩, পৃ. ২৩৮।
৬৫. প্রাগুক্ত, ২/১৭৭/২, শ্লোক নং ১৩৫৭, পৃ. ৩৬৪।
৬৬. প্রাগুক্ত, ২/১৭৬/৩, শ্লোক নং ১৩৫৩, পৃ. ৩৬৩।
৬৭. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৬৮, পৃ. ১৮৪।
৬৮. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৪০–৪২।
৬৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৪৮।
৭০. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১২৭, পৃ. ১০৩।
৭১. সদুক্তিকর্ণামৃত, ১/৫৪/৫ ও ২/১২৩/১, ৫/১/২।
৭২. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৩, পৃ. ১৩০।
৭৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৪৮।
৭৪. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪২৫, পৃ. ২৪১।
৭৫. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৩৭।
৭৬. প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম পৃ. ৬৬–৬৭।
৭৭. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রাগুক্ত এবং দ্বাত্রিংশদাধিকশততম অধ্যায়, পৃ. ৬৪৫।
৭৮. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৫০৯, পৃ. ২৬০।
৭৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, প্লেট নং ৫৬, ফিগার নং ১৪০ এবং প্লেট নং ৫৭, ফিগার নং ১৪২।

৮০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫৮–৪৫৯।

৮১. এস. হোসেন, দি সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডীএভ্‌ল্ বেঙ্গল, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৮৫), প্লেট নং ৬, ৭।

৮২. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, প্লেট নং ৫৬, ফিগার নং ১৪০, প্লেট নং ৫৭, ফিগার নং ১৪২, প্লেট নং ৫৮, ফিগার নং ১৪৪।

৮৩. এস, হোসেন, প্রাগুক্ত, প্লেট নং ৭, ফিগার নং ২, ৩, প্লেট নং ৯. ফিগার নং ১।

৮৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫৯।

৮৫. এস. হোসেন, প্রাগুক্ত, প্লেট নং ৫, ফিগার নং ২ ; প্লেট নং ৩, ফিগার নং ২ ; প্লেট নং ৭, ফিগার নং ৪ ; প্লেট নং ৯, ফিগার নং ২ ; প্লেট নং ১০, ফিগার নং ২।

৮৬. পবনদূত, শ্লোক নং ৩৩, পৃ. ১২।

৮৭. ঐ ; সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৩৭/৩, পৃ. ১৫৭।

৮৮. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৩০/১, পৃ. ১৫২।

৮৯. প্রাগুক্ত, ১/৪৮/১, পৃ ২৬।

৯০. প্রাগুক্ত, ২/১৩০/১, পৃ. ১৫২ ; আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৮৮, পৃ. ১৬৫।

৯১. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতি কোষ, গীত নং ২৪, পৃ. ১৪০।

৯২. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ২/৬২/৩ ও ৪, পৃ. ১১০।

৯৩. এস, হোসেন, প্রাগুক্ত, প্লেট নং ৩, ফিগার নং ২ ; প্লেট নং ৬, ফিগার নং ২ ; প্লেট নং ৭, ফিগার নং ২।

৯৪ প্রাগুক্ত, প্লেট নং ৫, ফিগার নং ২, ৩, ৪।

৯৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, চতুর্থ সংস্করণ. (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, ১৩৭২), প্রথম সর্গঃ শ্লোক নং ৪৪, পৃ ২৯।

৯৬. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৮, পৃ. ১৫৭–১৫৮।

৯৭ জীমূতবাহন. দায়ভাগ, এইচ. টি. কোলব্রুক (অনূ.), (কলিকাতা : ১৮১০), পৃ ১৪৮।

৯৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, প্লেট নং ৪৮, ফিগার নং ১১৭–১১৮।

৯৯. এস, হোসেন. এভরিডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৮), প্লেট নং ১, ফিগার নং ১, ২।

১০০. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৬১৭, পৃ. ২৮৩।

১০১. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪৫৬, পৃ. ২৪৮।

১০২ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, প্লেট নং ৫০, ফিগার নং ১২১, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৮৮, পৃ. ১৬৫।

১০৩. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, প্লেট নং ৪৭, ফিগার নং ১১৪, ১১৬ ; প্লেট নং ৪৯, ফিগার নং ১১৯ ; প্লেট নং ৫৩, ফিগার নং ১২৮।

১০৪. মূর্তি নং ৩৫৪, বরেন্দ্র যাদুঘর, রাজশাহী ; প্লেট নং ১, চিত্র নং ১।

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৭৬, পৃ. ২৫৩।

১০৭. সদ্যুক্তিকর্ণামৃত, ২/২০/২।

১০৮. প্রাগুক্ত, ২/১০৮/৪, পৃ. ১৩৯ ; ২/১৪৪/৫, পৃ. ১৬২ ; ২/১৪৬/৩, পৃ. ১৬৩ ; ২/১৩০/১, পৃ. ১৫২।

১০৯. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ২৬, পৃ. ১৩০।

১১০. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, পৃ. ৫৫।

১১১. এস. হোসেন, দি সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন দি আবলি মিডীএভল্ বেঙ্গল, পৃ. ৫৪।
১১২. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৩০৭, পৃ. ৩৫৯।
১১৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৩০৯, পৃ. ৩৬০।
১১৪. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৩০৪, পৃ. ২১৫।
১১৫. জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত পদ্যানুবাদ, পুনর্মুদ্রিত (কলিকাতা ; বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯), দ্বিতীয় সর্গঃ শ্লোক নং ৩, পৃ. ৪৪।
১১৬. প্রাগুক্ত, একাদশ সর্গঃ শ্লোক নং ২৯, পৃ. ১৫৯।
১১৭. সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮) পৃ. ১৮-১৯।
১১৮ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, শ্লোক নং ৩১. দেওপাড়া লিপি, পৃ. ৫৬ ; গীতগোবিন্দম, দ্বিতীয় সর্গঃ শ্লোক ২১, পৃ. ৫৪।
১১৯. পবনদূত, শ্লোক নং ৭১, পৃ. ২৭।
১২০. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৬৫/৩, পৃ. ১১২।
১২১. ঐ, ২/৬৫/২, পৃ. ১১১।
১২২ ঐ, ২/২০/৫, পৃ. ৮১।
১২৩. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৩৯, পৃ. ১৫৫।
১২৪ ঐ. শ্লোক নং ২৩১, পৃ. ১৯৮।
১২৫ অনিরুদ্ধ ভট্ট, পিতৃদয়িতা, দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), (কলিকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৩০), পৃ ৪।
১২৬ পবনদূত, শ্লোক নং ৯৯, পৃ. ৩৯ ; উদ্ধৃত : সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ ৩১।
১২৭ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, প্লেট নং ৫৭।
১২৮ মূর্তি নং ৩৫৪৬, ৩৮০৫, ৪৯১, বারান্দা গ্যালারী এবং মূর্তি নং ১৪৭৬, ৯৫২, ২২৫, ৩ নং গ্যালারী, বরেন্দ্র যাদুঘর, রাজশাহী।
১২৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, প্লেট নং ১. ফিগার নং ৫ ; প্লেট নং ৭০, ফিগার নং ১৫৯।
১৩০. প্রাগুক্ত, প্লেট নং ১৬, ফিগার নং ৪২।
১৩১ পবনদূত. শ্লোক নং ১৪, ৪০, ৪২, ৪৩,৪৫, ৮২, ৯১,পৃ. নং ৫, ১৫-১৭, ৩২, ৩৬-৩৭।
১৩২ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৫০, পৃ. ১৯-২০।
১৩৩ সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১০৯/৩, পৃ. ১৪০ ; আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৮৫, পৃ. ৯৪ ; গীতগোবিন্দম্, একাদশ সর্গঃ শ্লোক নং ১১, পৃ. ১৫০।
১৩৪ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৬৮৭, পৃ. ২৯৮।
১৩৫. বল্লাল সেন, অদ্ভুতসাগর, মুরলীধর ঝা (সম্পাদিত), (বেনারস : দি প্রভাকর অ্যাণ্ড কোং, ১৯০৫), পৃ. ১-৪।
১৩৬. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪০৪, পৃ. ২৩৭।
১৩৭. অদ্ভুতসাগর, পৃ. ১-৪।
১৩৮. পবনদূত, শ্লোক নং ৪২, পৃ. ১৬ ; গীতগোবিন্দম, অষ্টম সর্গঃ, শ্লোক নং ১০, পৃ. ১২৪।
১৩৯ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ. শ্লোক নং ২৯২, পৃ. ২১২।
১৪০. গীতগোবিন্দম, সপ্তম সর্গঃ, শ্লোক নং ১, পৃ. ৯৮।
১৪১. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৬৩২, পৃ. ২৮৬।

১৪২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১২ ও ২৯, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫২ ও ৫৫ ; আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১১, পৃ. ৬ ; পবনদূত, শ্লোক নং ৪৩, পৃ. ১৬ ; গীতগোবিন্দম্, একাদশঃ সর্গঃ, শ্লোক নং ১১, পৃ. ১৫০।

১৪৩. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ২৮, পৃ. ৬৭ ; পবনদূত, শ্লোক নং ৪০, পৃ. ১৫ ; আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৩০, পৃ. ১৯৮।

১৪৪. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৫০, পৃ. ২৪৭।

১৪৫. গীতগোবিন্দম্, প্রথমঃ সর্গঃ, শ্লোক নং ২৬, পৃ. ২৭।

১৪৬. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৯।

১৪৭ সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৫৬/১ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ৪৮৪।

১৪৮. এস, হোসেন, দি সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডীএভল্ বেঙ্গল, প্লেট নং ২–৪, ৬, ৭, ১০।

১৪৯. অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, বরেন্দ্র যাদুঘর, রাজশাহী।

১৫০. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৬/২, পৃ. ৭৮।

১৫১. পবনদূত, শ্লোক নং ৪৩, পৃ. ১৬।

১৫২. গীতগোবিন্দম্, দশম সর্গঃ শ্লোক নং ৬, পৃ. ১৩৬।

১৫৩. প্রাগুক্ত।

১৫৪. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৩৭/২, পৃ. ১৫৭।

১৫৫. পবনদূত, শ্লোক নং ৭০, পৃ. ২১।

১৫৬. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১০৯/২, পৃ. ১৪০ ; আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৪৬, পৃ ২০১।

১৫৭. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৬৩/১, পৃ. ১১২।

১৫৮ সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১১৫২, পৃ. ২০৭, পবনদূত, শ্লোক নং ৪৪, পৃ. ১৬।

১৫৯. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৬৪/১, পৃ. ১১১।

১৬০. প্রাগুক্ত, ২/৬৬/১, পৃ. ১১২।

১৬১. প্রাগুক্ত, ২/৭৮/১, পৃ. ১১৯।

১৬২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, শ্লোক নং ১১, দেওপাড়া লিপি, পৃ. ৫

১৬৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬৩।

১৬৪. গীতগোবিন্দম্, দশম সর্গঃ শ্লোক নং ৬, পৃ. ১৩৬।

১৬৫. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৬৭৫, পৃ. ২৯৫-৯৬।

১৬৬. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৯।

১৬৭. পবনদূত, শ্লোক নং ২৬ ও ৬৬, পৃ. ৮ ও ২৫।

১৬৮. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৪৬, পৃ. ২০১।

১৬৯. প্রাগুক্ত,শ্লোক নং ২৬৮, পৃ. ২০৭।

১৭০. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/১/৪, শ্লোক নং ২০০৪, পৃ. ৫৪৫।

১৭১. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৮, পৃ. ১৪৫।

১৭২. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/৬৮/৩ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ৪৮৭।

১৭৩. পবনদূত, শ্লোক নং ৪৮, পৃ. ১৮।

১৭৪. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়, পৃ. ৬০৭।
১৭৫. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ২৩, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫৪।
১৭৬. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/২১/২, শ্লোক নং ৫৭৭, পৃ. ১৫৪ ; উদ্ধৃত : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬২।
১৭৭. সুকুমার সেন (সম্পা.), চর্যাগীতি পদাবলী, গীত নং ৬, পৃ. ৬৪ ও ১৬১।
১৭৮. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/৪৬/৫
১৭৯. প্রাগুক্ত, ৪/৪৮/১ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।
১৮০. পবনদূত, শ্লোক নং ১৪, পৃ. ৭।
১৮১ নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১৩, পৃ. ১৪০।
১৮২. পবনদূত, শ্লোক নং ৩৩, ও ৪০, পৃ. ১১ ও ১৫।
১৮৩. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, অষ্টাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ৪১৭।
১৮৪ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫০।
১৮৫ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৭৮, পৃ. ১৬৩।
১৮৬ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬২৩, পৃ. ২৮৪।
১৮৭ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪১, পৃ. ১৫৬।
১৮৮ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৪৯।
১৮৯. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১১, পৃ. ১৩৪।
১৯০. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৮৭, পৃ. ১৮৮।
১৯১ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১, প্লেট নং ৫২, ফিগার নং ১২৬ ; প্লেট নং ৫৫, ফিগার নং ১৩৫ ; প্লেট নং ৩৪, ৩৯, ৪০, ৪৩।
১৯২ হলায়ুধ মিশ্রের সেক শুভোদয়া, উদ্ধৃত : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, পৃ. ৮০–৮১।
১৯৩. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ২৬, পৃ. ৬৭।
১৯৪. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১১৬/৩, শ্লোক নং ১০৫৩, পৃ. ২৮১।
১৯৫ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৫৩৮, পৃ. ২৬৬।
১৯৬. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১১৮/৩, শ্লোক নং ১০৬৩, পৃ. ২৮৪।
১৯৭. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১০, ভুবনেশ্বর শিলালিপি, পৃ. ৩৫, ৪১।
১৯৮. পবনদূত, শ্লোক নং ২৭, পৃ. ৮।
১৯৯. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৮, ২১, পৃ. ৬–৭।
২০০. হিস্টি অফ বেঙ্গল, খণ্ড–১, প্লেট নং ৫৫, ফিগার নং ১৩৪।
২০১. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১৯, পৃ. ১৩৮।
২০২. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৭, পৃ. ১৩৭।
২০৩. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৮, পৃ. ১৩৭।
২০৪. প্রাগুক্ত, গীত নং ১০, পৃ. ১৩৩।
২০৫. সুকুমার সেন, চর্যাগীতি–পদাবলী (চর্যাচর্য টীকা সমেত), তৃতীয় সং, (কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃ. ৩৪, ১৬২ ১৬৭–১৬৯, ১৭০–১৭১, ১৮৭, ১৯৪।
২০৬. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৫, পৃ. ১৩১।
২০৭. প্রাগুক্ত, গীত নং ৩২, পৃ. ২৪৩।
২০৮. প্রাগুক্ত, গীত নং ৩৮, পৃ. ২৪৬।

২০৯. প্রাগুক্ত, গীত নং ৮, পৃ. ১৩১।
২১০. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৪, পৃ. ১৩৫।
২১১. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৫, পৃ. ১৩৬।
২১২. প্রাগুক্ত, গীত নং ৮, পৃ. ১৩২।
২১৩. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৭, পৃ. ১৫৭।
২১৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৯৯, পৃ. ১৬৮।
২১৫. গীতগোবিন্দম, প্রথম সর্গঃ শ্লোক নং ৫, পৃ. ১৫-১৬।
২১৬. শ্রীমদানন্দ ভট্ট, বল্লালচরিত, দীননাথ ধর (অনূ.), (কলিকাতা : যোড়াসাঁকো, রাজবাড়ী, ১৩১১), পৃ. ৩০।
২১৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫৫।
২১৮. এস, হোসেন, এভরিডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার, পৃ. ১৬৮।
২১৯. সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত, আর সি. মজুমদার ও অন্যান্য, (সম্পাদিত ও অনূদিত), (রাজশাহী : দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৩৯), শ্লোক নং ৪২, পৃ. ৭০-৭১।
২২০. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৭৬, পৃ. ১৮৬।
২২১ দায়ভাগ, পৃ. ১৪৮।
২২২. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-১, প্লেট নং ৫৩।
২২৩. পবনদূত, শ্লোক নং ৫৪, পৃ ২১।
২২৪ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, ইদিলপুর তাম্রশাসন, শ্লোক নং ২৩, পৃ. ১২৯।
২২৫ সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/২/১, উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান, পৃ. ৫৩৭।
২২৬ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, চিত্রসূচি, চিত্র নং ৩৩।
২২৭. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৫. ৩৬, পৃ. ১৫০, ১৭৫।
২২৮. নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৯, পৃ. ১৩৩।
২২৯ প্রাগুক্ত, গীত নং ১৬, পৃ. ১৩৬।
২৩০. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৭, পৃ. ১৩৭।
২৩১. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, শ্লোক নং ৭, ইদিলপুর তাম্রলিপি, পৃ ১২৭।
২৩২. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৯৭, পৃ. ২১০।
২৩৩. পবনদূত, শ্লোক নং ৫২, পৃ. ২০।
২৩৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬৫, পৃ. ২৫।
২৩৫. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৮১, পৃ ২১০।
২৩৬. প্রাগুক্ত,শ্লোক নং ৫২০, পৃ. ২৬৩।
২৩৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭৯, পৃ. ১৬৩-৬৪।
২৩৮. প্রাগুক্ত. শ্লোক নং ৫৭, পৃ. ১৫৯।
২৩৯. চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৫০, পৃ. ১৫২।
২৪০. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৫০/১, শ্লোক নং ২২৪৬, পৃ ৬১০।
২৪১. চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৫০, পৃ. ১৫২।
২৪২. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৫০/১, শ্লোক নং ২২৪৬, পৃ ৬১০।
২৪৩. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৮৯, পৃ. ২৫৬।

২৪৪. চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৫, পৃ. ১৩১।
২৪৫. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৩১৪, পৃ. ২১৮।
২৪৬. হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্বস্বম, প্রথম খণ্ড, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ (অনূদিত), (কলিকাতা, মহামিলন মঠ, ১৩৯৪), শ্লোক নং ১৬, পৃ. ৫ ; উদ্ধৃত : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৪১।
২৪৭. মীনহাজ-ই-সিরাজ, [illegible]-ই-নাসিরী, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, (অনূ. ও সম্পা.), (ঢাকা : বাংলা একাডে[illegible]), পৃ. ২৭।
২৪৮ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫৭।
২৪৯. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৭৪, পৃ. ১৬২।
২৫০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭৪, পৃ. ১৬২।
২৫১. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ২৯৮
২৫২ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম, পৃ. ৪০-৪২।
২৫৩. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৬৮৫, পৃ ২১৬।
২৫৪. পবনদূত, শ্লোক নং ২৮, পৃ. ১০।
২৫৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪২, পৃ ১৬।
২৫৬. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, শ্লোক নং ৯, পৃ ১২
২৫৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৯, পৃ. ১৪৩-৪৪।
২৫৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬৬।
২৫৯. দায়ভাগ, পৃ ৭ ও ১৪৯।
২৬০ ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড-৩, শ্লোক নং ৩০, ভুবনেশ্বর শিলালিপি, পৃ. ৩৯-৪০।
২৬১. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩০, দেওপাড়া শিলালিপি, পৃ. ৫৫-৫৬।
২৬২. পবনদূত, শ্লোক নং ২৭, পৃ ৮, উদ্ধৃত : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ ৪৬৬, ৫৪৭।
২৬৩. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৪৭/৪ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান, পৃ. ৫০৮।
২৬৪. প্রাগুক্ত, ২/২০/৫ ; উদ্ধৃত : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬১।
২৬৫. ব্রাহ্মণসর্বস্বম, পৃ. ৮৬।
২৬৬. পবনদূত, শ্লোক নং ৩৫, পৃ ১৩।
২৬৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৪, পৃ. ৭।
২৬৮. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৭৭, পৃ. ১১৭।
২৬৯. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৬৫৭, পৃ. ৩২, ২৯২।
২৭০. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৩০৬, পৃ. ১৪৫।
২৭১. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৯৮, পৃ. ২১৪।
২৭২. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৬১৭, পৃ. ২১২।
২৭৩. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৩০৪ পৃ. ২১৫।
২৭৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩১২, পৃ. ২১৭।
২৭৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২১৯, পৃ. ১৯৫।
২৭৬. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৪০, পৃ. ১৭৬।
২৭৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪৭৬, পৃ. ২৫৩।
২৭৮. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৩৮/২, শ্লোক নং ১১৮৭, পৃ ৫৯৭, উদ্ধৃত : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬৭।

২৭৯. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ৬০।
২৮০. প্রাগুক্ত।
২৮১. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৩০৬, পৃ. ৩৫৯।
২৮২. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৩২০, পৃ. ৩৬১; সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৪৬/২, শ্লোক নং ২২২৭, পৃ. ৬০৯।
২৮৩. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৪৯/১, শ্লোক নং ২২৪১, পৃ. ৬০৮–৬০৯।
২৮৪. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৩১১।
২৮৫. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৫০/১, শ্লোক নং ২২৪৬, পৃ. ৬১০।
২৮৬. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১৩১২, পৃ. ৩৬০।
২৮৭. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১৩১৭, পৃ. ৩৬১।
২৮৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬৮।
২৮৯. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪১৫ পৃ. ২৩৯।
২৯০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৮৮, পৃ. ১৬৫।
২৯১. পবনদূত, শ্লোক নং ১৫, পৃ. ৫।
২৯২. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৯৩, পৃ. ২৫৭।
২৯৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪৯২, পৃ. ২৫৬–২৫৭।
২৯৪. প্রাগুক্ত. শ্লোক নং ৪১৫, পৃ. ২৩৯।
২৯৫. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৩৭১, পৃ. ২৩০।
২৯৬ সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ১১৭৫, পৃ. ৩৩৩।
২৯৭ নীলরতন সেন (সম্পা.), চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ২, পৃ. ১২৯।
২৯৮. প্রাগুক্ত।
২৯৯ পবনদূত, শ্লোক নং ১২, ৪।
৩০০. চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ৩৬, পৃ. ১৩৫।
৩০১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৬৯।
৩০২. প্রাগুক্ত।
৩০৩. চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১৯, পৃ. ১৩৮।
৩০৪. প্রাগুক্ত, গীত নং ২৮, পৃ. ১৪১।
৩০৫. প্রাগুক্ত, গীত নং ৫০, পৃ. ১৫২।
৩০৬. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৩, পৃ. ১৩৫।
৩০৭. প্রাগুক্ত, গীত নং ২৬, পৃ. ১৪০।
৩০৮. প্রাগুক্ত, গীত নং ৪৫, পৃ. ১৫০।
৩০৯. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৪/২৫/৫; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান, পৃ. ৪১০, ৪৮৬।
৩১০. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৮৭, পৃ. ১৮৮।
৩১১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশ খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ২২৩।
৩১২. প্রাগুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়, পৃ. ৬০৮।
৩১৩. মনুসংহিতা, কুল্লুক ভট্টকৃত টীকা, ভরতচন্দ্র শিরোমণি (সংশোধিত), (কলিকাতা : অরুণোদয় ঘোষ, ১৯২৩), পৃ. ৩৪৩।

৩১৪. ভট্টভবদেব, সম্বন্ধবিবেক, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, (সম্পাদিত), নিউ ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারী, খণ্ড–৬, শ্লোক নং ১৩ ও ১৪, পৃ. ২৫৯।

৩১৫. দায়ভাগ, পৃ. ১৮৬।

৩১৬. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ষড়ধিকশততম অধ্যায়, পৃ. ৫৯৩।

৩১৭. চর্যাগীতিকোষ, গীত নং ১৯, পৃ. ১৩৮।

৩১৮. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, একত্রিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৪১।

৩১৯. শ্রীমদানন্দ ভট্ট, বল্লালচরিত, দীননাথ ধর, (অনূদিত), (কলিকাতা : যোড়াসাঁকো, রাজবাড়ী, ১৩১১), পৃ. ৬১–৬২।

৩২০ দায়ভাগ, পৃ. ১৭৬–১৭৭।

৩২১. সুকুমার সেন (সম্পা). চর্যাগীতি পদাবলী, গীত নং ১২, পৃ. ২১৭, ২২৯।

৩২২. প্রাগুক্ত, গীত নং ১৬, পৃ. ২৩০।

৩২৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৭২।

৩২৪. দায়ভাগ, পৃ. ৭৩।

৩২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৩২৬. এস. হোসেন, সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আর্বলি মিডীএভল্ বেঙ্গল, পৃ. ৩২।

৩২৭. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়, পৃ. ৬০৭।

৩২৮. মনুসংহিতা, পৃ. ৪০১, ৪৪৫।

৩২৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৭২।

৩৩০ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ২৫৭, পৃ. ২০৪।

৩৩১. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ ৩১৭।

৩৩২. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড–৩, শ্লোক নং ১০, নৈহাটি তাম্রলিপি, পৃ. ৭৭।

৩৩৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১১, পৃ ৭৭।

৩৩৪. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ. পূর্ব্বখণ্ডম, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ ৭।

৩৩৫. পবনদূত, শ্লোক নং ৯২, পৃ. ৩৭।

৩৩৬. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৫৯, পৃ. ৮২।

৩৩৭. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল খণ্ড ১, প্লেট নং ১৮, ফিগার নং ৪৫।

৩৩৮. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১৫/১, পৃ. ৭৭।

৩৩৯. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৩০২, পৃ. ২১৫।

৩৪০. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭৩, পৃ. ১৬২।

৩৪১ প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭৩, পৃ. ১৬২।

৩৪২. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৪৬, পৃ. ১৪৪।

৩৪৩. প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ২৮৬, পৃ. ২১১।

৩৪৪. এস. হোসেন, সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডীএভল্ বেঙ্গল, পৃ. ১০০–১০১।

৩৪৫. দায়ভাগ. পৃ. ৮৫।

৩৪৬. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৯০, পৃ. ১১৬।

৩৪৭. চর্যাগীতি পদাবলী, গীত নং ১৪, পৃ. ১৬৮–১৬৯।

৩৪৮. প্রাগুক্ত, গীত নং ৩, পৃ. ১৫৮।

৩৪৯. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৩০১, পৃ. ৫৫।

৩৫০. প্রাকৃতপৈঙ্গল, পৃ. ৪০৩।

৩৫১. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/৩৮/২, পৃ. ৩০৩।

৩৫২. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ৪৯৩, পৃ. ২৫৭।

৩৫৩. পবনদূত, শ্লোক নং ৩৮, পৃ. ১৪।

৩৫৪. সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/১১৮/৩, শ্লোক নং ১০৬৩, পৃ. ২৮৪।

৩৫৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৩।

৩৫৬. ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, খণ্ড ৩, শ্লোক নং ৭, নৈহাটি তাম্রলিপি, পৃ. ৭২, ৭৬–৭৭।

৩৫৭. সদুক্তিকর্ণামৃত, ৫/১/৫ ; উদ্ধৃত : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীব দান, পৃ. ৪৭৩, ৫১৮।

৩৫৮. দায়ভাগ, পৃ. ১৫৮।

৩৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২–৮৩।

৩৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬–৭৯, ৬৮–৭৫।

৩৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৩৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

৩৬৪. অদ্ভুতসাগব, পৃ. ১–৪।

৩৬৫. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায, পৃ. ৩০৪।

৩৬৬. প্রাগুক্ত, পূর্ব্বখণ্ডম, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৮.

৩৬৭ প্রায়শ্চিত্ত প্রকবণম, পৃ. ৬৯।

৩৬৮ ভবদেব ভট্ট, শবশৌচিপ্রকবণম. আব. সি. হাজবা (সম্পা।). (কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৯), পৃ. ৬৩।

৩৬৯. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, অষ্টম অধ্যায, পৃ. ৩১৭।

৩৭০. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৩৭১. জি. ভুলার, দি ল'জ অফ মনু, স্যাকবেড বুক্স অফ দি ই'স্ট সিরিজ, হার্ভার্ড, ৯/২৯, পৃ. ৩১২, উদ্ধৃত : এস. হোসেন, সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডীএভ্ল্ বেঙ্গল, পৃ ৩৬।

৩৭২. মনুসংহিতা, পৃ. ৩০৭।

৩৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

"সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন" বাংলার সামগ্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজনৈতিক অঙ্গনের উত্থান-পতন সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। তদ্রূপ সেনরাজবংশের উত্থান বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গতিধারাকে কিছুটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারত হইতে আগত সেনরাজবংশের পূর্বপুরুষ পশ্চিম বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং ক্ষমতার ক্রমোন্নতির মাধ্যমে বাংলার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনের এই পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্ববহ। সেনশাসনামলের পূর্ববর্তী পাল রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী, আবার বৌদ্ধধর্মের ভক্ত, অনুরক্ত হইয়াও তাঁহারা পরধর্মে অধিকতর সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনরাজগণ ছিলেন তাঁহাদের বিপরীত, তাঁহারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী এবং ইহার কঠোর বাস্তবায়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরধর্ম সহিষ্ণুতা তাঁহাদের ছিল না। বাংলার ধর্মনীতির এই পরিবর্তন বাংলার সামাজিক তথা সামগ্রিক ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

তৎকালীন বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে একই আঞ্চলিক সত্তাবিশিষ্ট হইলেও ইহার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরে আসাম ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ইহা বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে চিহ্নিত। আবার এই ভূভাগ অনাদিকাল হইতে গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর জলধারায় সিক্ত, পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। প্রাচীনকাল হইতে তাই কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে এই অঞ্চল, ফলে বিদেশীরা বাংলার প্রতি অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছে। বাংলার সমৃদ্ধির প্রতি সেনদের আকর্ষণ ইহার একটি কারণ হিসাবেও গণ্য হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের উত্তরাধিকারী সেনগণের বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন সামাজিক গতিধারায় ইহার প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী। বিশেষত বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় আচার-প্রথার দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে সেনযুগ একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আছে। সমসাময়িক উৎস উপকরণ সেনামলের সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিচিত চিহ্ন হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তর বিশেষত বর্ণে বর্ণে বিভক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ধারা একদিকে যেমন প্রাচীনকালের উষালগ্ন হইতে শুরু হইয়াছিল তেমনি

অদ্যাবধি হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে ইহা শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রভাবিত করে নাই, পার্শ্ববর্তী জৈন ও বৌদ্ধধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। আর সেনরাজগণের শাসনকালে এই বর্ণপ্রথা সামাজিক জীবনে নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা মাপকাঠিতে পরিণত হয়। অবশ্য পূর্ববর্তী শাসক বংশ পালরাজগণের ধর্মীয় গোঁড়ামি ততটা কঠোর ছিল না যতটা ব্রহ্মক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় বৃত্তি বা যোদ্ধাবৃত্তি গ্রহণ করেন, যদিও ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, বরং বাংলার রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া ইহার পরিপূর্ণ প্রয়োগ শুরু করেন। অবশ্য সামাজিক প্রেক্ষাপটও যে কিছুটা হইলেও দায়ী ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ পালদের শাসনকালের শেষার্ধ হইতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে, তখন বৌদ্ধধর্মের বহুলোক পূর্বের আচার-প্রথা লইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবেশ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভবিষ্যৎ বিপদ প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। তাহাদের এই কার্যে শাস্ত্রকারদের সমর্থন তাঁহারা পাইয়াছিলেন। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজাপদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার আচার, অপরাধ ও ইহার শাস্তিবিধান, স্ত্রীধন, সম্পত্তি বিভাজন, আহারে বিধিনিষেধ, বিভিন্ন প্রকার দান, অশৌচ, স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন, কাজকর্মের শুভাশুভের বিচার-বিশ্লেষণ, কৃচ্ছ্রতাসাধন, উত্তরাধিকার. তিথি নক্ষত্রের কালবিচার, ধর্মীয় গ্রন্থপাঠের নিয়মকানুন প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ এই সময়ে প্রণীত হয়। এইভাবেই বাংলার সামাজিক জীবনে রক্ষণশীল মনোবৃত্তি প্রকট রূপ ধারণ করে।

সেনরাষ্ট্র ও সমাজের শীর্ষে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অবস্থান গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র তাঁহাদের আনুকূল্য দান করিত। বিশেষত ভূমিদান অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণেরা গাঞী প্রথার সৃষ্টি করেন। ইহাই তাঁহাদের পরিচিতি অর্জনে সহায়ক হয়। অবশ্য গাঞী বিভাগ হইতে ভৌগোলিক বিভাগ ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও শাকদ্বীপি প্রভৃতি নামে তাঁহারা পরিচিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইহাদের মধ্য রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বেদজ্ঞান যথেষ্ট কম ছিল। চর্যাগীতিতেও ইহার উল্লেখ আছে। অন্যদিকে গ্রহবিপ্র, অগ্রদানী ও ভট্ট ব্রাহ্মণগণ সমাজে খুব বেশি সম্মানিত ছিলেন না। কারণ ইহারা শাস্ত্রসম্মতভাবে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন না। তাহা ছাড়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ধর্মকর্মের পরিবর্তে রাজকার্য ও কৃষিকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট না হইলেও নিম্নবর্ণের দান গ্রহণ এবং তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী ছিল। ইহার জন্য তাঁহারা সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অবস্থান। যদিও তৎকালীন সমাজে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ কম ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের পরই ছিল শূদ্র বর্ণের অবস্থান। আবার সেনযুগে বাংলায় বর্ণসংকর হিসাবে পরিচিত উপবর্ণগুলি শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে অন্য বর্ণগুলিকে উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অধম সংকরে বিভক্ত করা হইয়াছে। অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাদেরকে সৎশূদ্র ও

অসৎশূদ্র হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। বিশেষত একজাতীয় পুরুষ ও অন্য জাতীয় স্ত্রীর সঙ্গত সন্তানগণই এক বর্ণসংকরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়াও ছিল একেবারে নিম্নপর্যায়ভুক্ত অন্ত্যজ জাতি। সমাজের একেবারেই নিম্নে তাহাদের স্থান ছিল। আবার ইঁহারাই ছিল বর্ণাশ্রম বহির্ভূত এবং রাষ্ট্রীয় দৃষ্টির বাহিরে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৎকালীন হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত ব্রাহ্মণদের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর অন্নগ্রহণ ও পরিণয় সম্পর্কগত বিষয়ে বিধিনিষেধ ছিল। তবে ইহা সমাজে কতটুকু প্রতিপালিত হইত তাহা লইয়া সংশয় আছে। কারণ শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের উক্তিতে বারবার এই বিধিনিষেধ লংঘনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই আমরা এই সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে শাস্ত্রকারগণের বিধিনিষেধ সমাজে কতটুকু পালিত হইত।

আবার সেনযুগীয় সমাজ বর্ণে বর্ণে বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণীতেও বিভক্ত হইয়াছিল। ধনোৎপাদনের বাহন হিসাবে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যই তৎকালীন মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু সমাজে সম-অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কারণ রাষ্ট্রই সমস্ত কিছুর উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই কারণেই সমাজে দুইটি শ্রেণী যথা : বিত্তবান ও বিত্তহীন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণশাসিত ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক সম্পদ কুক্ষিগত করিবার জন্যই সামাজিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও ইহার প্রতিধ্বনি খুবই অস্পষ্ট। কারণ সামাজিক অনুশাসনের চাপে ও পীড়নে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে।

সেন যুগে বাংলায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সমাজ-জীবন তাঁহাদের ইঙ্গিতেই পরিচালিত হয়। যদিও বণিক ও ব্যবসায়ীদের অবদমিত করিবার মতো বিষয়ও ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। তাই বলা সম্ভব যে, অধিকাংশ মানুষকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সেন রাষ্ট্র যে সমাজ গঠন করিয়াছিল তাহাতে বর্ণেতর শ্রেণীর অবস্থা দারুণভাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বিশেষত বর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাস একান্তভাবে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সেন রাষ্ট্রের সামাজিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। একদিকে যেমন বর্ণে বর্ণে বিভক্তি বা কঠোর বিধিনিষেধ, তেমনি অপরদিকে অর্থনৈতিক শ্রেণীস্তর বিভক্ত মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। এই কারণেই উচ্চবর্ণ বা শ্রেণী অর্থনৈতিক দিক দিয়া সচ্ছল জীবনযাপন করিলেও নিম্নবর্ণ বা শ্রেণীর জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্যের অন্ত ছিল না। আবার মুষ্টিমেয় মানুষের হস্তে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাহাদেরকে সুনজরে দেখিতেন না। ইহা সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাই বৃদ্ধি করিয়াছিল।

অপরদিকে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তনে রাজা বল্লালসেনের দায়-দায়িত্ব কতটুকু ছিল—তাহা লইয়া সংশয় আছে। যদিও তাঁহাকে জড়িত করিয়া বাংলাদেশে অসংখ্য কুলজী গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা লইয়া গবেষণাও চলিতেছে। গবেষণালব্ধ তথ্য হইতে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তনে জড়িত থাকিবার ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া অনুমিত হয়। মনে

হয়, মুসলিম শাসনামলে উচ্চবর্ণ বা শ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদেরকে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও ইহার প্রভাব হইতে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই ধরনের মতবাদ প্রচার করেন।

মানবজীবন তথা সমাজজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতেছে ধর্মীয় জীবন। দীর্ঘদিনের বিবর্তিত ধ্যান–কল্পনার সমন্বয়ে বাংলার ধর্মীয় পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন কোম, বিভিন্ন জন অধ্যুষিত জনপদে পূজা–অর্চনা হইত বিভিন্ন প্রকার। সেন আমলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। তখন আর্য–অনার্য ধর্ম-কর্ম–সাধনার এক সমন্বিত রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমন্বিত রূপ কালের বিচিত্র প্রবাহে আয–ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিবর্তন করিয়াছিল। ফলে এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলাদেশীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিশেষত প্রাচীন বাঙালির ধর্মকর্ম বিশ্বাস সংস্কার ও আচার–অনুষ্ঠান আর্য–ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনেকখানি অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। হিন্দু সমাজে গ্রামীণ মেয়েদের চলমান গাছপূজা ও ব্রতোৎসব, নবান্ন উৎসব প্রভৃতি আদিবাসী কোম সমাজেরই দান।

লৌকিক দেবতার মন্দির থান হিসাবে গণ্য হইত। গ্রামীণ রীতি অনুসারে এখানে দেবতার অবস্থান বলিয়া কল্পনা করা হইত। দেবী কালী, ভৈরব বা ভৈরবী, বনদূর্গা বা চণ্ডী ছিলেন সেই কাল্পনিক দেবতা। তখন গ্রামবাসীরা ভয়ভক্তি সহকারে পশুপক্ষী বলি দিতেন। প্রথমত এই পূজা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও কালে কালে ব্রাহ্মণ্যবাদে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধ্বজ পূজাও অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃতি পাইয়াছে। বৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া যে পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল তাহাই গাছপূজা নামে পরিচিত, অন্যদিকে যাত্রা উৎসব রথযাত্রা, স্নান–যাত্রা, দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তাহা ছাড়া ব্রতোৎসব বিভিন্ন ব্রতে বিভক্ত ছিল, অবশ্য মেয়েরাই ব্রতোৎসব উদযাপনে বেশি উৎসাহ ও পারদর্শিতা দেখাইত। বাংলার লৌকিক দেবতাদের অন্যতম ছিলেন ধর্মঠাকুর। এই ধর্মঠাকুরও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মে ইহার রূপের পরিবর্তন হইয়াছিল। চড়কপূজা, হোলি উৎসব, মনসা, লক্ষ্মী পূজাও লৌকিক ধর্মের দান, ইহাও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য দেবী জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী প্রভৃতি পূজা অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কখন কোন সময় হইয়াছিল ইহা সঠিকভাবে নিরূপিত না হইলেও গুপ্তযুগের পূর্ব হইতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল তাহা নির্দ্বিধায় বলা চলে। পরবর্তীতে পাল রাজাদের শাসনকালে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত হয়। অবশ্য এই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব ও আধিপত্য তাঁহাদের পক্ষে একেবারে না মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। আবার পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মের ভক্ত, অনুরক্ত হইয়াও মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার আবির্ভাব প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন নাই। ফলে তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে এই সকল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের

পরিবর্তে যৌগিক রীতিনীতি অত্যধিক গুরুত্ব পাইয়াছিল। তখন 'হটযোগ' বৌদ্ধধর্ম মতের মূলতন্ত্রে পরিণত হয়। এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্র ব্রাহ্মণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হয়।

অন্যদিকে সেনরাজবংশের শাসনক্ষমতা গ্রহণে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে একটি নূতন দিকনির্দেশনা দেখা যায়। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম কোনঠাসা হইয়া পড়ে। তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মোটেই সহনশীল ছিলেন না, যদিও এই সময় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সংবাদ কোথাও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়। আবার সেনরাজগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম অনাদৃত হইলেও বৌদ্ধ জনগণের সংখ্যাও কম ছিল না। অবশ্য সেন আমলে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একেবারেই কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শাখা সহজিয়া মতবাদ একাদশ দ্বাদশ শতকে দারুণভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তবুও বলা চলে পাল রাজত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব বিনষ্ট হয়। সেনরাজাদের বর্ণ ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজ গঠনে বৌদ্ধ জনগণের উপর নিমম পরিণতি নামিয়া আসে। তখন বৌদ্ধধর্মের অনুসারিগণ হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে সচেষ্ট হয়।

আর্য বৈদিক ধর্ম বাংলাদেশে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে বিস্তার লাভ করে। গুপ্তযুগে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে বলা যায় যে পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বত্র আর্যধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল যাহা পাল শাসনামলেও অব্যাহত থাকে। অবশ্য পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি খুবই সহনশীল ছিলেন। যাহাই হউক, সেন আমলে বাংলাদেশের ধর্মীয় জগতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অপ্রতিহত প্রভাবের বিস্তার ঘটে। আবার এই ব্রাহ্মণ্যধর্মে বৈষ্ণব, শৈব, শক্তি, সৌর প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রসার দারুণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সময় বর্মণবংশের সকল রাজাই ছিলেন বিষ্ণুব উপাসক। অন্যদিকে সেনবংশের একজন রাজা লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব হিসাবে নিজের পরিচয় দিতেন। অবশ্য এই বংশের শক্তিশালী রাজা বিজয়সেন শৈবধর্মের অনুসারী হইয়াও তাঁহার লিপিতে হরি এবং হর প্রভৃতি বৈষ্ণব নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়েই বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের দুইটি সমৃদ্ধ রূপ যথা : বিষ্ণুর দশাবতারের সমন্বিত ও রীতিবদ্ধ রূপ, অন্যটি রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও রূপকল্পনা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে সেন রাজত্বকালে বিষ্ণু লক্ষ্মীনারায়ণ-রূপেই পূজিত হইতেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রবর্তিত শৈবধর্ম ছিল পশুপতধর্ম, সদাশিব ছিলেন সেন পরিবারের দেবতা ; এই বংশের রাজা বিজয়সেন ও বল্লালসেন শিবের উপাসক ছিলেন। আবার দেখা যায় বিজয়সেন ধূর্জটি নামে শিবের আবাহন করিলেও বল্লালসেন অর্ধ-নারীশ্বর-এর বন্দনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রদ্বয় কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন নারায়ণের আবাহন করিলেও তাঁহারা সদাশিবকে শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দেহ ও শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তান্ত্রিক সাধনা এই যুগের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে উদীচ্যবেশী সৌরপূজার প্রচলন সেনযুগীয় বাংলার অন্যতম ধর্মীয় দিক ছিল। সেনবংশের রাজা কেশবসেন ও

বিশ্বরূপসেন উভয়েই সূর্যভক্ত ও পরম সৌর হিসাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিতেন। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্মের নূতন নূতন রূপের উদ্ভব সামাজিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিলাস উপকরণ, আচার-আচরণ, ক্রীড়া-কৌশল প্রভৃতি সংস্কৃতির অঙ্গ এবং ইহাই জাতীয় জীবনের সাক্ষ্য বহন করে। তদ্রূপ সেনযুগীয় বাঙালির অভ্যাস ও সংস্কার, ধ্যান-কল্পনা ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—ইহা তৎকালীন বাঙালি জীবনের মৌলিক পরিচয়।

খাদ্য গ্রহণে আজিকার মতই ভাতই ছিল বাঙালির প্রধান অবলম্বন। তাই ধান উৎপাদন বাঙালি জীবনের চিরায়ত কৃষি উৎপাদন। আবার প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত হইলেও ভাতের কাঙ্গাল ছিল দরিদ্র বাঙালি। আবার ধান্যের পরিবর্তে যব ও গম খাদ্যশস্য হিসাবে গণ্য হইত, তৎকালীন বাংলাদেশে এইসব শস্যও প্রচুর উৎপাদিত হইত। অবশ্য ধান্যই ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্যশস্য এবং ভাতই ছিল প্রধান ভক্ষ্য। এই ভাত শাকসব্জী মাছমাংস সহযোগে খাওয়া হইত। ডাল খাওয়ার রীতি তখনও ছিল। তরিতরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, সীম, কাকরোল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তৎকালে গ্রামীণ জীবনযাত্রা শহরের চাইতে কম ব্যয়বহুল ছিল।

নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকায় মদ ছিল অন্যতম। অবশ্য শাস্ত্রীয়ভাবে মদ্যপান নিষেধ থাকিলেও মদ্যপান সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে ঘি, দুগ্ধ, চিনি, ছানা প্রভৃতি দিয়া মিষ্টান্ন ও পিঠা গ্রহণ বাঙালির অভ্যাস ছিল। তবে শুধু স্বাস্থ্যগত কারণে বিভিন্ন প্রকারের দুগ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সাধারণত পুরুষ ধুতি ও নারী শাড়ি পরিধান করিত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একমাত্র সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে একথা মনে করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী দেহের উর্ধাংশ অনাবৃত রাখিত। তবে বাঙালি নারী দেহের উর্ধাংশ অনাবৃত রাখিতেন একথা মনে হয় না। তাঁহারা উত্তরীয় বা শাড়ির আচল দিয়া দেহ আবৃত রাখিতেন এ কথাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। তবে শবর ও পুলিন্দ রমণীরা দেহের উপরার্ধ অনাবৃত রাখিতেন। বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ ধরনের সাজসজ্জা করা তৎকালেও প্রচলিত ছিল। অবশ্য ধনী ও দরিদ্রের পোশাক পরিধানে ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হইত। ধনী ব্যক্তিরা ইচ্ছামত পোশাক পরিধান করিলেও তাহা দরিদ্র মানুষের নাগালের বাহিরে ছিল। কারণ শখ পূরণের সাধ্য তাহাদের ছিল না।

অপরদিকে কেশ পরিচর্যা বাঙালির চিরায়ত অভ্যাস। ইহার সৌন্দর্যবর্ধনে নারী-পুরুষ উভয়েই সচেষ্ট ছিলেন। পাদুকার মধ্যে কাঠের খড়ম ও চর্মপাদুকা উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রসাধন ব্যবহারেও তৎকালীন নারীসমাজ উৎসাহী ছিলেন। সধবা নারীরা কপালে কাজলের টিপ, সীমন্তে সিঁদুর, পায়ে আলতা, ঠোঁটে সিঁদুর এবং দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া, চন্দনপঙ্ক, কস্তুরী, কুঙ্কুম, অগুরু, মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃতি। কুণ্ডল, হার, বলয়, মেখলা, নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কার নারীদেহের ভূষণ ছিল। কিন্তু বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে

সকল প্রকার সাজসজ্জা পরিহার করা হইত। আবার দেহ অলঙ্করণেও ধনী দরিদ্রের ব্যাপক ব্যবধান দেখা যাইত। কারণ, ধন ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধশালীরা অঙ্গভূষণে মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করিলেও দরিদ্রের নিকট তাহা স্বপ্নের বস্তু ছিল। বৃক্ষলতা ও ফলফুল দ্বারা তাহাদের অঙ্গ সজ্জিত করিতে হইত। অন্যদিকে সেনযুগীয় তথা প্রাচীন বাংলার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে প্রায় সব ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। তবে শুধু বিবাহিত মহিলারা শঙ্খবলয় ব্যবহার করিতেন।

শিকার পুরুষের প্রধান বিহার ছিল। অবশ্য ইহা অরণ্যচারী মানুষের জীবন জীবিকা উভয়ই মিটাইত। জলক্রীড়া ও উদ্যান রচনা নারীর প্রধান ক্রীড়ার অংশ হিসাবে গণ্য হইত। অবশ্য নিম্নশ্রেণীর নারীরা কড়ির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করিত। তবে পুরুষের সহিত মেয়েরাও পাশা খেলা করিত। তখনকার দিনে জুয়া খেলা চলিত। সাপুড়ের সাপখেলা বেশ উপভোগ্যই ছিল।

নৃত্যগীতে নারীপুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করিত। সাধারণ গ্রাম্য মহিলারা স্বরচিত গান গাহিয়া ও অভিনয় করিয়া বেড়াইত। বাররামা ও দেবদাসীরা সাধারণত বাদ্য নৃত্যগীতে অত্যন্ত পারদর্শী হইতেন। নিম্নশ্রেণীর ডোম্বী নারীগণও নৃত্যগীতে দারুণ পটু ছিলেন। ফলে করতাল, মৃদঙ্গ, স্বরযন্ত্র, বীণা, বেণু ও শৃঙ্গ, ঢক্কা, পটহ, মুরজ, অনিক, বংশী, সন্নহনী, কাংস্য বাদ্যযন্ত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। চর্যাগীতে বহু রাগ-রাগিণীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার প্রচলন ছিল।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকাই ছিল যাতায়াতের প্রধান বাহন। তবে স্থলপথে গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, অশ্বযান, হস্তীযান, পালকির উল্লেখও হইয়াছে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাহনের প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইত। নিম্নশ্রেণীর নারীরা খেয়াপারাপারে কাজ করিত। এইভাবেই তাহাদের জীবন জীবিকা চলিত। পালকি, অশ্ব, হস্তীযান দরিদ্র মানুষের নাগালের বাহিরে ছিল। ধনীরাই এইগুলি ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের আভিজাত্য প্রকাশ করিত। কারণ ব্যয়বহুল যাতায়াত মাধ্যম ব্যবহার দরিদ্র মানুষের সাধ ও সাধ্যের বাহিরে ছিল।

ঘরদুয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রেও ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ ছিল ব্যাপক। বিত্তবান মানুষ অট্টালিকা নির্মাণ করিতে সক্ষম হইলেও বাঁশ-কাঠ-মাটি ছিল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের বাড়ি তৈয়ারির প্রধান উপকরণ। খাল-নদী পারাপারের জন্য কাঠের সাঁকোর ব্যবহার তখনও হইত। কারণ ও কাঠের সহিত বাঙালির পরিচয় চিরায়ত।

নগরজীবনে নৈতিক শিথিলতা তখনও ছিল। নানা প্রকার ব্যাভিচার নাগরিক সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অবশ্য ইহা নিরসনে সমাজের নীতিনির্ধারকদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তবে তাঁহাদের অনুশাসন সমাজকে কতটুকু প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। সরল-সোজা মানুষ তখনও প্রতারকের খপ্পড়ে পড়িত। বাররামা, সভানন্দিনী, দেবদাসীরা মানুষের যৌন বাসনা চরিতার্থ করিত। এই ধরনের দুরাচারে নাগরিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়াছিল। সম্ভবত শাস্ত্র কিছুটা হইলেও এই অনৈতিকতা সৃষ্টির পশ্চাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। পরকীয়া প্রেমও সমাজে প্রচলিত ছিল।

এই ধরনের সামাজিক দুরাচার গ্রামীণ জীবনে ততটা প্রসারিত হয় নাই। কারণ গ্রামের মানুষ সাধারণত তাহা অপছন্দ করিতেন। পল্লীপতিদের এই বিষয়ে কড়া নজর থাকিত। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেই দুরাচার প্রতিরোধে কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেন। বস্তুত গ্রামীণ জীবন সহজ সরল, শান্ত জীবনের প্রতীক ছিল। সমকালীন নাগবিক জীবনের বিলাসব্যসন ও অসংগত আচরণ ইহাকে খুব একটা প্রভাবিত করে নাই। এইজন্য সাংসারিক জীবনের সুখও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবে গ্রামীণ জীবনের একাংশ ছিল দরিদ্র। তাহাদের দুঃখ দৈন্য নিত্য পীড়ার কারণ হইত। ভিক্ষাজীবী মানুষের আধিক্য এবং চোর-দস্যুর উপদ্রব তখনও ছিল। সেকালেও যৌতুক গ্রহণ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছিল। শবরদের বসবাস ছিল গ্রামের বাহিরে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়। ইহা ছাড়াও কৈবর্ত (মৎস্যজীবী), ধনুরী, ছুতার, সাপুড়েরা নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত ছিল।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীন সত্তা সেকালে ছিল না। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে তাঁহাদেব জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইত। বিবাহাদি ব্যাপারে বর্ণ সমতা সাধারণত বক্ষা করা হইত। এক স্ত্রী গ্রহণ প্রচলিত নিয়ম হইলেও বহুপত্নী গ্রহণও শাস্ত্রসম্মত ছিল। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা হয়ত তখন শাস্ত্রানুমোদিত ছিল না। সেই জন্য শাস্ত্র স্ত্রীকে বারংবাব স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হিসাবে প্রতিপন্নের পরামশ দিয়াছে। অবশ্য স্বামীর ও সন্তানের পরিচর্যা নারীজীবনের প্রধান লক্ষ্য হইলেও অতিথি আপ্যায়ন, ভিক্ষাদান, রান্নাবান্নাও তাহাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে নারী সমাজ ছিল তখনও পশ্চাৎপদ। অবশ্য এই ব্যাপারে কিছুটা হইলেও শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাদেব ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাবা পদা ও ঘোমটার ভিতব চলাফেরা করিতেন। অবশ্য জীবিকা অর্জনে সহায়তাদানকারী মেয়েদের এসবের বালাই ছিল না। সেন যুগীয় বাংলায় নারীদের সম্পত্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইলেও হস্তান্তরকালে পুরুষ-অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন পড়িত। বৈধব্য জীবন চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত ছিল। এই কারণে তাঁহাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ চিরতরে বিনষ্ট হইত। তখন তাঁহাকে সহমরণ ও অনুমরণ (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) প্রথা অবলম্বনের পবামর্শ দেওয়া হইত। ইহার অবলম্বন শাস্ত্রে অত্যন্ত সম্মানজনক কার্য হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে। অবশ্য প্রাচীন বাংলায় সহমরণ ও অনুমরণ প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিশেযত বাংলায় সেন শাসনের পূর্ববর্তী আমল হইতে অনেক কিছুর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই সময় বাংলার সামাজিক জীবনে আমলাতন্ত্রের প্রভাব দারুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বর্ণাশ্রম প্রথার কড়াকড়ি প্রয়োগ শুরু হয়, আবার বর্ণে বর্ণে বিভক্তির ফলে সামাজিক জীবনে অসংখ্য বর্ণের উৎপত্তি হয়। প্রধানত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সামাজিক জীবনকে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি সংস্কৃতির আলোকে সজ্জিত হইল এবং সেন প্রশাসনের উচ্চস্তর হইতে শুরু করিয়া নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন বাংলার সামাজিক কাঠামোতে নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটাইল। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম

তথা তদীয় সমাজের করুণ অবস্থা শুরু হয়। বৌদ্ধগণ কেহবা স্বদেশ পরিত্যাগ করিল অথবা স্বদেশে থাকিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অন্তরালে নিজেদের অস্তিত্ব কোনোক্রমে টিকাইয়া রাখিল। সুতরাং সেন আমল একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ হিসাবে গণ্য করা যায়। সমকালীন সময়ে এই যুগের অবদান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য সুদৃঢ়করণ। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণগুলি হইল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা সংকর বর্ণের শূদ্র। ব্রাহ্মণদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য অর্জন হিন্দু সমাজকে করিয়াছিল আরো রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী এবং সেই সঙ্গে মানুষে মানুষে পার্থক্য আরো সুচিহ্নিত করিয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ নিম্নবর্ণের লোক, নারী- সমাজ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ নিপীড়নের শিকার হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস

ক. সমসাময়িক গ্রন্থাবলী (সংস্কৃত, বাংলা, প্রাকৃত, অপভ্রংশ)

অনিরুদ্ধ ভট্ট : পিতৃদয়িতা। দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য (সম্পা.)। কলিকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৩০।

: হারলতা। কমলাকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (সম্পা.)। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯১৮।

কলহন : রাজতরঙ্গিনী, খণ্ড–১। এম.এ. স্টেন (অনু.)। ওয়েস্ট মিনিস্টার : অরচিবল্ড কনস্টবল অ্যান্ড কোং, ১৯০০।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : এফ. ডবলু, টমাস (সম্পা.)। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯১২।

কবিরাজ রাজশেখর : কর্পূর মঞ্জুরী। এস. কনাউ (সম্পা.)। হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ক্যামব্রিজ, ম্যাস, ১৯০১।

চর্যাগীতিকোষ : নীলরতন সেন (সম্পা.)। কলিকাতা : দীপালী সেন, ১৩৮৪।

চর্যাগীতিকোষ : সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার (সম্পা.)। কলিকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৮।

চর্যাগীতি–পদাবলী (চর্যাচর্যটীকা সমেত) : সুকুমার সেন (সম্পা.)। ৩য় সং। কলিকতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৩।

জয়দেব : গীতগোবিন্দম্। পুনর্মুদ্রিত। পূজারি-গোস্বামী বিরচিত টীকা, রসময় দাস-কৃত পদ্যানুবাদ এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ। কলিকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ। কলিকাতা : সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানী, ১৩৭৮।

জীমূতবাহন : কালবিবেক। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও প্রথমনাথ তর্কভূষণ (সম্পা.)। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৫।

: দায়ভাগ। জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.)। ২য় সং। কলিকাতা : ১৮৯৩।

: দায়ভাগ। এইচ. টি. কোলব্রুক, হিন্দু ল অফ ইনহেরিট্যান্স (অনু.)। কলিকাতা : ১৮১০।

: দায়ভাগ। মহেশচন্দ্র পাল (সঙ্ক. ও প্রকা.)। কলিকাতা : উপনিষদ কার্যালয়, ১৯৫০।

: দায়ভাগ । শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত টীকয়া ক্রমসন্দর্ভেণ-চ সমেতঃ, শ্রী চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ অনূদিত : প্রকাশিতশ্চ। ২য় সং। কলিকাতা : ১৩১৬।

জীমূতবাহন ব্রত পদ্ধতি : মধুসূদন সিংহ ও ভবানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত। মুর্শিদাবাদ : হিতৈষী প্রেস, ১৩০৬।

টি. গণপতিশাস্ত্রী (সম্পা.) : আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প। সংস্কৃত সিরিজ নং ৭০। ত্রিবান্দ্রম : ১৯২০।

ধোয়ী : পবনদূত নচিকেতা ভরদ্বাজ কর্তৃক সংস্কৃত কাব্যের মন্দাক্রান্তা ছন্দে বাংলা অনুবাদ। বারুইপুর, ২৪ পরগণা, ভারত : মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, ১৩৯২।

: পবনদূত । ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (অনু.)। নূতন সং। কলিকাতা : এইচ. চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৭।

ধর্মমঙ্গল, পর্ব-১ : সুকুমার সেন ও অন্যান্য (সম্পা.)। ২য় সং। কলিকাতা : ১৯৫৬।

পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু. ও সম্পা.) : ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। ১ম নবভারত সং। কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১।

: বৃহদ্ধর্মপুরাণ। ১ম নবভারত সং। কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬।

পিঙ্গলাচার্য : প্রাকৃত পৈঙ্গল। চন্দ্রমোহন ঘোষ (সম্পা.)। কলিকাতা : বিবলিওথেকা ইন্ডিকা, ১৯০২।

বল্লালসেন : অদ্ভুতসাগর : মুরলীধর ঝা (সম্পা.)। বেনারস : দি প্রভাকর অ্যান্ড কোং, ১৯০৫।

: দানসাগর। ভবতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.)। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৫৩।

: দানসাগর। শ্যামাচরণ কবিরত্ন (সম্পা.)। কলিকাতা : সাহিত্য সভা, ১৮৩৯।

বাল্মীকি-রামায়ণ : রাজশেখর বসু কর্তৃক সারানুবাদ। ষষ্ঠ মুদ্রণ। কলিকাতা : সুপ্রিয় সরকার, ১৩৭৮।

বিদ্যাকর : সুভাষিতরত্নকোষ। ডি. ডি. কৌশাম্বী অ্যান্ড ভি. ভি. গোখেল (সম্পা.)। হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড নং ৪২, ১৯৫৭।

: সুভাষিতরত্নকোষ। ডি. এইচ. এইচ. এ্যাঙ্গেলস (অনু.) হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড নং ৪৪, ১৯৬৫।

বিপ্রদাস : মনসা বিজয় । সুকুমার সেন (সম্পা.)। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৫৩।

ভবদেব পদ্ধতি : কবিরত্ন শ্যামাচরণ বিদ্যানিধি (সম্পা.)। শিবপুর : কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪৮।

ভবদেব ভট্ট : তৌতাতিতমততিলক। এ. এম. এম. অচিনস্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাজ শাস্ত্রী (সম্পা.)। বেনারস : গভর্ণমেন্ট এস. লাইব্রেরী, ১৯৩৯।

	:	প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পা.)। রাজশাহী : বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭।
	:	শবসূতকাশৌচ প্রকরণম্। রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা (সম্পা.)। কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৯।
	:	সম্বন্ধবিবেক। সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (সম্পা.)। বোম্বে : নিউ ইন্ডিয়ান এ্যানটিকুয়ারী, খণ্ড–৬, ১৯৪৩–৪৪।
মনুসংহিতা	:	কুল্লুভট্ট কৃত টীকা, ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত। কলিকাতা : অরুণোদয় ঘোষ, ১৯১৩।
মীনহাজ-ই-সিরাজ	:	তবকাত-ই-নাসিরী। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনু. ও সম্পা.) ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
রমেশচন্দ্র মুজমদার	:	বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র। কলিকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৭৩।
শ্রীধরদাস	:	সদুক্তিকর্ণামৃত। সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (সম্পা.)। কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫।
শ্রীমদ্ভগবদগীতা	:	কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। কলিকাতা : ভিক্টোরিয়া প্রেস, ১২৯২।
শ্রীমদানন্দভট্ট	:	বল্লালচরিত। দীননাথ ধর (অনূ.)। কলিকাতা : যোড়াসাঁকো, রাজবাড়ী, ১৩১১।
	:	বল্লালচরিত। এইচ. পি. শাস্ত্রী (অনূ.)। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৪।
শ্রীহর্ষ	:	নৈষধচরিত, পূর্ব্বভাগ। জগচ্চন্দ্র মজুমদার (অনূ.)। কলিকাতা : ১৯১৬।
সন্ধ্যাকর নন্দী	:	রামচরিত। আর. সি. মজুমদার ও অন্যান্য (সম্পা. ও অনূ.)। রাজশাহী : বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৩৯।
হলায়ুধ	:	ব্রাহ্মণসর্বস্বম। ১ম খণ্ড। বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ (অনূ.)। কলিকাতা : মহামিলন মঠ, ১৩৯৪।
হর্ষচরিত অফ বাণভট্ট	:	ই. বি. কোয়েল অ্যান্ড এফ. ডব্লিউ টমাস (অনু.) লন্ডন : রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৯৭।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	:	কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। ৪র্থ সং। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৭২।
		হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। হরপ্রসাদশাস্ত্রী। ২য় সং। কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮।

খ. লিপিমালা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	:	গৌড় লেখমালা (প্রথম স্তবক)। রাজশাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯।
	:	"নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন"। সাহিত্য মাসিক পত্র ও সমালোচনা, ২২ বর্ষ : ১ম-১২শ সংখ্যা (বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৮)।

আর. মুখার্জী ও অন্যান্য : কবপাস অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশন্স বিয়ারিং অন হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল। কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭।

ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ারটারলি, খণ্ড–৯, ২৩।

এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড–২, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৭, ৩০।

এ.এইচ. দানী : "সিলেট কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ শ্রীচন্দ্র"। ফিফথ্ বিজওনাল এযার ; পেপার রেড ইন দি এশিয়ান আর্কিয়লজি কনফারেন্স, দিল্লী : ডিসেম্বর, ১৯৬১।

এন. জি, মজুমদার : ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল। খণ্ড–৩। রাজশাহী : ববেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৯।

জে.এফ. ফ্লীট : করপাস ইন্সক্রিপশন্সম ইন্ডিকোরীমী। খণ্ড–৩, ইন্সক্রিপশন্স অফ দি আরলি গুপ্ত কিংস্ অ্যান্ড দেয়ার সাকসেসবস্। কলিকাতা : দি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ১৮৮৮।

দীনেশচন্দ্র সরকাব : শিলালেখ তাম্রশাসনাদিব প্রসঙ্গ। কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮২।

বাধাগোবিন্দ বসাক : "নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন"। সাহিত্য মাসিকপত্র ও সমালোচনা, ২৩ বর্ষ : ১ম–১২শ সংখ্যা, (বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৯)।

গ. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকাবিযা : বাংলাদেশেব প্রত্নসম্পদ। ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

আবদুল আজিজ ফারুক : "বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ"। ইতিহাস পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (১৩৭৫)।

এ. এইচ. দানী : ময়নামতি প্লেটস অফ দি চন্দ্রজ। পাকিস্তান আর্কিয়লজি, নং–৩ ১৯৬৬।

এ. কানিংহাম : আর্কিয়লজিক্যাল সাবভে অফ ইন্ডিয়া অ্যানুযাল বিপোর্ট, খণ্ড–১৫, ১৮৮২।

কলমাকান্ত গুপ্ত : "কতিপয় ঐতিহাসিক স্থান"। ইতিহাস, ঢাকা, ৩য় বর্ষ (পৌষ–চৈত্র, ১৩৭৬)।

কে. এন. দীক্ষিত : "এক্সক্যাভেশন্স অ্যাট পাহাড়পুর"। দিল্লী, ১৯৩৮ (মেমোরীজ অফ দি আর্কিয়লজিক্যাল সারভে অফ ইন্ডিয়া : ৫৫)।

সরসীকুমার সরস্বতী : পালযুগের চিত্রকলা। কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮।

: "আরলি স্কাল্পচারস্ অফ বেঙ্গল"। জার্নাল অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ লেটারস্, খণ্ড–৩০, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮।

সি সি. দাসগুপ্ত : পাহাড়পুর অ্যান্ড ইট্স্ মনুমেন্টস্। কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১।

২. সহায়ক গ্রন্থ

ক. বাংলা গ্রন্থাবলী

অজয় রায় : বাংলা ও বাঙালী। ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ১৩৭৮।

অতুল সুর : বাঙালী ও বাঙালীর বিবর্তন। কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮৬।

: বাঙলার সামাজিক ইতিহাস। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮২।

অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.) : বাঙালীর পূজাপার্বণ। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রঃ ১০ম–২০শ শতাব্দী)। ৩য় সংস্করণ। কলিকাতা : মডার্ণ বুক, ১৩৭৮।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.) : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আবদুর রহিম ও অন্যান্য : বাংলাদেশের ইতিহাস। ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭।

আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

আবদুল জব্বার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ। ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ৬ষ্ঠ সং। কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৭৫।

: বাংলার লোকসাহিত্য। কলিকাতা : বুক হাউস, ১৯৬২–৬৩। ২ খণ্ড। ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৬২ ; ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৩।

আশুতোষ মজুমদার : মেয়েদের ব্রতকথা। কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৭৩।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় : বঙ্গ প্রসঙ্গ। কলিকাতা : নববিধান পাবলিকেশন কমিটী, ১৯৫৮।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান৷ ২য় সং। কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৭১।

কল্যাণী মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০।

কামিনী কুমার রায় : বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার। কলিকাতা : বাসন্তী লাইব্রেরী, ১৯৮০।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : মধ্যযুগে বাঙ্গালা। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, ১৩৩০।

ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা। ২য় দে'জ সং। কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৪।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা : স্বারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৮।

তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত : প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১।

দীনেশচন্দ্র সরকার : বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১।

: পাল–সেনযুগের বংশানুচরিত। কলিকাতা : সাহিত্য লোক, ১৯৮২।

: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ২য় সং.। কলিকাতা : সান্যাল এ্যান্ড কোং, ১৯০১।

নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব। ১ম দে'জ সং। কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০।

: বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

: বাংলার নদনদী। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪।

পারুল ঘোষ : বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম : সাহিত্যে ও দর্শনে। কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৬।

প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী : নাথধর্ম ও সাহিত্য। আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি : প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, ১৯৫৫।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : বাঙলায় ধর্মসাহিত্য (লৌকিক)। কলিকাতা : অমূল্য গোপাল মজুমদার, ১৩৮৮।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ : বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯।

প্রশান্তকুমার দাসগুপ্ত : গীতগোবিন্দ ও জয়দেব গোষ্ঠী। কলিকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ১৩৮১।

বাণী চক্রবর্তী : সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন। ২য় সং। কলিকাতা : বাণী চক্রবর্তী, ১৯৭০।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালী। ৩য় সং। কলিকাতা : আর. এইচ. শ্রীমানী এ্যান্ড সন্স, ১৯৪৫।

মনীন্দ্র সমাজদার : সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

মধুসূদন তর্কবাচস্পতি : গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস, বৈষ্ণব বিবৃতি। ২য় সং। হুগলী : সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ, ১৩৩৩।

মমতাজুর রহমান তরফদার : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।

মোহাম্মদ আব্দুর রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৯৫৭)। ২য় খণ্ড। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (অনূ.) ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

রমাপ্রসাদ চন্দ : গৌড়রাজমালা। ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড। রাজশাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস। ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ। ৭ম সং। কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮১।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস। ১ম খণ্ড। দে'জ সং। কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭।

শশিভূষণ দাসগুপ্ত : ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্তসাহিত্য। ৪র্থ মুদ্রণ কলিকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৩৯২।

: শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে। ২য় সং। কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি: , ১৩৬৪।

সত্যজিৎ চৌধুরী ও
অন্যান্য (সম্পা.) : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ। ৩য় খণ্ড। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় : বাঙালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা: ১১০০–১৯০০ খ্রী:। কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।

সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর–খুলনার ইতিহাস। ১ম খণ্ড। ৩য় সং। কলিকাতা : শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৩।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড,পূর্বার্ধ। ৪র্থ সং, কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩।

: বঙ্গ ভূমিকা (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০–১২৫০ খ্রীস্টপব)। কলিকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

সুধীর কুমার মিত্র : হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ। ১ম খণ্ড। ২য় খণ্ড। কলিকাতা : মিত্রানি প্রকাশন, ১৯৬২।

সুনীল চট্টপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : বাঙালীর ইতিহাস, (সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব')। ২য় সং। কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৩।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাকৃত–অপভ্রংশ সাহিত্য বীথিকা। কলিকাতা : এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোং, ১৩৬৭।

: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা : এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, ১৯৭৩।

: সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান। কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৯।

: স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী। কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং লি:, ১৩৬৮।

সুশীল রায় (সম্পা.) : বঙ্গ প্রসঙ্গ। পরিবর্ধিত সং। কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৩৭২।

খ. ইংরেজি গ্রন্থাবলী

আবুল ফজল : আইন–ই–আকবরী। খণ্ড–২। সি. এইচ. এস. জেরেট (অনু.)। ৩য় সং। নিউ দিল্লী : ওরিয়েন্ট বুকস রিপ্রিন্ট করপোরেশনস, ১৯৭৮।

: আকবরনামা। খণ্ড–৩। এইচ. ব্যাভারিজ (অনু.)। ফার্স্ট ইন্ডিয়ান রিপ্রিন্ট। দিল্লী : রেয়ার বুকস, ১৯৭৩।

আর.সি. মজুমদার (সম্পা.) : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল। খণ্ড–১। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ১৯৪৩।

: দি আরলি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল। ঢাকা : ইউনিভারসিটি অফ ঢাকা, ১৯২৫।

হিস্ট্রি অফ অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল। কলিকাতা : জি. ভরদ্বাজ, ১৯৭১।

আর. সি. মিত্র : ডিকলাইন অফ বুড্‌টিজম্ ইন ইন্ডিয়া। শান্তিনিকেতন : শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯৫৪।

ই. লেটব্রিজ : অ্যান ইজি ইন্ট্রডাকশন টু দি হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অফ বেঙ্গল। কলিকাতা : থ্যাকার স্পিংক অ্যান্ড কোং, ১৮৭৫।

এ.এম. চৌধুরী : ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (সি. ৭৫০–১২০০ এ.ডি.)। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৭।

এ.এস. আলতেকার : এডুকেশন ইন অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া। বেনারস : দি ইন্ডিয়ান বুকশপ, ১৯৩৪।

: দি পজিশন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন ; ফ্রম প্রি–হিস্ট্রিক টাইমস্ টু দি প্রেজেন্ট ডে। বেনারস : কালচারাল পাবলিকেশন্ হাউস, ১৯৩৮।

এইচ. ব্লকম্যান : কন্ট্রিবিউশনস টু দি জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯৬৮।

এইচ.পি. শাস্ত্রী : ডিসকভরি অফ লিভিং বুড্‌টিজম্ ইন বেঙ্গল। কলিকাতা : ১৮৯৭।

এম.এ. রহিম : সোসাল অ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল। খণ্ড–১। করাচি : পাকিস্তান হিস্টরিকাল সোসাইটি, ১৯৬৩।

এস. হোসেন : এভরিডে লাইফ ইন দি পাল এম্পায়ার। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৮।

: সোসাল লাইফ অফ উইমেন ইন আরলি মিডীএভ্ল্ বেঙ্গল। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৮৫।

এস. কে. চ্যাটার্জী : দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার। ২ খণ্ড। কলিকাতা : ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯২৬।

: বুডটিস্ট্ সারভাইভালস ইন বেঙ্গল। বি. সি. ল. ভল্যুম, পর্ব–১। কলিকাতা : ১৯৪৫।

এস. কে. দে : আরলি হিস্ট্রি অফ দি বৈষ্ণব ফেথ অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ বেঙ্গল ; ফ্রম সংস্কৃত অ্যান্ড বেঙ্গলী সোর্সেস। কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৪২।

এস.পি. চ্যাটার্জী : বেঙ্গল ইন ম্যাপস ; এ জিওগ্রাফিক্যাল এনালিসিস অফ রিসোর্স ডিষ্ট্রিবিউশন ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইস্টার্ণ পাকিস্তান... ফরওয়ার্ড বাই দি অনার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কলিকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যানস্, ১৯৪৯।

এস.সি. রায় ও অন্যান্য : দি খারিয়াস। ২ খণ্ড। রাচী : 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' অফিস, ১৯৩৭।

এস. এম. আলী : দি জিওগ্রাফি অফ পুরাণ। ২য় সং। নিউ দিল্লী : পিউপুলস পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩।

কে. বাগচী : দি গেঞ্জেস ডেল্টা। কলিকাতা : ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৪৪।

গায়ত্রী সেন-মজুমদার : বুড্‌ঢিজ্‌ম্ ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল। কলিকাতা : নাভানা, ১৯৮৩।

জে.এন. সরকার (সম্পা.) : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল। খণ্ড–২। ঢাকা : ইউনিভারসিটি অফ ঢাকা, ১৯৭২।

জে.ডব্লিউ. উইলকিনস : হিন্দু মাইথলজি : বেদিক অ্যান্ড পুরাণিক। কলিকাতা : থ্যাকার, স্পিংক অ্যান্ড কোং, ১৮৮২।

টি. ওয়াটারস : অন য়ুয়ান চুয়াঙস ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া। খণ্ড–২। লন্ডন : রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৫।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার : স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল। খণ্ড–৭। লন্ডন : ট্রুবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৭৬।

ডি. সি. সরকার : স্ট্যাডীজ ইন দি জিওগ্রাফী অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মিডীএভ্‌ল্ ইন্ডিয়া। দিল্লি : মতিলাল বানারসিদাস, ১৯৬০।

: (সম্পা.)। রিলিজিআস লাইফ ইন অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া। কলিকাতা : ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৭২।

তপোনাথ চক্রবর্তী : সাম আসপেক্টস অফ রিলিজিআস লাইফ অ্যাজ ডিপিকটেড ইন আরলি ইন্সক্রিপশন্স অ্যান্ড লিটারেচার অফ বেঙ্গল। কলিকাতা : দি অথর, ১৯৫৭।

: ফুড অ্যান্ড ড্রিংক ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল। কলিকাতা : দি অথর, ১৯৫৯।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) : হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি ; এসেজ ইন অনার অফ প্রফেসর নীহাররঞ্জন রায়। কলিকাতা : ফ্রেম পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, ১৯৭৮।

পি.এল. পাল : আরলি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (ফ্রম দি আরলিয়েস্ট টাইমস টু দি মুসলিম কঙ্কুয়েস্ট)। ২ খণ্ড। কলিকাতা : ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৩৯।

পি. ভি কানে : হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র ; অ্যানশিয়েন্ট মিডীএভ্‌ল্ রিলিজিআস অ্যান্ড সিভিল ল' ইন ইন্ডিয়া। খণ্ড–১ ; খণ্ড–২, পর্ব–১, ২। পুনা. ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৩০, ১৯৪১।

বি. এম. মরিসন : পলিটিক্যাল সেন্টারস অ্যান্ড কালচারাল রিজনস ইন আরলি বেঙ্গল। টকসন : দি ইউনিভারসিটি অফ অরিজোনা প্রেস, ১৯৭০।

বিনয়চন্দ্র সেন : সাম হিস্টরিকাল আসপেক্টস অফ দি ইন্সক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, প্রি–মোহাম্মাদান এপক্‌স। কলিকাতা : ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৪২।

রফিউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.) : ইসলাম ইন বাংলাদেশ : সোসাইটি, কালচার অ্যান্ড পলিটিক্স। ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৮৩।

শচীন্দ্রলাল ঘোষ : ওয়েস্ট বেঙ্গল। দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৬।

শশীভূষণ দাসগুপ্ত : অবসকিওর রিলিজিআস কাল্টস। কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯।

৩. সহায়ক প্রবন্ধ

ক. বাংলা প্রবন্ধাবলী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : "গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী"। সাহিত্য মাসিক পত্র ও সমালোচনা, ২৩শ বর্ষ : সং ১-১২ (বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৯)।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : "পশ্চিম বাংলায় ধর্মঠাকুর"। মাসিক বসুমতি, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫)।

আহমদ শরীফ : "বাংলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব, ভাষাবিদ্বেষ"। ইতিহাস পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (১৩৭৪)।

এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী : "পুণ্ড্র ও পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তি"। ইতিহাস পত্রিকা, ১২শ বর্ষ, সংখ্যা ১-৩, (১৩৮৫)।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী : "ধ্বজপূজা"। সাহিত্য মাসিকপত্র ও সমালোচনা, ১৪শ বষ (১ম-১২শ) সংখ্যা, (বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১০)।

: "সূর্যপূজা"। সাহিত্য মাসিক পত্র ও সমালোচনা, ১৪শ বর্ষ : (১ম-১২শ) সংখ্যা, (বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১০)।

দীনেশচন্দ্র সেন : 'সহজিয়া ধর্ম ও সাহিত্য"। সাহিত্য মাসিক পত্র ও সমালোচনা, ২৩শ বর্ষ : (১ম-১২শ) সংখ্যা, (বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৯)।

দীনেশচন্দ্র সরকার : "প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপূজা"। প্রবাসী, (ভাদ্র, ১৩৫৬)।

মমতাজুর রহমান তরফদার : "বাংলাব বর্ণব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, (ডিসেম্বর, ১৯৮৩)।

শাহানাবা হোসেন : "সুভাষিতবত্নকোযে বাংলাব গ্রাম"। উত্তর নক্ষত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক অনিয়মিত সংকলন, বগুড়া, (ফেব্রুযারী, ১৯৮৫)।

: "সদুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম"। ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা, ৭ম বষ, ১ম সংখ্যা, (বৈশাখ, ১৩৮০)।

সুকুমার সেন : "বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব"। ইতিহাস, কলিকাতা, নবম সংখ্যা, (১৩৬৫)।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী : "বঙ্গ কোন দেশ"। মানসী ও মর্মবাণী, (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)।

খ. ইংরেজি প্রবন্ধাবলী

আবদুল মমিন চৌধুরী : "দেবপর্বত"। জার্নাল অফ দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, খণ্ড-১, (১৯৭২)।

আর. সি. মজুমদার : ফিজিকাল ফিচারস অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মিডীএভল্ বেঙ্গল"। ডি. আর. ভান্ডারকর ভল্যুম, কলিকাতা, ১৯৪৫।

: "লামা তারানাথ একাউন্ট অফ বেঙ্গল"। ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোটারটার্লি, খণ্ড-১৬, (১৯৪০)।

এ.এইচ. দানী : "শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ শাহ-ই-বাঙ্গালা"। স্যার যদুনাথ সরকার কমেমোরেশন ভল্যুম। পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, ১৯৫৮।

এইচ.ডব্লিউ স্মীথ (অনু.) : "উইবারস স্যাকরেড লিটারেচার অফ দি জৈনস"। ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারী, খণ্ড–২০, (১৮৯১)।

এন.কে. ভট্টশালী : নিউ শক্তিপুর গ্রান্ট অফ লক্ষ্মণসেন দেব অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশনস অফ অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল"। জার্নাল অফ দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, থার্ড সিরিজ খণ্ড–১, (১৯৩৫)।

এস. কে চ্যাটার্জী : "বুড্‌ডিস্ট সাবভাইভালস ইন বেঙ্গল"। বি.সি ল ভল্যুম, পর্ব–১, কলিকাতা, ১৯৯৫।

এস.কে. দে : "দি বুড্‌ডিস্ট তান্ত্রিক লিটারেচার (সংস্কৃত) অফ বেঙ্গল"। নিউ ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারী, খণ্ড–১, (১৯৩৮–৩৯)।

এস. হোসেন : "সাম ভারসেস অন কান্ট্রি লাইফ ইন দি আর্যাসপ্তশতী অফ শ্রী গোবর্ধনাচার্য"। জার্নাল অফ দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, খণ্ড–৪, (১৯৭৫–৭৬)।

: "লাইফ অফ উইমেন ইন আর্লি মিডীএভল বেঙ্গল"। জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ : খণ্ড–১৪, নং–২, (আগস্ট, ১৯৭৯)।

: "সাম আসপেক্টস অফ দি সুভাষিতরত্নকোষ"। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কমেমোরেশন ভল্যুম, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, (১৯৭২)।

: "সাম হিস্টরিকাল আসপেক্টস অফ দি সুভাষিতরত্নকোষ"। জার্নাল অফ দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, খণ্ড–৩, (১৯৭৪)।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : অ্যান্টিকুইটি অফ তান্ত্রিকিজম"। ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি, খণ্ড ৬, (১৯৩০)।

ডি.আর. ভাণ্ডারকর : "ফরেন এলিমেন্টস ইন দি হিন্দু পপুলেশন"। ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারী, খণ্ড–৪০, (১৯১১)।

ডি.সি ভট্টাচার্য : ডেট অফ লক্ষ্মণসেন অ্যান্ড হিজ প্রীডিসেসরস"। ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারী, খণ্ড–৫১, (১৯২২)।

পি.সি. সেন (সম্পা.) : করতোয়া মাহাত্ম্য। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিস মনোগ্রাফস নং–২, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, (১৯২৯)।

মনমোহন চক্রবর্তী : "ভট্টভবদেব অফ বেঙ্গল"। জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, নিউসিরিজ, খণ্ড–৮, (১৯১২)।

: "নোটস অন দি জিওগ্রাফি অফ ওল্ড বেঙ্গল"। জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, নিউ সিরিজ, খণ্ড–৪, (১৯০৮)।

সুকুমার সেন : "ইজ দি কাল্ট অফ ধর্ম এ লিভিং রেলিক"। বি. সি. ল. ভল্যুম, পর্ব–১, কলিকাতা, ১৯৪৫।

চিত্রাবলি

গঙ্গা
আনু : ১২শ শতাব্দী
দেওপাড়া, গোদাগাড়ি, রাজশাহী

বিষ্ণু
আনু : ১১শ শতাব্দ
ধামিনকোর, বাগমারা, রাজশাহী

গরুড় বাহন বিষ্ণু
আনু : ১১শ শতাব্দী
নিয়ামতপুর, নওগাঁ, রাজশাহী

বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ)
আনু : ১১শ শতাব্দী

সূর্য
আনু : ১১শ শতাব্দী
ছাপরা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ (রাজ:)

চণ্ডী (পার্বতী)
আনু : ১২শ শতাব্দী
বাঁকিশোর তানোর, রাজশাহী

সূর্য
আনু : ১২শ শতাব্দী
বরিয়া, মান্দা, নওগাঁ

অর্ধ নারী শিব
আনু : ১২শ শতাব্দী
পুরাপাড়া, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ (ঢাকা)

মনসা
আনু : ১০ম শতাব্দী
ক্ষিদ্রপল্লী, নন্দীগ্রাম, বগুড়া
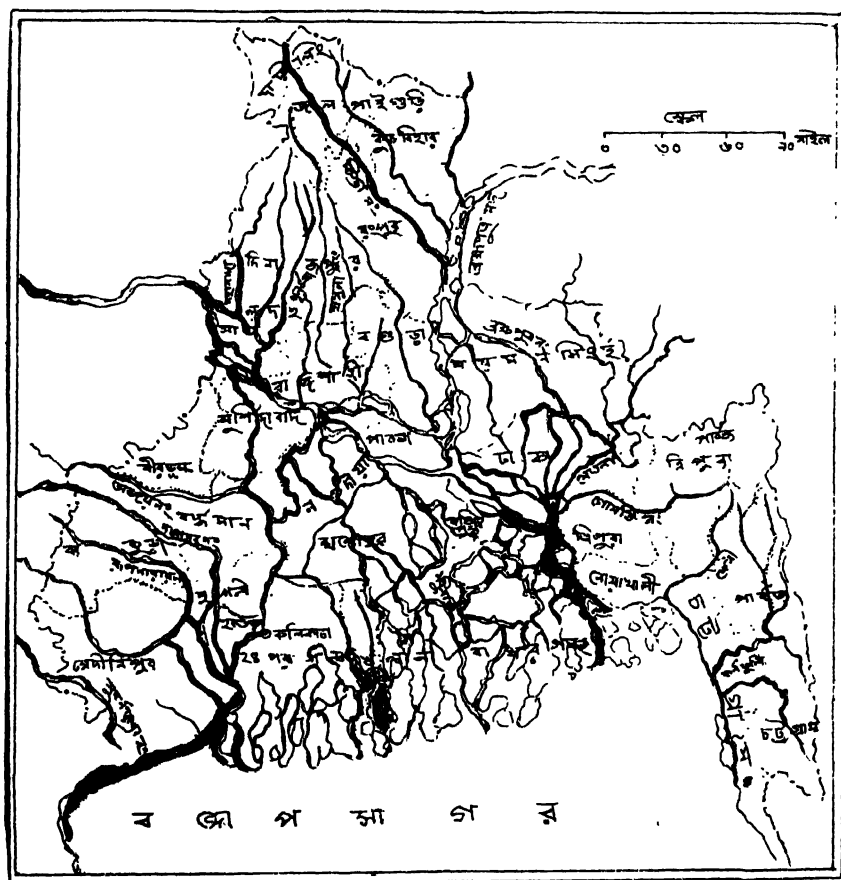
অখণ্ড বাংলাদেশ মানচিত্র নং ১

প্রাচীন বাংলাদেশের নদী মানচিত্র নং ২